ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪০০ : ১

জসীম উদ্দীন	লালন ফকীর
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা
খন্দকার ফরহাদ হোসেন (অনীক মাহমুদ)	আবুল হাসানের কবিসত্তা ও কাব্য বিচার
বেগম জাহান আরা	শিষ্ট উচ্চারণে ধ্বনি সৌন্দর্যের গুরুত্ব
মুঈন উদ্দীন আহমদ খান	দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থাঃ
এম. জয়নুল আবেদীন	প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র
এম. এস. মণ্ডল	বাংলাদেশের আর্থসামাজিক সংকট ও উত্তরণের পন্থা
ইসরাত জাহান রুপা	বাংলাদেশের দুঃস্থ মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রকল্পঃ
এম. মুহিবউল্যাহ সিদ্দিকী	বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় মুসলমান
এ. বি. সিদ্দিক	আদালত অবমাননা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা (প্রেক্ষিত বাংলাদেশ)
মুহাম্মদ হাসান ইমাম	গ্রামীণ বৃক্ষসম্পদের চালচিত্রঃ একটি তথ্যানুসন্ধানী জরিপ ও প্রসঙ্গ-কথা
এ. বি. এম হোসেন	আবদুল করিম রচিত বাংলার ইতিহাস
আ. ন. ম. আবদুর রহমান	আই. বি. এস সংবাদ

আই বি এস জার্নাল

সম্পাদক মন্ডলী

শাহানারা হোসেন
ইতিহাস বিভাগ, রা.বি.

আ. ন. শামসুল হক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রা.বি.

খন্দকার আব্দুর রহিম
বাংলা বিভাগ, রা.বি.

এ. এইচ. এম. জেহাদুল করিম
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রা. বি.

এস. এ. আকন্দ
সামাজিক ইতিহাস, আই.বি.এস

এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম
কৃষি অর্থনীতি, আই.বি.এস.

প্রীতি কুমার মিত্র
ইতিহাসতত্ত্ব, আই.বি.এস.

এম. জয়নুল আবেদীন
অর্থনীতি, আই.বি.এস.

মাহমুদ শাহ কোরেশী
সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস;
পরিচালক, আই.বি.এস.

প্রবন্ধে উদ্বৃত তথ্য ও মতামতের জন্য ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর কোনো দায়দায়িত্ব নাই।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সম্পাদক আই.বি.এস. জার্নাল

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ৬২০৫
বাংলাদেশ।

আই. বি. এস. জার্নাল

১৪০০ : ১

মাহমুদ শাহ কোরেশী
সম্পাদিত

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাটিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী অজিত চক্রবর্তী কর্তৃক ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ এর পক্ষে প্রকাশিত

চৈত্র ১৪০০
এপ্রিল ১৯৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ আবু তাহের বাবু

জিশা প্রিন্টার্স
মালোপাড়া, রাজশাহী।
কর্তৃক মুদ্রিত

মূল্য ঃ ৫০.০০

সম্পাদকীয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর প্রতিষ্ঠার পর দু-দশক অতিক্রান্ত হলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য প্রতিষ্ঠানরূপে এটি দেশে ও দেশের বাইরে কমবেশী প্রশংসার ভাগীদার। ইনস্টিটিউটের অন্যান্য কার্যক্রমের সংগে এর ইংরেজিতে প্রকাশিত ষোলো ভল্যুম জার্নালও সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত হলেও একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করা এযাবত সম্ভব হয়নি। অনেকের ধারণা বাংলায় 'সিরিয়াস রিসার্চ পেপার' রচনা ও প্রকাশের পথে অনেক বাধা আছে। আমরা তা মনে করিনা। অবশ্য বাংলায় 'গবেষণামূলক' 'গবেষণাধর্মী' নামধেয় অনেক প্রবন্ধ যে আসলে তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে অপূর্ণাংগ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিশেষ করে, রচনাকালে কোনো বৈজ্ঞানিক তথা রীতিসম্মত পদ্ধতি বা 'মেথডলজি' অনুসরণ করা হয় না বলে সত্যিকার গবেষণা প্রবন্ধ বেশ দুর্লভ। যাহোক-বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে যে কোনো বিষয়-কেন্দ্রিক গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশে আমাদের আগ্রহ রইলো। মানোন্নয়নের ব্যাপারে সম্পাদকমন্ডলীর চাইতে প্রবন্ধকারদেরই অধিক সচেতন হতে হবে। কেননা, ইংরেজি জার্নালের মতো প্রতিটি প্রবন্ধ প্রকাশকালে মূলত একজন বিশেষজ্ঞের অনুমোদনের ওপর আমরা নির্ভর করে থাকি।

উল্লেখ্য যে, ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন সময়ে দেশের ও বাইরের পন্ডিত গবেষকদের প্রদত্ত বক্তৃতামালাও কিছু কিছু এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

আমাদের এই প্রয়াস সুধীমহলে গৃহীত হলেই আমরা কৃতার্থবোধ করবো।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

জসীম উদ্দীন	লালন ফকীর	১-১৩
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা	১৫-২৮
খন্দকার ফরহাদ হোসেন (অনীক মাহমুদ)	আবুল হাসানের কবিসত্তা ও কাব্য বিচার	২৯-৫২
বেগম জাহান আরা	শিষ্ট উচ্চারণে ধ্বনি সৌন্দর্যের গুরুত্ব	৫৩-৬০
মুঈন উদ্দীন আহমদ খান	দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থাঃ	৬১-৮০
এম. জয়নুল আবেদীন	প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র	৮১-১০৬
এম. এস. মণ্ডল	বাংলাদেশের আর্থসামাজিক সংকট ও উত্তরণের পন্থা	১০৭-১২১
ইসরাত জাহান রুপা	বাংলাদেশের দুঃস্থ মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রকল্পঃ	১২৩-১৩২
এম. মুহিবউল্যাহ সিদ্দিকী	বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় মুসলমান	১৩৩-১৪৫
এ. বি. সিদ্দিক	আদালত অবমাননা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা (প্রেক্ষিত বাংলাদেশ)	১৪৭-১৬৩
মুহাম্মদ হাসান ইমাম	গ্রামীণ বৃক্ষসম্পদের চালচিত্রঃ একটি তথ্যানুসন্ধানী জরিপ ও প্রসঙ্গ-কথা	১৬৫-১৮১
এ. বি. এম হোসেন	আবদুল করিম রচিত বাংলার ইতিহাস	১৮৩-১৮৬
আ. ন. ম. আবদুর রহমান	আই. বি. এ সংবাদ	১৮৭-১৯০

লেখক পরিচিতি

জসীম উদ্দীন (১৯০২-১৯৭৭) -	প্রখ্যাত কবি লোক সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ও গবেষক
ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান -	প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ খন্দকার ফরহাদ হোসেন - (অনীক মাহমুদ)	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ বেগম জাহান আরা -	প্রফেসর, আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ মুঈন উদ্দীন আহমদ খান -	প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ এম, জয়নুল আবেদীন -	প্রাক্তন পি,এইচ,ডি ফেলো, সহযোগী অধ্যাপক, আই,বি,এস
ডঃ এম, এস, মণ্ডল -	প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
মিসেস ইসরাত জাহান রূপা -	সাবেক এম.ফিল ফেলো; বর্তমান পি,এইচডি ফেলো, আই,বি,এস;
ডঃ এম. মুহিবউল্যাহ সিদ্দিকী -	প্রাক্তন পি.এইচ.ডি ফেলো আই.বি.এস; সহকারী অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ এ, বি, সিদ্দিক -	প্রফেসর ও ডীন, আইন বিভাগ/অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব হাসান ইমাম -	সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ এ, বি, এম, হোসেন -	প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব আ, ন, ম আবদুর রহমান -	এম.ফিল ফেলো আই,বি,এস (পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা)।

জীবনপঞ্জি কবি-কাব্য

জসীম উদ্দীন রচিত প্রবন্ধ লালন ফকির

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস বহু বিচিত্র ঘটনায় ভরপুর। কিন্তু প্রায় উল্লেখবিহীন একটি বড় ঘটনা এর নব্বই বছর ধরে ফকির লালন শাহর উজ্জ্বল উপস্থিতি (১৭৭৪-১৮৯০)। প্রধানত কুষ্টিয়া-যশোর-নদীয়া জুড়ে তাঁর বহু ভক্ত এক নবতর লোকধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এবং বহির্বিশ্বে নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন লালন শাহ। কিন্তু তাঁর সাধন-সংগীতের মতো তাঁর জীবনধারা এক দুর্ভেদ্য রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত। মৃত্যু-পরবর্তী 'হিতকরী' পত্রিকার প্রবন্ধের পর বসন্ত কুমার পালের রচনা প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে। শুধু কবি নন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র, গ্রামীণ ঐতিহ্যের অনুসারী জসীম উদ্দীন (১৯০৪) সরেজমিনে গবেষণা চালিয়ে এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন আটষট্টি বছর আগে। প্রবন্ধটি বঙ্গবাণী পত্রিকার ৫ম বর্ষ শ্রাবন ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আজকাল ক্ষেত্র-গবেষণার জন্য আমরা হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে থাকি, জসীম উদ্দীনকে সেদিন ফরিদপুর সাহিত্য সমিতি ছয় টাকা অনুদান দিয়েছিলো। এবং তাই খরচ করে তিনি যে মূল্যবান তথ্যাদি আহরণ করেছেন তা গোপন থেকে গেছে। কেননা লালনের ওপর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এটি কোথাও উল্লেখিত / সংকলিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর সোলেমান আলী সরকার এক দশক আগে আমার তত্ত্বাবধানে 'লালন শাহের মরমী দর্শন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমাকে এই প্রবন্ধের কথা জানান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে এটি সংরক্ষিত আছে। সে সময়ে প্রবন্ধটি কপি করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে উক্ত যাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও গ্রন্থাগার কর্মীর সৌজন্যে, প্রফেসর সরকারের সহযোগিতায় প্রবন্ধটি ফটোকপি করে অবিকল ছাপার ব্যবস্থা করা হলো। এজন্য আমি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে কৃতজ্ঞ।

মাহ্‌মুদ শাহ্ কোরেশী

সংগ্রহ

লালন ফকীর

লালনের জীবন কথা জানা সহজ না হইলেও অসম্ভব নয়। কারণ এখনও বহু বৃদ্ধ জীবিত আছেন যাঁহারা লালনের সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখেন।

এদেশের অন্যান্য সাধুপুরুষদিগের জীবন অপেক্ষা লালনের জীবন-কথা জানা আরও সহজ এই জন্য যে, তাঁহাদের জীবনে যেমন নানারূপ অসম্ভব অলৌকিক কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ লালনের জীবন-কথা তেমন নহে। তাঁর শিষ্যেরা যদিও তাঁহাকে খুব ভক্তি করে কিন্তু তাঁহাকে খোদা বলিয়া জানে না। তাই লালনের জন্মস্থান বাপ মা বাড়ী ঘর তাহাদের ভক্তির উচ্ছ্বাসে দ্বিতীয় নবদ্বীপ হইয়া উঠে নাই। এমন কি লালন কোন্ জাতির ছেলে, কোথায় তার বাড়ী ঘর-ইহাও তাহারা ভাল করিয়া বলিতে পারে না। তাহারা পাইয়াছে লালনের অসংখ্য গান-সুখে দুঃখে একতারার সুরে সুর মিশাইয়া তাই লইয়া তাহারা সারাটী জীবন কাটাইয়া দেয়।

লালনের মৃত্যুর পর কুমারখালির হিতকরী পত্রিকায় লালনের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লালনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এইরূপঃ

"সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইহাদের জাতি। ইহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থ গমন কালে পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। পথে মুমুর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের নয়া আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকির হন। ইহার মুখে বসন্তের দাগ বিদ্যমান ছিল।"

সম্প্রতি গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে বাবু বসন্তকুমার পাল মহোদয় তাঁর সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেও এই বৃত্তান্তের অনুসরণ করা হইয়াছে। এমন কি তিনি লালনের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা কিন্তু লালনের গ্রামের কাহারও কাছে এরূপ বৃত্তান্ত শুনি নাই। তাহার বাড়ীর পূর্ব্ব পার্শ্বের এক বৃদ্ধ তাঁতীর কাছে আমরা লালনের জন্ম বিবরণ এইরূপ শুনিয়াছি,-

তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে বেলায় তাঁর মা তাঁকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ করিতে নবদ্বীপে যান। সেখানে লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অভাগিনী জননী তাঁকে নদীর ধারে ফেলিয়া আসেন। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় যখন শিশুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন প্রভাত হইয়াছে। একটী মুসলমান মেয়ে জল আনিতে নদীতে যাইয়া অতটুকু ছেলেকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে তুলিয়া বাড়ীতে লইয়া আসেন। তাঁহারই সেবায় যত্নে এই শিশু দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠেন। উক্ত স্ত্রীলোকটির গুরু ছিলেন যশোরের উলুবেড়িয়া গ্রামের সীরাজ সাঁই। শিশুটি একটু বড় হইলে সীরাজ সাঁই তাহাকে চাহিয়া লন এবং তাঁহারই শিক্ষার গুণে লালনের লেখাপড়া ও ধর্মজীবনের সূত্রপাত হয়; এবং কালক্রমে লালন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন।

বড় হইয়া তিনি নাকি তাঁর ব্রাহ্মণ মায়ের সাথে দেখা করেন। সমাজের ভয়ে দুঃখিনী মাতা চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাঁকে বলেন, "বাছা তুই যখন মুসলমান হয়েছিস তখন সেইখানেই

থাক। কেবল মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দিস।" সেই মাতা যতদিন জীবিত ছিলেন লালন তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতেন। লালনের শিষ্য ভোলাই সার নিকট আমরা দুইটী ঘটনাই বলিলে তিনি বলিলেন, "অনেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে বটে কিন্তু কেউ প্রকৃত ঘটনা জানে না।ঃ++ যাহা হউক আর কিছুদিন পরে লালন সম্বন্ধে কিছু জানা বিশেষ কষ্টকর হইবে জানিয়াই আমরা উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিলাম। কারণ, যেসব বৃদ্ধ আজও লালনের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন তাঁহারা বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিবেন না। এই ঘটনাটী বিশ্বাস করিবার একটী কারণ আছে এই যে, লালনের সমস্ত গান পড়িয়া দেখিলে তাহাতে হিন্দু প্রভাব হইতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব বেশী পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমরা লালনের স্বহস্তলিখিত একখানা হাকিমী বই এবং মুসলমানী দোয়া কালাম লেখা একখানা খাতা পাইয়াছি। তাহা পড়িয়া মনে হয় লালন ফারসী কিম্বা আরবী জানিতেন। তার কোন কোন গানে কোরান সরীফের অনেক আয়াতের অংশ বিশেষ পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় তিনি কোরান সরীফ পড়িতে পারিতেন। এখন লালন যদি পরিণত বয়সে মুসলমান হইয়া থাকেন তবে, যে সব অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে তিনি থাকিতেন, তাহাতে অত বয়সে মুসলমান শাস্ত্র এতটা যে তিনি কিরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন সেটা ভাবিবার বিষয়। আর প্রবাসীর লেখক মহোদয় বলিয়াছেন, লালনের হিন্দু স্ত্রী তাঁহার অনুগামিনী হইতে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেন নাই। আমরা লালনের শিষ্য ভোলাইর নিকট শুনিয়াছি লালন প্রসিদ্ধ যোনকার বংশে* বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব ধর্ম্মের স্ত্রীর কথা তাঁরা কিছুই জানেন না।

লালন যখন তাঁর গানে ও জীবনের মহিমায় চারিদিকে বেশ নাম করিয়া তুলিলেন তখন কুষ্টিয়ার সিঁউড়ে গ্রামের অনেকেই তাঁর ভক্ত হইয়া পড়িল। একবার এখানে আসিলে এখানকার তাঁতীরা তাঁকে গ্রামের মধ্যে একখানা ছোট ঘর বাঁধিয়া দিল এবং সেইখানেই তিনি বাস করিতে লাগিলেন। পরে যশোরের উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের জনীর খোনকারের** কন্যা বিশোকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিঁউড়ে গ্রামের একটি বৃদ্ধের কাছে শুনিয়াছি লালনের দুই স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ভোলাই সা'র মতে লালনের এক স্ত্রী এবং লালনের কবরের পাশেই তাঁর কবর দেয়া হইয়াছে। বিশোকা অতি বিনয়ী ছিলেন এবং লালনের ভক্তদের তিনি অতি যত্ন করিতেন।

এই সময়ে বহু লোক টাকা পয়সা ও ফলমূল আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিত। বৎসরে ফাল্গুন মাসে তিনি একটি ভাণ্ডারা করিতেন। পাঁচ সাত হাজার লোক এখানে আসিয়া আহার করিত এবং গান গাহিত। এখানে এই ভাণ্ডারার একটি বিবরণ দিই। ইহার আর এক নাম সাধুসেবা। আজও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বিশেষ করিয়া নদীয়া যশোর ও পাবনার অংশ বিশেষে এই সাধুসেবা হয়। ইহাতে প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের ফকীরেরা নিমন্ত্রিত হন। সাধারণতঃ ফকীর ছাড়া আর কারও বাড়ীতে সাধুসেরা হয় না, তবে কোন ফকীরের শিষ্য হইলে কেহ সাধুসেবা করিতে পারেন।

সাধারণতঃ আম কাঁঠালের বাগানের ভিতর একটি বিস্তীর্ণ স্থান পরিষ্কার করা হয়। তাহাতে সারি বাঁধিয়া ছোট ছোট বিছানা করিয়া দেওয়া হয়। মাদুরের উপর কাঁথা ও বালিস এই বিছানার

* ছাপার ভুল। 'খোন্দকার বংশে'

** জমীর খোন্দকার? -সম্পাদক

সরঞ্জাম। ইহাকে 'গদী' কহে। এই গদীর উপরে সাধুরা তাঁহাদের শিষ্যগণের সহিত বসিয়া ধর্ম্মালাপ ও গান গাহিয়া থাকেন। সাধারণতঃ বৈকাল বেলায়ই সাধূসেবা আরম্ভ হয়। এক এক দল সাধু ভিন্ন গ্রাম হইতে সভায় আসিয়া সমস্বরে "আলেক" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ, আল্লা এক। তারপর তাঁহারা যোগ্যতানুসারে সকলকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করেন। সন্ধ্যা বেলা 'চাইল পানী' খাইয়া সাধূরা গান করিতে আরম্ভ করেন। যদিও বিভিন্ন দলে বিভিন্ন বিভিন্ন গান হইয়া থাকে কিন্তু সকল গানের ভিতরই একটা ধারাবাহিকতা আছে। এক ভাবের গানই সকলকে গাহিতে হয়। যাঁহার গান আর সকলের গানের সহিত মিলিবে না তাঁহাকে আর গাহিতে দেওয়া হয় না। এই সব গানের মধ্যে সময় সময় পাল্লাও লাগিয়া যায়। আজকাল কুষ্টিয়া জেলার পঞ্জুসাম্বর শিষ্যদের সহিত লালনের শিষ্যদের প্রায়ই পাল্লা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহারা স্ব স্ব গুরুর গানই গাহিয়া থাকে। আর ইহাদের গানগুলি এরূপ ভাবে তৈরী যে একজনের গান দিয়া আরেকজনের প্রত্যেকটি গানের উত্তর দেওয়া যায়। এইরূপ গান গাহিতে গাহিতে যখন প্রায় রাত্র দুইটা বাজে তখন একটি লোকে 'আলেক' এই শব্দ উচ্চারণ করে, আর সমস্ত গান বাদ্যযন্ত্রের মত থামিয়া যায়। তখন ফকীরেরা আহার করিয়া আপনা-আপন গদীতে ঘুমাইয়া থাকে।

পরদিন সকালে গোষ্ঠ গান আরম্ভ হয়। তারপর সকলে বাল্যভোজন সমাপ্ত করিয়া গান আরম্ভ করে। মধ্যাহ্ন আহারের পর ফকীরেরা যোগ্যতা অনুসারে কিছু কিছু ভিক্ষা পায়।

লালন যে সব সাধূসেবা করিতেন তাহাতে তখনকার দিনেও তাঁর তিন চার শত টাকা ব্যয় হইত।

গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে সবিশেষ ভক্তি করিত। তাদের সুখে দুঃখে তিনি চির সঙ্গী ছিলেন। তিন-চার খানা গ্রামের মধ্যে কারও অসুখ হইলে তিনি ঔষধ দিয়া এবং মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার উপশম করিতেন। এইজন্যই বুঝি তিনি সার-কৌমুদী বলিয়া একখানা কবিরাজী সংগ্রহ-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি গ্রামের লোকদের তাবিজ ও কবচ দিতেন। লালনের স্বহস্তে লেখা একটুকরা কাগজের একটা মাদুলী আমরা পাইয়াছি। তাঁর সচ্চরিত্র ও নম্র ব্যবহার কি ধনী কি নির্ধন সকলকেই আকর্ষণ করিত। তিনি জীবনে অতি সংযমী ছিলেন। যদিও তিনি আশ্রমে সস্ত্রীক বাস করিতেন তথাপি স্বামী স্ত্রীতে কোনওরূপ দৈহিক সম্বন্ধ ছিলনা বলিয়া শুনা যায়।

"আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। সম্প্রদায়ের মতানুসারে তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই।"- হিতকরী

শিষ্যদিগকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাঁরাও তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানারূপ সেবার কার্য্যদ্বারা তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার দুইটি প্রকাণ্ড ঘোড়া ছিল। লালন তাহাতে চড়িয়া নানাস্থানে বেড়াইতেন। তাঁহার শিষ্য ভোলাইসার নিকট শুনিয়াছি তাহারা পালাক্রমে এই ঘোড়ার ঘাস কাটিতেন। লালনের শিষ্যদের সম্বন্ধে হিতকরী বলিতেছেন,-

"আখড়ায় ১৫/১৬ জনের বেশী শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। অন্যান্য শিষ্যদেরও তিনি কম ভালবাসিতেন না। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার বিশেষ কোন তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান

হইত না। লালনের এইরূপ ভালবাসা পাইয়া ও সদ্‌গুরুর শিক্ষার গুণে শিষ্যেরাও প্রকৃত সত্যকার ধর্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন।"

সেই সময়ের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপী অশ্লীলতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু লালনের জীবনের যে প্রভাব তাঁর শিষ্যদিগের উপর পড়িয়াছিল তাহারই মহিমায় তাহারা সেই যুগের সমস্ত পাপকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এসম্বন্ধে হিতকরী বলিলেন,-

"এই সম্প্রদায়ে (লালনের) এতাদৃশ ব্যাভিচার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহা পাপ ..... বাউল সাধু সেবা ও লালনের মতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে কোন শ্রেণীতে একটী গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে ইহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান জননের পথ একেবারে রুদ্ধ।"

লালনের শিষ্যদের সম্বন্ধে এত বড় সার্টিফিকেট এখনও প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে যদিও সন্দেহ আছে তবু তার শিষ্য ভোলাই সাকে দেখিয়া ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। তাঁর সৎস্বভাবের এবং সুব্যবহারের প্রশংসা সকল গ্রামের লোকই করিয়া থাকে। লালনের শিষ্য শীতলসার একটী পুত্র আছে। এই ছেলেটীকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে যে আদর করেন তাহা দেখিয়া বুক ভরিয়া যায়। লালনের শিষ্যদের যে সন্তান হইত না একথাটা হিতকরী সম্ভবতঃ সত্য বলেন নাই। কারণ হিতকরীর মতে লালনের ৪/৫ হাজার শিষ্য ছিল। এতগুলি লোকের অনেকে বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও কাহারও সন্তান হয় নাই- এ কথাটি একেবারে অসম্ভব। আর লালনের বর্ত্তমান প্রধান শিষ্য ভোলাই এর পিতামাতা লালনের শিষ্য ছিলেন।

লালনের ধর্মমত সম্বন্ধ হিতকরী বলেন- "বাস্তবিক ধর্ম সাধনে অন্তদৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সার তত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকীর নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত। বৈষ্ণবধর্ম্মের মত পোষণ করিতেন বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই। কারণ ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন।"

লালনকে যেমন ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই তেমনি হিন্দু কিম্বা মুসলমান বলিবারও উপায় নাই। কারণ কোন ধর্ম্মমতকেই তিনি একেবারে গ্রহণ করেন নাই। আবার কোন ধর্ম্মমতকেই তিনি একেবারে বর্জন করেন নাই। বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের লীলার অনেক গান তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

"বলরে বলাই তোদের ধারণ কেমন হারে
তোরা ঈশ্বর বলিস যারে কান্ধে চড়িস তারে
বল কোন বিচারে?"

ব্রজরাখালের এই সহজ সুন্দর সারল্যে তিনি বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আজও পল্লীরাখালেরা গোধূলীলগ্নে গোখুর ধূলায় স্নান করিতে করিতে আকাবাঁকা গ্রাম্যপথে গরুর গলার

ঘন্টা বাজার তালে তালে গাহিয়া যায়
আমি পথের পদ চিহ্ন পাই।
কোন বনে গেলিরে কানাই? ও তুই দাঁড়ারে।-
তোর মা দুখিনী কেন্দে ছাড়ে হাঁই
দিবসে অন্ধীকার হৈল কানাই ঘরে নাই
ও তুই দাড়ারে।-

এগুলি শুনিয়া এখনও অনেক বৈষ্ণবের চোখে জল আসে। কিন্তু ধর্মের ঔদার্য্যের যে স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন আপন জীবনে তাহার প্রভাব তাঁকে ব্রজের ধূলায়ই আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। সেখানেও তিনি সেই বাঁধনহারা সীমাহারা অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের সন্ধান করিতে যাইয়া গাহিয়াছেন-

অনাদি আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
তার কি আছে কভু গোষ্ঠ লীলা
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে
লীলাকারী তারই অংশ কলা
সত্য সত্যশরণ বেদাগমে কর
চিদানন্দরূপ পূর্ণ ব্রহ্মময়
জন্মমৃত্যু তার নাহি ভবের পরে
তবে সাঁই স্বয়ং পাই নন্দলালায়।

এই অসীম অনন্তকে তবে কেমন করিয়া পাইব? লালন সে পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

দরবেশের দেলদরিয়া অন্ধাই
অজান খবর সেহি জানতে পায়
ভজ দরবেশ পাবে উপদেশ
লাল বলে তার উজল হৃদ কমলা

এই 'উজল হৃদ-কমলা' যাঁর তাঁকে গুরু করিয়া ভজনা করিলে সেই অনাদিকে পাওয়া যাইবে। এই গুরুকে ভজন করিতে যাইয়া লালন মুসলমান সাধনধারার 'পীর-ভক্তিকে' ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এখানে আসিয়া বৈষ্ণব 'সহজিয়া' সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই মানুষ ভজনের সাধন পদ্ধতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে মুসলমানী কেতাব হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া ইহাকে তিনি আরও লোকপ্রিয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে মুসলমান ধর্মের প্রতি তাঁর যে আন্তরিক একটী টান ছিল তাহা বুঝা যায়। কারণ নিজের ধর্ম্মমতকে তিনি মুসলমান ধর্মের সাথে মিলাইয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শুনতে পাই চাইর কারের আগে
সাঁই-আশ্রয় করেছিলেন রাগে
এবে সে অটল রূপ ঢেকে
মানুষ রূপ লীলা জগতে দেখায়।

লামে আলেক লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছেন তেমন
তা নইলে কি সব নুরীস্তন
আদম তনের 'সেজদা সালাম' জানায়।

সৃষ্টির প্রথমে সমস্ত ফেরেস্তারা আদমকে সেজদা ও সালাম করিয়াছিল। আজাজিল মানুষকে তুচ্ছজ্ঞানে 'সেজদা' করিল না তাই তার সব জপতপ বৃথা গেল। শয়তান হইয়া সমস্ত বিশ্বের অভিসম্পাৎ সে কুড়াইতে লাগিল। তাই মানুষকে না ভজিলে খোদাকে পাওয়া যাবে না। কারণ-

স্বয়ং রূপ দর্পণে ধরে মানব রূপ সৃষ্টি করেছে

দিব্য জ্ঞানী যারা ভাবে বোঝে তারা
মানুষ-ধ'রে কার্য্য সিদ্ধ কার লয়।

কিন্তু মানুষকে ধরিলেই কি খোদাকে পাওয়া যাইবে? মানুষ ভজিতে যাইয়া সীমার মধ্যেই ত ডুবিয়া যাইব। সেই 'অনাদি অনন্তস্বকে ধরিব কেমন করিয়া? লালন কেমন জলের মত প্রশ্নটীর উত্তর দিতেছেন। শুনুন-

যেমন, মূল হ'তে হয় ডালের সৃজন
ডাল হ'তে পায় মূল অন্বেষণ হে

তেমনি রূপ হ'তে স্বরূপ
তারে ভেবে রূপ
অধীন লালন সদা নিরূপ ধরতে চায়।

ধরিতে গেলে, "সীমার মাঝে অসীম তুমি" বলিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এই মানুষ ভজনের রীতি লালনই নূতন বলেন নাই। ইহার পূর্ব্বে লুই সীদ্ধাই হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত অনেকেই এই মানুষ ভজনের বীজ বাংলার মাটীতে বপন করিয়া গিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস কহে শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ ভজন তাহার উপরে নাই।

তাই লালনের এই মত মুসলমান সমাজের ধর্ম্ম নীতির সাথে খাপ্ না খাইলেও বাংলার মাটীতে ইহা অসহ্য হইল না।

যদিও লালন তার মানুষ ভজনের পদ্ধতি মুসলমান পৌরাণিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মতের সাথে মেলে না, মুসলমান শাস্ত্রের এমন বচন সকলের তিনি প্রতিবাদ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার যুগে নিজের মত এরূপ নির্ভীকভাবে প্রচার করা কম সাহসের কাজ নয়। তাহার জন্য লালনকে কম সংগ্রাম করিতে হয় নাই। সে কথা পরে বলিতেছি।

এই মানবদেহই যখন সবার চাইতে তাঁর কাছে বড় বলিয়া মনে হইল তখন বাহিরের মক্কা মদিনায় যাইয়া তাঁর কোন্ প্রয়োজন?-

আছে আদ্‌মক্কা এই মানবদেহে
দেখনারে মন ভেরে
দেশ দেশান্তর দৌড়িয়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে
করে অতি আজব তাক্কা
গম্বঠেছে সাই মানুষ মাক্কা।

আর একটা গানে এই মক্কা সম্বন্ধে লালন বলিতেছে,-

গুপ্তপুরে হজ হতেছে
ষোলজন গুণরী আছে
দ্বারবানে চার জনে।

এই মক্কায় হজ করিবার সত্যকার সন্ধানটী লালন পাইয়াছিলেন।-

কুরমানের ময়দানে যাও
নিজেকে কুরমানী দাও।
নবিজীর ফরমানে
তবে তুই হবি হাজি
আল্লাজী হবে রাজী।
খোদে খেদ বলে।

বহুদিন পূর্বেই লালন কোরবানী সম্বন্ধে যেরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন এরূপ কোরবানী বা বলিদান হিন্দু বা মুসলমান সকলেরই শ্রাস্ত্রসঙ্গত।

রোজা নামাজ যা নাকি মুসলমানদের অবশ্য কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে লালন কি বলিতেছেন শুনুন,-

না পড়িলে দায়মী নামাজ
সেকি রাজি হয়
কোথায় খোদা কোথায় সেজদা-
করি সদার।
মাস্তা আহুদ কারা রাহু
বুঝিতে হয় বোঝ কেহ
দিন বয়ে যায়
এক আয়াত কর তফাক করণ
বোঝ তার মাতেন কেমন
কুলুর বলদের মত ঘুরার কাজ নয়।

অর্থাৎ খোদাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিয়া তবে নামাজ পড়িতে হইবে। এখন এই সাক্ষাৎ ভাবে সেই অসীম অনন্তকে কিরূপে জানিব? সুতরাং তাহাকে সাক্ষাৎ না জানিয়া সাধারণে যে নামাজ পড়ে উহাতে খোদাকে পাওয়া যাইবে না।

এমন কি লালন হজরৎ মহম্মদকেও (দঃ) আসল মহম্মদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাঁর মতে খোদার নুরে মহম্মদের সৃষ্টি হইল আর মহম্মদের নুরে জগৎসংসারের সৃষ্টি হইল। অতএব সৃষ্টি তাঁর কাছে সন্তানতূল্য। জন্মগ্রহণ করিয়া সেই মহম্মদ (দঃ) আপন সন্ততিকে বিবাহ করিলেন কেমন করিয়া? তবে আসল মহম্মদ কে? (দঃ)

আসমান জমীন জলাদি পবন
যে নবির নুরে হয় সৃজন
কি সে ছিল সেই নবির আসন
নবি পুরুষ কি প্রকৃতি ছিল ততক্ষণে।

তবে এই নবিই কি মহম্মদ (দঃ) হইয়া মদিনায় আসিয়াছিলেন? লালন বলিতেছেন-

যে নবি পারের কাণ্ডার
জেন্দা সে চাইর কারের উপর
ছায়াতল মোর ছলিম নাম তার
সেই জন্যে কয়।

তাই মদিনার মহম্মদ (দঃ) আসল মহম্মদ (দঃ) নয়। কেননা সত্যকার নবি চার কারের* উপরেও জীবিত আছেন। তাঁর মরণ নাই। তাই লালন দুই নবিকে পৃথক করিয়া দেখাইতেছেন।

কোন্ নবি হ'লো উফাৎ
কোন নবি বান্দার ছয়াৎ
নিহাস করে জানলে নেহাস
যাবে সংশয়।

সেই সত্যকার নবি তবে কোথায় আছেন? লালন তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন।-

যে নবি অঙ্গে তোরো
চিনে তার দাওন ধর
লালন বলে পারের কারও
সাধ যদি হয়।

ফল কথা এই দেহের মধ্যেই লালন তাঁর সকল খুঁজিয়া পাইয়াছেন। খোদাকে তালাস করিতেও লালন বাহিরে ঘুরিবেন না-

যারে আহাশপাতাল খুঁজে মরিস
এই দেহে সে রয়।

---

* অন্ধকার, নৈরাকার, ধন্দকার, কুয়াকার - প্রবন্ধকার

এই সব কারণে মুসলমান মৌলবীরা লালনকে বড় একটা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই মাঝে মাঝে লালনের সাথে তাঁহাদের বাদপ্রতিবাদ চলিত। কুমারখালির মধ্যে চড়ুইখালির বাদলসা ফকীরের বাড়ীতে তীরাম মুন্সী ও পেটরা নামে দুইজন মুসলমান মৌলবীর সাথে একবার লালন, ফকিরী-তত্ত্ব লইয়া বিচার করেন। কথিত আছে যে লালনের সাথে তাঁহারা তর্কে পারিয়া উঠেন নাই।

লালনের সাথে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক অনেক জায়গায়ই হইয়া গিয়াছে। তার সবগুলির বিবরণ জানিতে পারা যায় না। তবে পাবনার অন্তর্গত রাধানগর কেছু নওয়ারীর বাড়ীতে মুসলমান মৌলবীদের সাথে যে সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহা খুব প্রসিদ্ধ। লালন যখন অন্য কোন জায়গায় যাইতেন তখন ৫০/৬০ জন লোক প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। কেছু নেওয়ারীর বাড়ীতে লালন গেলে সেখানকার মৌলবীরা প্রায় একশত লোক জুটিয়া লালনের সাথে বিচার করিতে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য যে এই সব লোক কেবল বাক-যুদ্ধ করিতেই আসিয়াছিল না। তাহারা লাঠি সড়কি লইয়া সংগ্রামের অপেক্ষায় প্রস্তুতও হইতেছিল। এইসব লোক দেখিয়া হয়ত কিঞ্চিত ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। মৌলবীরা প্রথমে মিষ্টি ভাষায় ফকীরকে আহবান করিল। ফকীরের দুই চারিটি মিষ্টি কথা শুনিয়াই তারা ধন্য হইতে চায় এইরূপ অনেক কথা বলিল। লালন কিন্তু ঘর হইতে বাহিরই হইলেন না।

ইতিমধ্যে কেছু গ্রামের জমীদার মন্মথবাবুকে যাইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। মন্মথবাবু কেছুকে অভয় দিয়া দুইটী লোক থানায় প্রেরণ করিলেন এবং বহু লোকজন লইয়া কেছুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের গোপাল ডাক্তার কিশোরী বাবু প্রভৃতি আসিয়া ফকীরকে অভয় দিলেন এবং মুসলমান মৌলবীদের সাথে ফকীরকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তখন লালন আসিয়া সকলের মধ্যে উপবেশন করিলেন। মৌলবীদের মধ্যে কি এক খোন্‌কার ফকীরের সাথে একটী কথা লইয়া তর্ক করিতেছেন এমন সময় গোপাল ডাক্তার উঠিয়া বলিলেন, শোন খোন্‌কার সাহেব। তুমি এসেছ ফকীরের সাথে বাহেজ করতে। মাসের মধ্যে তিনবার আমি চিকিৎসা করি তোমার গর্ম্মীর ব্যায়ারাম। এই কথা শুনিয়া খোনকার সাহেবের মুখ ত চূণ হইয়া গেল। তখন মন্মথবাবু উঠিয়া বলিলেন, "তোমরা ফকীরের সাথে বিচার করিতে আসিয়াছ তবে লাঠী ঢাল আনিয়াছ কেন? কেউ যদি ফকীরের গায়ে হাত তুলবে ত তার মাথা থাকবে না।" এমন সময় থানা হইতে ৫/৭ জন পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাদের দেখিয়া মৌলবীদের লোক সকল এদিক সেদিক সরিয়া পড়িল। খোন্‌কার সাহেবও তাদের সহিত চম্পট দিলেন।

তখন লালন আপনার স্বরচিত গান সকল গাহিতে লাগিলেন। গ্রামের জমীদার ও প্রজা একসঙ্গে সেই গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। এইখানে বলিয়া রাখি যে উপরোক্ত দুইটী ঘটনা ভোলাইসার নিকট আমরা শুনিয়াছি।

লালনকে হতভাগা পল্লীকবি বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বস্তুতঃ লালন নিভৃত পল্লীক্রোড়ে যশের যে সিংহাসনখানি গড়িয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের কাছেই লোভনীয়। বলিতে

গেলে সারা বঙ্গদেশে এমন গ্রাম নাই যেখানে লালনের গান জানা একটী লোক না আছে। মাঠে ধান কাটিতে কাটিতে, মাঠ হইতে গরু লইয়া আসিতে আসিতে কৃষাণ-কণ্ঠে লালনের এই গান যখন সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়ে তখন নিশ্চয়ই পরপার হইতে এই পল্লীকবি একটা বিরাট তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীজলধর সেন তাঁর কাঙাল হরিনাথের জীবনীতে লিখিয়াছেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে শিলাইদহের কাছারীতে লালনকে আহবান করিয়া তার গান শুনিয়াছেন। একবার তিনি প্রবাসী পত্রিকায় লালনের কতকগুলি গান ছাপাইযাছিলেন। গত ১৩৩২-এর শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু লিখিতেছেন "বঙ্গের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এমনকি স্বর্গীয় মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিলাইদহে নৌকায় লইয়া ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মাঝে মাঝে লালনকে লইয়া ৬/৭ দিন তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া বিবিধ ধর্ম্মালাপ করিয়াছেন। এমনকি যে সুপ্রসিদ্ধ ফিকিরচান্দের বাউল সম্প্রদায় এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশকে ভাব-বন্যায় ডুবাইয়াছিল, লালনের গানের প্রভাব হইতেই যে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল একথাটী শ্রদ্ধেয় জলধর বাবু তাঁর কাঙাল হরিনাথের জীবনীতে বেশ স্পষ্টভাবেই বলি গিয়াছেন। এই সব হইতে বোঝা যায় লালন শুধু অশিক্ষিত সমাজেই আদর লাভ করেন নাই। বস্তুতঃ শিক্ষিত সমাজেও তাঁর প্রভাব কম ছিল না।

১১৬ বৎসর বয়সে লালন দেহত্যাগ করেন; তাঁহার বাড়ীতেই তাঁহার দেহ কবরস্থ করা হয়। মরিবার পূর্ব্বে মুসলমান মোল্লা ডাকিয়া তাঁহার 'জানাজা' করিতে লালন তাঁর শিষ্যদিগকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাই লালনেরই কোন ফকীর শিষ্য বাউল সম্প্রদায়ের মতে তাঁহার মৃত দেহের সৎকার করেন। কিছুদিন হইল ভোলাই সা এই কবরের উপর একখানা ছোট্ট কুঠরী করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে আলো দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে দূর হইতে ভক্ত শিষ্যরা আসিয়া এই কবরের সামনে বসিয়া গান গাহে।

লালনের গানগুলি পড়িয়া দেখিলে তাহার মধ্যে কবিত্ব খুব কমই পাওয়া যায়। তার কারণ তিনি সেই সব গানে কেবল তত্ত্ব-কথা বলিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। লালনের আবাসের চারিদিকে অগণিত বাঁশের ঝাড়। তাহা দেখিয়া লালন বুঝিয়াছেন-

চন্দন কাঠের সকলি সার
শুধু সার জানা বাঁশের সার হয়না।

পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য কবিদের গানে যেমন কবিত্বের প্রাচুর্য্য দেখা যায় লালনের গানে তাহার বড় অভাব।

নিশার শোভা শশীরে শশীর শোভা তারা
তারার শোভা সৌদামিনী গগনে হায় হারা (বারমাসী)

এরূপ পদ যদি কেহ লালনের গানে আশা করেন তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে। পূর্ব্ব বঙ্গের ভাব-জগতের ঠাকুর শানালের সম্প্রদায়কে লালন বড় ভাল চোখে দেখিতেন না।

তাঁহাদের ভাবের উচ্ছ্বাস ও দরগাতলায় গড়াগড়ীকে লালন অনেক ঠাট্টা করিয়াছেন

অথবা

"যদি ভজবিরে লাসরি কালা
কেনে ঘুরে বেড়াও কালকে তলা
বুঝি খাবিরে নৈবিদ্যি কলা
করছাও এইডা ফিকিরী"

অথবা

যার দরগাতলা মন ম'জেছে
সেকি ভাবের ভাব পারছে

বস্তুতঃ ভাবকে সংযমে আনিয়া সাধনের স্তর হইতে স্তরে উঠাই লালনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তার জন্য শুধু নাকি কান্না করিলে চলিবে না। একান্তে বসিয়া নিভৃত সাধনা চাই। তার গানগুলি ভরিয়া এই সাধন পথের বর্ণনাই লালন করিয়া গিয়াছেন।

যে পথে সাই চলে ফেরে
তার অন্বেষণ কে করে
বিষম কালনাগিনীর ভয়
অমনি উঠে ছোঁ মারে

এই পথে চলিবার জন্য বাউল সম্প্রদায়ে যেসব গোপনীয় সাধন প্রণালী আছে, তাহা কেবল আত্মসংযম ব্যতীত আর কিছু নহে। এক কথায় ইহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের সেই-

জলেতে নামিবে জল না ছুঁইবে

উপদেশটী লালন পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এক সময়ে নারীকে বাদ দিয়া সাধনের পথ এ দেশের সাধু মহাজনেরা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু নরনারীর মিলন, মানব প্রকৃতির এই চিরন্তন সত্যটীকে অতিক্রম করিবার শক্তি যে মানুষের নাই এ কথাটীকে তাঁহারা অনেক আত্ম-লাঞ্ছনায় অনুভব করিয়াছিলেন। লালনের সাধনের পথ তাই-

"রসিকের তেমনি করণী
মারে মৎস্য না ছোয় পানি
ও সে আকর্ষণে আনে টানি
ক্ষীরোদ শশী"

তাই যাদের-

মন মাতঙ্গ মদন রসে
সদাই ফেরে সেই আবেশে

তাদের,-

"লালন বলে শুধু মিছে
লবলবানি প্রেমতলা

যদিও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি লালনের গান রচনার উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বকথার প্রচার করা, কবিত্ব ফুটাইয়া তুলা নয়, তবুও মাঝে মাঝে এই কঠোর তত্ত্বকথার ফাঁক্ দিয়া কবিতাসুন্দরী তাঁর স্বর্ণকমলের শতদল মেলিয়া ধরিয়াছেন।

যেমন-

এক নিরিখে দেখ ধনী
সূর্জ্জগৎ কমলিনী
দিনে বিভাসিত তেমনি
নিশীতে মুদিত রহে

অথবা-

লীলা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
ডেঙ্গা বয়ে যায়

০ ০ ০

ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে
ফল ধরে তার অচীন দলে
যুক্ত হয় সে ফুলে ফলে
তাতে কয় কথা।

প্রভৃতি পদে যদিও মানুষের জন্মতত্ত্ব প্রচার করা হইয়াছে তবুও বাহির হইতে ইহার কবিত্ব আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

বাংলার একটী শ্রেষ্ঠ রত্ন, তাঁর জীবনের অনেক মহিমা অনেক প্রভাব লইয়া নিভৃত পল্লীক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন- তাঁর জীবনের বহু শিক্ষাপূর্ণ ঘটনা, বহু সঙ্গীত আজও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সেগুলি যে আমাদের জাতীয় জীবনের একটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য গান সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। এদিকেও কি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি না?*

-শ্রী জসিম উদ্দিন

---

* এই প্রবন্ধের মালমসলা সংগ্রহ করিতে ফরিদপুর সাহিত্য সমিতি আমাকে ৬ টাকা সাহায্য করিয়াছেন এবং উক্ত সমিতির শ্রদ্ধেয় সম্পাদক বাবু অবনীমোহন চক্রবর্তী এবং বাবু কিরণচন্দ্র ঘোষ মহোদয় আমাকে নানা দিক্ দিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মহত্তম অভিজ্ঞতা। এর পটভূমিতে আছে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত দীর্ঘকালের সংগ্রাম ও সাধনার ইতিহাস। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাই ছিল এই দীর্ঘকালের সংগ্রামের ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর দুই দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দুই দশকে আমাদের জীবনে আলোড়ন তুলেছে বহু বিচিত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ; আমাদের চিন্তা ও চেতনায় পড়েছে তার অভিঘাত। বাংলাদেশের এই দুই দশকের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের এই সব নানা মাত্রার অভিজ্ঞতা। একালের সাহিত্য আমাদের নানা প্রত্যয় প্রতিশ্রুতি আশা হতাশা নবতর প্রত্যাশা ও সংকল্পেরই রূপায়ণ। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের এই সময়ের কবিতার কয়েকটি প্রধান প্রবণতা বিবেচনা করব- মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে।

এক অর্থে হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে'[১] আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম কবিতা। সেই যে আমরা "ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ ক'টি বছরের/ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি" দাঁড়িয়েছিলাম সেই "স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসেঃ আমরা ক্রমে স্বাধীনতার পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। সেদিন 'কৃষ্ণচূড়ার মেয়ে'[২] যে "এক ঝাঁক নাম" মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেই শহীদের শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিল শত লক্ষ শহীদ বাঙালী।

বাংলাদেশে অবশেষে
অত্যাচারী শত্রু মরে
প্রিয়জনের লাশের শপথ
পোড়াঘরের ভিটের শপথ
অস্ত্রহাতে বাঙালীরা বাংলাদেশে
শত্রু রোখে
বাংলাদেশের সবুজ পটে
সূর্য ওঠে
সহজে নয়
লক্ষ শহীদ ভায়ের গাঢ়
রক্ত স্নানের দুরন্ত অন্তিমে।[৩]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতেই সিকান্দার আবু জাফর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হানাদার পাকিস্তানী শাসকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ

তুমি আমার জলস্থলের
মাদুর থেকে নামো
তুমি বাংলা ছাড়ো।[৪]

উল্লেখযোগ্য যে, ১৩৭২ সালে তিনি যে উদ্দীপনার বলিষ্ঠ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলঃ

আমাদের সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।[৫]

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারাই কবিতা লিখেছেন- মুক্তিযুদ্ধের সূচনায়, মুক্তিযুদ্ধের কালে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে- তাঁদের সবার কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে সংকল্প ও সংগ্রামের এই প্রত্যক্ষ উচ্চারণ। একই অনুভবের শিখায় জ্বলে উঠেছেন তাঁরা- বেজে উঠেছে সম্মিলিত প্রবল দুন্দুভি। আপন ছন্দ স্পন্দে দাঁড়িয়েও জসীমউদ্‌দীন রচনা করেছিলেন 'মুক্তিযোদ্ধা'র নির্ভুল স্বরূপঃ

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী জাগে।
কখনো সে ধরে রেজাকার বেশ, কখনো সে খান সেনা,
কখনো সে ধরে ধর্মলেবাস পশ্চিম হতে কেনা।
কখনো সে পশি ঢাকা বেতারের সংরক্ষিত ঘরে,
ক্ষেপা কুকুরের মরণ কামড় হানিছে ক্ষিপ্ত স্বরে।

আমি চলিয়াছি চির-নির্ভিক অবহেলি সব কিছু
নরমুণ্ডের ঢেলা সাজাইয়া পশ্চাত-পথ পিছু।
ভাঙিতেছি স্কুল ভাঙিতেছি সেতু স্টিমার জাহাজ লরি,
খান-সৈন্যরা যেই পথে যায় আমি সে পথের অরি
ওরা ভাড়া-করা ঘৃণ্য গোলাম স্বার্থ-অন্ধ সব,
মিথ্যার কাছে বিকাতে এসেছে স্বদেশের বৈভব!

আমরা চলেছি রক্ষা করিতে মা-বোনের ইজ্জত,
শত শহীদের লহুতে জ্বালানো আমাদের হিম্মত।
ভয়াল বিশাল আঁধার রাত্রে ঘন-অরণ্য ছায়,
লুণ্ঠিত আর দগ্ধগ্রামের অনল সমুখে ধায়।
তাহারি আলোতে চলিয়াছি পথ, মৃত্যুর তরবার,
হস্তে ধরিয়া কাটিয়া চলেছি খান-সেনা অনিবার।

এ সোনার দেশে যতদিন রবে একটিও খান-সেনা
ততদিন তরে মোদের যাত্রা মুহূর্তে থামিবে না।
মাঠগুলি পুনঃ ফসলে ফসলে পরিবে রঙিন বেশ,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি গড়ায়ে ছড়ায়ে ভরিবে সকল দেশ।
মায়ের ছেলেরা হবে নির্ভর, সুখ হাসি ভরা ঘরে
দস্যুবিহীন এদেশ আবার শোভিবে সুষমা ভরে।[৬]

বেগম সুফিয়া কামালের কণ্ঠে জাগে প্রত্যাশার দীপ্তিঃ

আজ তাই মুক্তিকামী সাত কোটি মানুষের প্রাণ
প্রাণধর্মে মৃত্যুলঙ্ঘি মুক্তিপথ করিছে সন্ধান।
অপূর্ব সে অন্বেষণ ব্যর্থ নাহি হবে,
শহীদ শোনিতে পথ সিক্ত হয়ে বিথারিয়া রবে।
চৈত্রের রজনী কেটে যায়
নবীন বৈশাখে দীপ্ত নবজীবনের প্রত্যাশায়।[৭]

ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'আমার পূর্ব বাংলা'[৮] কবিতা রচনার কাল থেকেই সৈয়দ আলী আহসান পাকিস্তান-প্রত্যয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন নতুন প্রতিশ্রুতিঃ

১। দ্বিখণ্ডিত শিশুর মৃতদেহ নিয়ে
অট্টহাস্যে যারা রাত্রির নীরবতাকে
ভয়াল করলো,
যারা আমার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করবে ভেবে
সকালবেলার শিশিরকে রক্তিম করলো-
(মাতৃদুগ্ধের মত স্রোতস্বিনী
অজস্র শবের আর্তদৃষ্টি নিয়ে প্রবাহিত)
মধ্যযুগের অন্ধকারকে লজ্জিত করে
যে-সব সারমেয় তাদের করাল
দ্রংষ্ট্রারেখায় আমাকে
আতুর করতে চাচ্ছে
আমার প্রতিদিনের শব্দে তাদের
ধ্বংস উচ্চারিত হোক,
মাতৃভূমি আমার, আমার সপ্রেম
অনুরাগকে যারা কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে
আমার অজেয় শব্দে
তাদের সর্বনাশ চিহ্নিত হোক-
আমার প্রতিদিনের শব্দে।[৯]

২। পাহাড়ের আড়ালে ছায়া নেমেছে, ছায়ায় আমরা
গাছের পাতায় হেলমেট ঢেকে
প্রকৃতির শরীর হয়ে
শত্রুর অপেক্ষায় উৎকীর্ণ।
বাইনোকুলরে চোখ লাগিয়ে
দূরপথ, বনভূমি, পাহাড়ের চূড়া
লক্ষ্য করছি-
অসম্ভব নির্জন চতুর্দিক-
মানুষ নেই, কুকুর নেই, পাখী নেই;
অন্ধকারের মতো যে অত্যাচার নেমে আসছে
তাকে বাধা দেব
তাই আমরা অপেক্ষা করছি।

অশ্রুহীন নির্মম প্রতিজ্ঞায়
আমি অপেক্ষা করছি
একদিন যে জীবনে বাতাস, দৃষ্টি ও সূর্য ছিলো
আজকের ধ্বংস স্তূপের উপর
সে জীবনকে আবার
দীপ্যমান করবো।[১০]

৩। সময়ের অনেক গভীরে ডুব দিয়ে
আমি আমার স্বদেশকে পেয়েছি।[১১]

৪। হে আমার স্বাধীনতা
যে তরঙ্গগুলো আমাকে ধ্বংস করতে চায়
তোমার সাহায্য নিয়ে
সে সমস্ত ভয়ের উৎক্ষিপ্ত তাণ্ডবকে
আমি অতিক্রম করবো।[১২]

আহসান হাবীব কিশোরের হৃৎস্পন্দে ধ্বনিত 'স্বাধীনতাকে মহত্তম অস্ত্র' বিবেচনা করে লিখেছিলেন

বুকের গভীরে
মহত্তম সেই অস্ত্র যার
দানবের স্পর্শযোগ্য অবয়ব নেই কোনো
ধ্বনি যার অহরহ প্রাণে তার বাজায় দুন্দুভি
স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা।
আর সেই প্রিয়তম মহত্তম অস্ত্র বুকে
লুকিয়ে সন্তর্পণে ধীর পায়ে
অনন্য কিশোর তার
সঠিক গন্তব্যে যায় হেঁটে।[১৩]

শপথ-প্যারেডেঃ তোমাদের মনে রাখা প্রয়োজন
এই যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ; বিশ্বাসঘাতক নয়, আজ
সৌন্দর্যের প্রকৃত প্রেমিক চাই; তোমাদের কাজ
নয় মোটে সাহজিক। আনন্দের রক্ষণাবেক্ষণ
অত্যন্ত দুরূহ কর্ম- অনেকের ঘটে অন্তর্জলি।
সত্যের বিরুদ্ধে নয়, আজীবন সপক্ষে লড়াই।"[২৯]

মুস্তফা আনোয়ারের কণ্ঠে শুধু শত্রু হত্যার প্রতিশ্রুতিঃ

ঘর নেই, বোন নেই, ভাই নেই, নেই নেই,
মা-রে আমার কিছুই নেই-শুধু ক্ষুব্ধ রাইফেল
দাঁতে দাঁত চেপে খুঁজে ফেরে শত্রুর খুনী ছাউনী;
লোভাতুর হাত শুধু চায় শত্রুকে হত্যার
হত্যার হত্যারি এই বিনিদ্র রক্তাক্ত উল্লাস।[৩০]

শত্রুর বিরুদ্ধে নিজের হৃদয়কে সবচেয়ে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র বলে চিহ্নিত করেন নির্মলেন্দু গুণঃ

পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
সন্দিগ্ধ সৈনিক। সামরিক নির্দেশে ভীত মানুষের
শর্টগান, রাইফেল, পিস্তল এবং কার্তুজ যেন দরগায়
স্বীকৃত মানৎ-টেবিলে ফুলের মত মস্তানের হাত
আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী- প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে
অথচ আমার সঙ্গে
হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র
আমি জমা দিইনি।[৩১]

হুমায়ুন আজাদ লেখেন 'মুক্তিবাহিনীর জন্যে' আবাহনঃ

তুমি পা রাখলেই অকস্মাৎ ধ্বংস হয় শত্রুর কংক্রিট বাংকার
তুমি ট্রিগারে আঙুল রাখতেই মায়াবীর মতো যাদুবলে
পতন হয় শত্রুর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ঢাকা নগরীর।

এবং মুহম্মদ নূরুল হুদা ষোলই ডিসেম্বরকে চিহ্নিত করেন 'বাঙালীর জন্মতিথি' নামেঃ

তোমাদের হাড়গুলে বাঙলার হৃৎপিণ্ডে অবিনাশী ঝড়
বাঙালীর জন্মাতিথি, রক্তে লেখা ষোলো ডিসেম্বর।[৩৩]

মাহবুব সাদিকের 'যজ্ঞভাসানে'[৩৪] মুক্তিযুদ্ধের প্রবল স্মৃতি ও সংকল্প গাথা।

আক্রান্ত স্বদেশের ছবি এঁকেছেন ফজল শাহাবুদ্দীনঃ

'পোড়ে গ্রাম মসজিদ শহীদ মিনার জিঞ্জিরায়
নদী আর চকবাজারের
পবিত্র প্রাচীন আজানের ধ্বনি
চোখ বাধা হাতে রজ্জু ট্রাকে বাসে জীপে
দেখি অসহায় বাংলাদেশ প্রতিদিন কেঁপে ওঠে
হিজল ফুলের মতো মালাগাঁথা মৃতদেহ হয়ে
রক্তমাখা

ভেসে যায় বুড়িগঙ্গায় তিতাসে
ধানের ক্ষেতের পাশে কাশবনে শকুন কুকুর
আর চিলদের বিশুদ্ধ উৎসবে'[২১]

একাত্তরের বাংলাদেশকে তিনি তুলনা করেন ভিয়েৎনামের সঙ্গেঃ

বাংলাদেশ আগুনলাগা শহর আর লক্ষ গ্রাম
বাংলাদেশ দুর্গময় ক্রুদ্ধ এক ভিয়েৎনাম[২২]

মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেনঃ

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো ভয়ঙ্কর দুরন্ত দুর্বার
এ আঁধার করো ছিন্ন ভিন্ন
ভাসাও তোমার ভেলা রক্ত স্রোতে। মৃত্যু নেই আর
জল্লাদেরা নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন।[২৩]

আক্রান্ত স্বদেশকে 'ক্যামোফ্লাজ' নিতে বলেন আল মাহমুদ, কেননাঃ

প্রাণের ওপরে আজ লতাগুল্ম পত্রগুচ্ছ ধরে
তোমাকে বাঁচতে হবে হতভম্ব সন্ততি তোমার।[২৪]

আবু বকর সিদ্দিক বর্ণনা করেন মুক্তিযুদ্ধের সূচনা মুহূর্তঃ

আমি জানি বাংলাদেশের মানচিত্র ক্রমশঃ কুকড়ে যাচ্ছে
সাতচল্লিশ থেকে একাত্তুরে
চারধারে বর্ডার লাইন ক্রমাগত বুকের দিকে এগিয়ে আসছে
হৃৎপিণ্ডে কামড় বসাতে
আর ততই তুমি দূরতর হচ্ছো।[২৫]

আবু বকর সিদ্দিক অবশ্য উচ্চারণ করেন 'শপথের স্বর'ঃ

আমি আসবো
হেটে হেটে রক্তাক্ত পায়ে
ছোবল ও তরঙ্গগুলো মাড়িয়ে
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে।
আর-
ডান হাতের মুঠোয় আমূল উপড়ে আনবো
আস্ত এক শপথের চারা
তোমার জন্যে।[২৬]

'ব্লাক আউটের পূর্ণিমায়' শহীদ কাদরীর মনে হল বাংলাদেশের নিসর্গ আমাদের প্রতিরোধের সহায়ঃ

আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিল নিদারুণ নির্বিকার,
সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায়,
ব্লাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বেলে দিলে
বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি
আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হয়ে নিজেদের ঘরে।[২৭]

আসাদ চৌধুরী আঁকলেন পাকিস্তানী বর্বরতার চিত্র, প্রবল ঘৃণায়ঃ

তোমাদের কাগজে নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খাঁর ছবি ছাপা হয়-
বিবেকের বোতামগুলো খুলে হৃদয় দিয়ে দ্যাখো
এটা একটা জল্লাদের ছবি
পনেরো লক্ষ নিরস্ত্র লোককে ঠাণ্ডা মাথায় সে হত্যা করেছে
মানুষের কষ্টার্জিত সভ্যতাকে সে গলা টিপে হত্যা করেছে
অদ্ভুত যাদুকরকে দেখ
বিংশ শতাব্দীকে সে কৌশলে টেনে হিঁচড়ে মধ্যযুগে নিয়ে যায়

দেশলাইর বাক্সের মত সহজে ভাঙে
গ্রন্থাগার, উপাসনালয়, ছাত্রাবাস,
মানুষের সাধ্যমত ঘরবাড়ি
সাত কোটি মানুষের আকাঙ্খিত স্বপ্নের ফুলকে সে বুটজুতোয় থেতলে দেয়[২৮]

রফিক আজাদ উচ্চারণ করেন 'সৈনিকের শপথ প্যারেডে' অধিনায়কের বাণীঃ

ট্রিগারে আঙুল রেখে, পুনর্বার, বুঝে নিতে চাই
অধিনায়কের কণ্ঠে উচ্চারিত গাঢ় শব্দাবলি

ভাষা আন্দোলনের 'স্মৃতিস্তম্ভের' কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ তীব্র প্রশ্ন উত্থাপন করলেনঃ

আরো কতবার মরবো স্বাধীনতা
ওগো স্বাধীনতা তোমার জন্য? গুলিতে গুলিতে জর্জরিত
আমার মুখ
উৎপাটিত আমার চোখ এবং একটি একটি করে
তুলে নিয়েছে
ওরা আমার বুকের পাঁজর, চামড়া কেটেছে, জ্বলন্ত অঙ্গসিতে
টেনে বার করেছে আমার জিভ ও হৃৎপিণ্ড...
আরো কত দাম দিতে হবে বলো। বলো বলো।[১৪]

একই অনুষঙ্গে শামসুর রাহমান ব্যক্ত করলেন দৃঢ় প্রত্যয়ঃ

আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে-
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে
নতুন নিশান উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।[১৫]

মুক্তিযোদ্ধাকে সন্তানরূপে সম্বোধন করেছেন আহসান হাবীব,[১৬] আবুল হোসেন[১৭] ও শামসুর রাহমান।[১৮]

আর হাসান হাফিজুর রহমান 'অমর একুশে' কবিতার মত আবারো বাংলাদেশকে দেখেছেন চিরন্তন মাতৃরূপেঃ

শত কোটি লাঞ্ছনার তিক্ত দাগ সারা দেহে সয়ে
আজো তুমি মাতা, শুচিশুদ্ধ মাতা সাত কোটি সংশপ্তক
সন্তানের অকাতর তুমি মাতা।

প্রেম অবারিত হবে বিজয়ের ধারাজলে, রৌদ্রে জোছনায়।
শত শতাব্দীর অবগুণ্ঠিত আশা পূর্ণ কম্বরে
মোছাব তোমার মুখ তোমারই আপন পতাকায়।[১৯]

'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানের রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরীও দেশকে জননী বলে সম্বোধন করেছেন,

আমার দুখিনী বাংলা
মা, তুই আমার জননী।[২০]

এই সংক্ষিপ্ত বিবেচনায় আমি যে নানা মাপের কবির কবিতা উপস্থাপন করেছি তার মধ্য দিয়ে যে মূল কথা তুলে ধরতে চেয়েছি তা হল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের সংকল্প ও সংগ্রামের প্রত্যক্ষ উচ্চারণে বেজে উঠেছিল সম্মিলিত প্রবল দুন্দভি। মনে রাখা প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রবল কালে রচিত হয়েছে এই সব কবিতা।

এখানে উল্লেখ করা সম্ভবত অসমীচীন হবে না যে 'জার্নাল ১৯৭১' শিরোনামে 'তেইশে মার্চ,' 'চব্বিশে মার্চ' ও 'পঁচিশে মার্চ' নামে আমি যে তিনটি কবিতা লিখেছিলাম প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সূচনার মুহূর্তে তার প্রথমটি চব্বিশে মার্চ ৭১ তারিখে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে আমি প্রচার করেছিলাম। তিনটি কবিতাই একসঙ্গে ও আলাদা আলাদাভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তীকালে বহুবার মুদ্রিত হয়।

আবার বুকের রক্তে বাংলার শ্যামল প্লাবিত
যেন কোন সবুজাভা নেই আর, সকল সবুজে
ছোপ ছোপ লাল রক্ত, আর সেই
সবুজের বক্ষদীর্ণ রক্তের গোলকে
সোনার বাংলার ছবি

মুহূর্তে পতাকা হয়ে দোদুল বাতাসে;
হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক,
মুদির দোকানে,
বাংলার সকল ভবনে, কুড়ে ঘরে
জনতার হাতে হাতে
সাত কোটি বাঙালীর বুকের শোনিতে আঁকা
উক্রীন পতাকা।
কারফিউ, বেয়োনেট, বুলেট, মেশিনগান
আর কত রক্ত নেবে বলো। সব রক্তধারা
এই বাংলার সবুজ পটে
বিতুল প্রগাঢ় এক লাল বৃত্ত
হয়ে যায়, হয়ে যাচ্ছে, যাবে;
শত নদ নদী ধৌত উর্বর শ্যামল বাংলা
ক্রমে ক্রমে প্রতিরোধে জমাট দুর্জয়;
সাত কোটি বেরিকেড
রক্তাক্ত তরুণ সূর্য
দুর্ভেদ্য অজেয়।[৩৫]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বর্বরতার প্রত্যক্ষ পটভূমিতে ঐ সময় আমি লিখেছিলাম 'ঘৃণা-ক্রোধের বারুদ' কবিতাটিঃ

ঘরের মধ্যে ঢুকলো মিলিটারী
ছড়িয়ে দিল গুড়ো এবং
জ্বালিয়ে দিল আগুন
মুহূর্তে সব ভস্ম হল;
দাদার যত দলিল এবং
দাদির যত মধুর স্মৃতি,
নকশী কাথা, তোরঙভরা পুঁথি,
কোরান শরীফ;
পিতার যত পত্রাবলী, আলমারীতে
বাঁধানো বই; রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন,
সুপ্রিয় শেক্সপীয়র,
মায়ের শাড়ি, হাড়িকুড়ি, সাজানো সংসার,
খাটের বাজু, তোশক, বালিশ,
মশারী আর উষ্ণ আমার গ্রন্থাবলী,
কনিষ্ঠদের পাণ্ডুলিপি, নিষিদ্ধ বই,
পাঠ্যকেতাব, খাতা, কলম, টেবিল চেয়ার,
চালের বাতায় গোজা টেলিগ্রামঃ
'আব্বা, খবর খুবই খারাপ
শহর ছেড়ে আপনারা সব
গ্রামে গেলেই ভাল;'
ঘরের মধ্যে ঢুকলো মিলিটারী
ছড়িয়ে দিল গুড়ো এবং
জ্বালিয়ে দিল স্মৃতির ঘরে আগুন।
রক্তে এবং ভস্মে চাপা রইল শুধু
কী দুঃসহ ঘৃণা ক্রোধের বারুদ।[৩৬]

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পরাজিত পাকিস্তান বিমান বাহিনীর উদ্দেশ্যে আমি লিখেছিলাম 'ডগফাইট'[৩৭] কবিতাটি। মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর আমি লিখেছিলাম 'শহীদ স্মরণে' কবিতাঃ

কবিতায় আর কি লিখব
যখন বুকের রক্তে লিখেছি
একটি নাম
বাংলাদেশ।[৩৮]

১৯৭২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাংলা একাডেমীর সভায় পড়েছিলাম 'স্বীকৃতি' শীর্ষক কবিতাঃ

স্বদেশ আমায় স্বীকৃতি দিলে মমতায় স্নেহে
আকুল আবেগে গভীর করুণ
সজল সতর্কতায়

হানাদার খুঁজে ফিরল নগর গ্রাম
বধ করে গেল স্বজন, সুহৃদ, আসাদ, লক্ষ নাম;
স্বদেশ আমায় রাখলে লুকিয়ে
তোমার পরম উষ্ণ আস্তরিকে;

কী বর্ণনায় জানাবো কৃতজ্ঞতা?

কারো কাছে আর পুরস্কারের কোন লোভ নেই
তিরস্কারেও কোন ক্ষোভ নেই

স্বদেশ তোমার ভালবাসাময় অপরূপ স্বীকৃতি
নবজীবনের উত্তরণের সূর্যপ্রতিম শিখা
আমাকে বেঁধেছো অপরিশোধ্য ঋণে।[৩৯]

মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে অস্ত্র সমর্পণ করে মুক্তিযোদ্ধারা যখন গ্রামে ফিরে যায় তখন নগরবাসী নেতৃত্বের নানা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করতে থাকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী গণনাতীত চর অনুচর। এক অর্থে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুদের পাল্টা অভিযান। অনেক ছোট লোভের কাছে পরাজিত, অতি উত্তম ও বিক্রমশালী মুক্তিযোদ্ধাদের বিভক্ত করে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়ে শুরু হয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত চক্রান্ত। এই চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন বাস্তবতার উপলব্ধি। মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তির চেয়ে দেশ বড় ছিল, তাই শত্রু চিনতে ভুল হয়নি। ব্যক্তি ও দলীয় মতামতের ঊর্ধে উঠে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, কবিরাও তেমনি অস্ত্র ও কলম হাতে দেশের পক্ষে ঐকতানে মিলেছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর ব্যক্তি-কবি আত্মপ্রতিষ্ঠায় অধীর হলেন- বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ অবস্থানের কোন কোন কবি। এই অশোভন আচরণ আমাকে পীড়িত করে; একটি কবিতায় ১৯৭২ সালে আমি লিখেছিলামঃ

কেশে ও পুচ্ছে প্রাণান্ত বাচালতা
পত্রবিহারী পরস্পরের কথা
স্বীয় স্বার্থের সরলার্থের
সংকেতে নীরবতা।
কেন্দ্রন রণ
জনসাধারণ
করবেই, তাই কবিবর করে
নির্ভয় করে
চাকুরী;

সহ্য কি হয় ধকলে
করুক যুদ্ধ এ দেশ শুদ্ধ সকলে
কবিবর করে চাকুরী;
কেননা স্বাধীন যেই হবে দেশ
জনসাধারণ পুনঃ হবে শেষ,
অতীতের পাতে লিখবেন তিনি
নিয়মিত রোজ নামচা
সাথে সাথে তার জুটে যাবে কিছু
চামচা।[৪০]

কবিদের মধ্যে এই যে বিভক্তির শুরু এ ছিল প্রকৃতপক্ষে দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা বিরোধী কূটকৌশলেরই অংশমাত্র। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ তাঁর 'আরও একবার ভালবেসে' [৪১] কবিতায় এই পরিবেশের কথা বলেছেনঃ

ঘৃণিত যারা একাত্তরে তারাই ছলে বলে, কূটকৌশলে
বাজিমাত করার ফিকিরে আছে প্রায় সবখানে
নানা পিশাচের সঙ্গে তারা আজ মিলিয়েছে গা
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নারকীয় অতি বিকট একটি বাগান
একাত্তরেও হেস্তনেস্ত হয়নি পুরোপুরি, সবটা। কাজী কাজ
সেরে ফেলবার গরজ দেখছিনে তেমন কোথাও আজ
আগাগোড়া বুঝে নেবেন, বোঝাবেন তেমন কোনো
যোগ্যজন বড় একটা
চোখে পড়ছে না কারো এখন
যদিও নকল বীর, কেতায় কেউকেটা
আছেন অনেকেই আশেপাশে ব্যস্তবাগীশ
আস্ফালন প্রিয়
যতখানি বাক্যপর ঠিক ততখানিই রাবিশ....
.....
একজন একজন করে মাথা তুলছে একাত্তরে যারা ছিলো
হিংস্র পশুর দলে, দয়ামায়াহীন। অতএব সবখানে ঘৃণিত ধিক্।

কবি অবশ্য জানেনঃ

শুনিনিতো কোনদিন, কোন দেশে কোনো কালে
মানুষের মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতা গিয়েছে বৃথাই.....[৪২]

তাই তাঁর আস্থাঃ 'আরো একবার ভালবেসে' এই পোড়া বাংলাদেশেম্ব 'স্বাধীনতা ও পতাকার গর্ব' [৪৩] সুরভিত হবে।

এই অর্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কবিতা মুক্তিযুদ্ধের কালের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতির প্রবল দুন্দুভিতেই সমাপ্ত নয়, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ-বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠার বর্তমান সংগ্রামেও তা প্রসারিত-হয়ত অনিঃশেষ।

তথ্য নির্দেশ

১ হাসান হাফিজুর রহমান, অমর একুশে, *বিমুখ প্রান্তর*, ঢাকাঃ পারাবত প্রকাশনী, ১৩৭০, পৃ ৩৩-৩৪

২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কৃষ্ণচূড়ার মেঘ, *শঙ্কিত আলোক, কাব্য সংগ্রহ*, ১৯৭৬, পৃ ৬৪-৬৫

৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সহজে নয়, তবুও প্রত্যাশা, *কাব্য সংগ্রহ*, পৃ ১৭০

৪ সিকানদার আবু জাফর, *বাংলা ছাড়ো, (দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ই মার্চ, ১৯৭১) ঢাকাঃ সমকাল প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ ৬১-৬২

৫ সিকানদার আবু জাফর, আমাদের সংগ্রাম চলবেই, *কবিতা* ১৩৭২, ঢাকাঃ সমকাল প্রকাশনী, পৃ ১৭

৬ জসীম উদদীন, মুক্তিযোদ্ধা, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, সম্পাদনাঃ আবুল হাসনাত, ঢাকাঃ সন্ধানী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬, পৃ ১৮

৭ বেগম সুফিয়া কামাল, একত্রিশে চৈত্র ১৩৭৭, *ঐ*, পৃ ২০

৮ সৈয়দ আলী আহসান, আমার পূর্ব বাংলা, *একক সন্ধ্যায় বসন্ত, কাব্য সমগ্র*, ঢাকাঃ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ ৯৬-১০২

৯ সৈয়দ আলী আহসান, *আমার প্রতিদিনের শব্দ, কাব্য সমগ্র*, পৃ ২৮০-৮১

১০ সৈয়দ আলী আহসান, প্রতিজ্ঞা, *আমার প্রতিদিনের শব্দ, কাব্য সমগ্র*, পৃ ২৮৫

১১ সৈয়দ আলী আহসান, অবশেষে ফিরে এলাম, *আমার প্রতিদিনের শব্দ, কাব্য সমগ্র*, পৃ ২৮৫

১২ সৈয়দ আলী আহসান, স্বাধীনতা, *সমুদ্রেই যাব*, ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স, পৃঃ ৫২

১৩ আহসান হাবীব, মার্চ, *মেঘ বলে চৈত্রে যাব*, ঢাকাঃ সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৭৬

১৪ আলাউদ্দিন আল আজাদ, স্বাধীনতা ওগো স্বাধীনতা, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃঃ ৪৫

১৫ শামসুর রাহমান, তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, *বন্দী শিবিরে থেকে*

১৬ আহসান হাবীব, আমার সন্তান, *মেঘ বলে চৈত্রে যাব*

১৭ আবুল হোসেন, পুত্রদের প্রতি, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ ২১

১৮ শামসুর রাহমান, গেরিলা, *বন্দী শিবির থেকে*

১৯ হাসান হাফিজুর রহমান, তোমার আপন পতাকায়, *যখন উদ্যত সঙ্গীন*, চট্টগ্রামঃ বইঘর ১৩৭৯, পৃঃ ২০

২০ আবদুল গাফফার চৌধুরী, আমার দুখিনী বাংলা, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ ৪৩

২১ ফজল শাহাবুদ্দীন, এপ্রিলের একটি দিন ১৯৭১, আততায়ী সূর্যাস্ত, ঢাকাঃ সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৭৫, পৃ ৫৩

২২ ফজল শাহাবুদ্দীন, বাংলাদেশ একাত্তরে, *ঐ*, পৃ ১৩
২৩ ফজল শাহাবুদ্দীন, মুক্তিযোদ্ধাকে, *ঐ*, পৃ ১৯
২৪ আল মাহমুদ, ক্যামাফ্লাজ, *সোনালী কাবিন*, ঢাকাঃ প্রগতি, ১৯৭৩, পৃ ৬০
২৫ আবু বকর সিদ্দিক, চলে যাচ্ছো জ্বলে পুড়ে যাই, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ ৬৩
২৬ আবু বকর সিদ্দিক, শপথের স্বর, *ঐ*, পৃ ৬৫
২৭ শহীদ কাদরী, ব্লাক আউট পূর্ণিমায়, *ঐ*, পৃ ৬৬
২৮ আসাদ চৌধুরী, বারবারা বিডলারকে (১৯৭১) *যে পারে পারুক*, ঢাকাঃ বিউটি বুক হাউস, ১৯৮৩, পৃ ৭৬-৭৭
২৯ রফিক আজাদ, সৌন্দর্য-সৈনিকের শপথ প্যারেড, *সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে, নির্বাচিত কবিতা*, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৫, পৃ ৩৯
৩০ মুস্তফা আনোয়ার, বৈশাখের রুদ্র জামা, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ ৯০
৩১ নির্মলেন্দু গুণ, আগ্নেয়াস্ত্র, *ঐ*, পৃ ৯৯
৩২ হুমায়ুন আজাদ, মুক্তিবাহিনীর জন্যে, *যতই গভীরে যাই মধু যতই ওপরে যাই নীল*, ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশনী ১৯৮৭, পৃ ৩৮ *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী ১৯৯৩, পৃ ১০৫
৩৩ মুহম্মদ নূরুল হুদা, বাঙালীর জন্ম তারিখ, *শোণিতে সমুদ্রপাত*, ঢাকাঃ ১৯৭২
৩৪ মাহবুব সাদিক, যুদ্ধভাসান, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, পৃ ১২৪-১২৬
৩৫ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জার্নালঃ তেইশে মার্চ ১৯৭১, *প্রতনু প্রত্যাশা, কাব্য সংগ্রহ*, পৃ ১৬৪
৩৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ঘৃণাক্রোধের বারুদ, *ঐ*, পৃ ১৬৮
৩৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডগফাইট *ঐ*, পৃ ১৬৭
৩৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শহীদ স্মরণে, *ঐ*, পৃ ১৭১
৩৯ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, স্বীকৃতি, *ঐ*, পৃ ১৭৪
৪০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, দিব্য-প্রবোধ, *ঐ*, পৃ ১৭৬
৪১ সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আরও একবার ভালবেসে, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, পৃ ৫১-৫২
৪২ *ঐ*, পৃ ৫২
৪৩ *ঐ*

আবুল হাসানের কবিসত্তা ও কাব্যবিচার

খন্দকার ফরহাদ হোসেন (অনীক মাহমুদ)

এক.

আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) বাংলাদেশের কাব্যাঙ্গনে বহুলাংশে আলোচিত এবং তাঁর সৃষ্টিরাজি শিল্পী-সাহিত্যিক-সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষক। প্রকৃত কবিস্বভাবের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর রচনার লালিত্য ও শিল্প নৈপুণ্যে কবিতাপ্রেমীরা আজও বিমুগ্ধ। ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ। ইংরেজী সাহিত্যের জন কীটস (১৭৯৫-১৮২১) ও বাংলা সাহিত্যের অপর অকাল প্রয়াত সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭), হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২) প্রমুখের মতই অল্প বয়সে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা স্রষ্টার একটি বড় হাতিয়ার। অল্প বয়সে সাধারণত একটা মানুষের মধ্যে এই অভিজ্ঞতার সমস্যাটাই প্রবল থাকে। বিশেষত শিল্প সাধকের মাঝে এ অভাববোধ সক্রিয় থাকলে সত্যের কাছাকাছি পৌছানো যায় না। হাসান তাঁর স্বল্পায়ু জীবন পরিসরে অভিজ্ঞতার আধার না হলেও বয়সের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছিলেন। কীটসের অকাল মৃত্যু তাঁর সীমিত সৃষ্টিকে যেমন কালাতিক্রান্ত করে তুলেছিল, তেমনই হাসানও তাঁর সৃষ্টির সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে উঠেছেন। বলাবাহুল্য, হাসানের এ কবিসত্তায় তারুণ্যের উম্মাদনা ও প্রাবীণ্যের অভিজ্ঞতা উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। ব্যক্তিগত জীবনে হাসানের বোহেমীয় স্বভাব এবং নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর অভিজ্ঞতার দরোজা খুলে গিয়েছিল। অভিজ্ঞতার সরণী ধরে তাঁর কবিতার উপজীব্য হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে মানুষ ও প্রকৃতি। একজন প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেনঃ 'তাঁর কবিতার প্রধান দুই উপজীব্য, নিদ্ধিধায় বলতে পারি মানুষ ও প্রকৃতি। মানুষকে যেমন তাঁর মানবিক গুণে উদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছেন তিনি, তেমনি প্রকৃতিকে চেয়েছেন তার বিশুদ্ধরূপে প্রত্যক্ষ করতে। কিংবা মানুষ ও প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান ব্যবধান তাঁকে পীড়িত করেছিলো গভীর যন্ত্রণায়'।[১] আবুল হাসান নাটক ও ছোটগল্প রচনা করলেও কবিতায় ছিল তাঁর অকৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় তিনটি কাব্যঃ 'রাজা যায় রাজা আসে' (১৯৭২), 'যে তুমি হরণ করো' (১৯৭৪) এবং 'পৃথক পালঙ্ক' (১৯৭৫)। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা' (১৯৮৬), 'প্রেমের কবিতা' (১৯৯১), কাব্য নাটক 'ওরা কয়েক জন' (১৯৮৮) এবং গল্পগ্রন্থ 'আবুল হাসান গল্পসংগ্রহ' (১৯৯০)। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা আবুল হাসানের কবিকৃতির নানা অনুষঙ্গ পরীক্ষা করে দেখব।

দুই.

আবুল হাসানের কবিমানস সম্পর্কে সামান্য দৃকপাত করার আবশ্যকতা রয়েছে এই কারণে যে, ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় নানাভাবে আমূলিত হয়েছে। আত্মতা এবং আমিত্বই তাঁর সাহিত্যকর্মের মুখ্য উপজীব্য,তাঁর প্রায় সকল সৃষ্টিই আত্মজৈবনিক। আত্মপ্রীতি,

দুঃখবোধ আর স্বপ্নপীড়িত বেদনাবিলাস নিয়ে আবুল হাসান ডুবে থাকতে চেয়েছেন তাঁর অন্তস্তলে, কিন্তু সংবেদনশীল শিল্পীসত্তা তাঁকে অন্তর্লোকের অতল থেকে বারবার তুলে এনেছে বহির্লোকের প্রাঙ্গনে।[২] একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের সাত-সন্তানের প্রথম ছিলেন আবুল হাসান। নানা অভাব বোধের ভেতর দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অনার্স পড়তে এসেছিলেন এবং '৬৭ তে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফিস জমা না দেয়ার কারণ থেকেই অভিমানহত হাসানের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ইতি ঘটে। জন্মেছিলেন মাতুলালয়ে-ফরিদপুরের টুঙ্গীপাড়ার বর্ণিগ্রামে। এ গ্রামেই তাঁর বাল্য ও শৈশবের কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছিল। বাবার আবাস তৎকালীন বরিশাল জেলার ঝনঝনিয়া গ্রাম আর মাতুলের বর্ণি গ্রাম তাঁর কবিসত্তায় বাংলার শ্যামলিম প্রকৃতির অনাবিলতার বীজ রোপণ করেছিল। শৈশবে ফুফু ফাতেমা বেগমের কোরান পড়া কিংবা বর্ণি গ্রামের স্মৃতিময়তা তাঁর কবিতা ধারণ করে আছেঃ

> ফাতিমা ফুফুর প্রভাতকালীন কোরানের
> মর্মায়িত গানের স্মরণে তাই কেন যেনো আমি
> চলে যাই আজো সেই বর্ণির বাওড়ের বৈকালিক ভ্রমণের পথে।[৩]
> ("পাখি হয়ে যায় এই প্রাণ," 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ১৩)

ঢাকায় এসে আবুল হোসেন যেমন হয়ে উঠেছিলেন 'আবুল হাসান', তেমনই প্রবেশ করেছিলেন তরুণ কবি বন্ধুদের সঙ্গে 'উদ্বাস্তু উন্মুলম্ব যৌবনে। এ সময় তাঁর কাব্যচর্চার প্রস্রবণ যেমন উর্মিলতাপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনই সেটা হয়ে যায় সতত প্রসারণশীল। তাঁর জীবনীকারের ভাষ্যঃ

> বর্ণিগ্রাম কিংবা বরিশাল শহরে বসবাস কালে আবুল হাসানের সাহিত্যচর্চার যে প্রবাহ ছিল অন্তরীণ স্বল্পপ্রজ এবং উন্মেষ অধীর-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর ঢাকার অনুকূল পরিবেশ, সাহিত্যিক বন্ধুদের সাহচর্য এবং আপন সৃজনশীলতার অন্তর্বেগে তা হয়ে ওঠে প্রাণময়, গতিচঞ্চল, বহুপ্রজ ও শীর্ষমুখ অভিসারী।[৪]

পড়ালেখার সমাপ্তি ঘোষণা করে আবুল হাসান অর্থের প্রয়োজনে চাকুরী করেছেন পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু কোথাও একটানা বেশীদিন চাকুরী করেননি। উড়নচন্ডী বোহেমীয় স্বভাব, প্রাতিস্বিক জীবনদৃষ্টি এবং পৌনঃপুনিক অসুস্থতা তাঁকে স্থায়ীভাবে কোথাও চাকুরীতে নিবিষ্ট হতে দেয়নি।[৫] শৈশবে রিউম্যাটিক জ্বরে ভুগেছেন। সুচিকিৎসা হয়নি। যৌবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। মেডিকেলে ভর্তি হয়ে ছাড়া পাবার পর অনিয়মিত খাওয়া দাওয়া, রাত্রি জাগরণ, অমানুষিক পরিশ্রম তাঁকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। সব শেষে '৭৪ এর ১৯শে নভেম্বর সরকারী খরচে বার্লিন যান এবং খানিকটা সুস্থ হয়ে দেশে ফেরেন '৭৫ এর ফেব্রুয়ারীতে। দেশে ফিরে চাকুরীর জন্য নানা জায়গায় ধর্ণা দিয়েও ব্যর্থ হন। একদিকে অসুস্থতা, অন্যদিকে বেকার জীবন-মাথার ওপর ভাই-বোনদের পড়ালেখার খরচ যোগানোর দায়িত্ব সবকিছু মিলিয়ে আবুল হাসান তখন এক অস্থির জীবন যাপন করেছেন।[৬] এর ফলে ক্রমেই তিনি অসুস্থ হতে থাকেন এবং পুনরায় পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি হন। এবং একই অসুখে একই বছরের ২৬শে নভেম্বর লোকান্তরিত হন।

টুঙ্গী পাড়ার বর্ণি গ্রামের স্মৃতিময়তার সাক্ষী আবুল হাসান এবং টুঙ্গী পাড়ারই অপর সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যু একই বছরে। বর্ণি আর তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম টুঙ্গীপাড়া

শৈশবেই তাঁর মনে প্রজ্জ্বলিত করেছিল জাতীয়তাবাদের বীজ। জাতির জনকের হত্যাকাণ্ড তাঁকে ব্যথিত করেছিল। এই সময়ের বিপ্লবকে তিনি 'সাম্রাজ্য বাদের লীলালাস্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।[৭] আবুল হাসানের কবিতায় দেশ-জাতি ও জাতীয়তার ভাবধারা নানা ভাবে আমূলিত হলেও তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না। তবে ভেতরে ভেতরে রাজনীতির ধারা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং 'গণকণ্ঠ' ও 'জনপদ' পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয়তে তাঁর রাজনেতিক সচেতনার প্রচ্ছাপ লক্ষ্য করা যাবে। মোট কথা তাঁর কবিস্বভাবের চারিত্র আন্দোলিত হয়েছে দারিদ্র্য-অসুখ-সমাজ-সভ্যতা, দেশ-জাতি-জাতীয়তা, অন্তর্গত প্রেম-বিষাদ-শান্তি-যন্ত্রণা, মৃত্যু চিন্তা কিংবা, হতাশা-ক্লান্তি-দুঃখবোধের মধ্য দিয়ে।

তিন.

আবুল হাসানের কাব্যে যেমন বিষয়বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনই তাঁর কাব্যিক নামকরণের মধ্যে একটা পারম্পর্য ও সৌকর্য রক্ষিত হয়েছে। কাব্যের নামকরণে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। 'রাজা যায় রাজা আসে' গ্রন্থের ভূমিকায় একটি মাত্র চরণে তাঁর যন্ত্রণা প্রকটিত 'আমার মা আমার মাতৃভাষার মতই অসহায়'। আবুল হাসানের দুর্বল নিরুপায় স্বদেশে বরাবর চলেছে শাসন-ত্রাসনের যজ্ঞ। বদলে গেছে রাজ্যপাটের চরিত্র,বদলাতে হয়েছে আবহমান কালের অনেক ঐতিহ্যের ধারাকে। যেখানে সংস্কৃতির টুঁটি চেপে ধরেছে রাজার অত্যাচারী হাত, সেখানে আবুল হাসান ঈশ্বরের মত নির্লিপ্ত দ্রষ্টা হয়ে লক্ষ্য করেছেন মাতৃভূমির অসহায়ত্ব। সেখানে তাঁর দুঃখ বোধ সমীভূত করে মা এবং মাতৃভূমিকে। পরবর্তী গ্রন্থ 'যে তুমি হরণ করো'তেও আবুল হাসান অপহরণের দুর্বিরোধ যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন নামকরণে। এখানে পূর্বজ্ঞাত স্বদেশভূমির জবর দখলদার চক্রান্তকারীর প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ, কখন সহজাত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বিমূর্ত বেদনা, কখনবা প্রার্থিত বস্তু থেকে পরিত্যক্ত হওয়ার তীব্র যন্ত্রণা কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ কাব্যের কোথাও কোথাও দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ সেজে এ হরণকারীই আবুল হাসানের জীবনের রূপবল নিঃশেষের অনুজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ গ্রন্থ 'পৃথক পালঙ্ক'তে আবুল হাসান তাঁর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছেন। বলা যায় 'রাজা যায় রাজা আসে' গ্রন্থে আবুল হাসান সন্দিহান রাজা। 'যে তুমি হরণ করো'তে কিছুটা নিশ্চিতি পেয়েছেন। 'পৃথক পালঙ্ক'তে হয়েছেন একদম অধীশ্বর'। অর্থাৎ পালঙ্কের মালিক তিনি। কবিতায় বিশ্লেষণ করলে তিনটি কাব্যের নামকরণে ধারাবাহিকতার সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরাহা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম গ্রন্থের প্রথমে বলেছেন নিজের সংশয়ের কথাঃ 'এটা কি পাথর না কি নদী? উপগ্রহ? কোনো রাজা?'

("আবুল হাসান", "রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৯)

দ্বিতীয় গ্রন্থে কিছুটা নিশ্চিত হয়ে বয়েছেনঃ 'বলি কী সংবাদ হে মর্মাহত রাজা'?[৮]

("কালো কৃষকের গান", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ৯)

তৃতীয় গ্রন্থ 'পৃথক পালঙ্ক'তে এসে নিজেই অধীশ্বর হলেন। সেখানে তিনি আত্মনির্ভর-একান্ত সত্যময়তায় জ্যোতির্ময় অস্তিত্বে ঘোষণা করলেনঃ

ধান বুনলে ধান হয় না, বীজ থেকে পুনরায় পল্লবিত হয় না পারুল
তবুও রয়েছি আজো আমি আছি,
শেষ অঙ্কে প্রবাহিত শোনো তবে আমার বিনাশ নেই।[৯]

("নচিকেতা", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ১০)

বিষয়বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে আমরা দুটো পরিসরের কথা ভাবতে পারি- ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ পরিসর। যে সমস্ত বিষয় কবির ব্যক্তিহৃদয় ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার নৈপূণ্যকেই বেশী করে ব্যঞ্জিত করেছে, যেমন, প্রেম, আদর্শবোধ, দারিদ্র্য, হতাশা-ক্লান্তি-দুঃখবোধ, অসুখ, মৃত্যুচেতনা, জীবন ও আশাবাদ প্রভৃতি ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রসঙ্গ। অপরদিকে সমাজ-সভ্যতা, দেশ-জাতি-জাতীয়তা, মানব কল্যাণ প্রভৃতি তাঁর বস্তুনিষ্ঠ উপলব্ধিতে কবিতায় ক্রিয়াশীল। আমরা কবিতার বিষয়বৈচিত্র্যের উত্তরণে উভয় পরিসরেই আবুল হাসানের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরীক্ষা করে দেখব।

নারী ও প্রেম আবুল হাসানের কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। তাঁর কবিতায় প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই বাস্তবতার পথ ধরেই প্রেমের আধার দেহের নানান বর্ণনাও বাঙময় হয়ে উঠেছে। ফলে প্রেমকে দেহের উর্ধ্বে স্থাপন করে প্রেমের অতীন্দ্রিয় সত্তার সৃজন প্রয়াসে হাসান তৎপর হননি। তাঁর ভাষ্যঃ

নিভৃতে চলুক রতি, প্রেম ও উত্থান হোক
যুগল ধর্মের শর্ত, সময়ের শুভ অর্থ, সৃষ্টির সম্মান।

("সহবাস", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৪১)

প্রেমকে বাস্তবগন্ধী ও স্পর্শময় করার জন্য তিরিশের দশকে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) প্রমুখ কবি তাঁদের কবিতায় কাব্যনায়িকার নাম ব্যবহার করেছেন। তিরিশ পরবর্তী সময়েও এই রীতি অনেকের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। কোন কোন কবির কাব্যনায়িকা পাঠক নন্দিতও হয়। তিরিশের কবি জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কিংবা আজকের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীরা' এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবুল হাসানের কবিতাতেও এরূপ কাব্যনায়িকার নাম ব্যবহৃত হয়েছে। "স্বাতীর সঙ্গে এক সকাল" কবিতার 'স্বাতী', "শীতে ভালোবাসা পদ্ধতি" কবিতার 'কনক' প্রভৃতি তাঁর কাব্যনায়িকা। প্রেমকে দেহজ পরিবৃত্তের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য আবুল হাসানকে বিরহী কিংবা অচরিতার্থ প্রেমের কবি বলে মনে হয় না। বরং দেহ আর প্রেমের সমন্বয়ী আবহ সফল শিল্পের দ্যোতক বলে কবির আস্থা অর্জন করে। যে স্বাতীকে কবি বারান্দায় কমলা খেতে দেখেছেন তার শাড়ি, মুখ,কানের রিং, চুল, কিংবা তার সঙ্গে ক্রীড়ারত রোদ- এ সব কিছু থেকে যে আকর্ষণ ও আকুতি তা শিল্প সৃষ্টির সহায়ক। আবুল হাসান বলেছেনঃ

শিল্প তো নিরাশ্রয় করে না, কাউকে দুঃখ দেয় না
কোনো হীন সিদ্ধান্তের মতো
যৌবনের মাংসে তারা রাখেনা কখনোই কোন
অভাবের কালো ব্যাধি, দুরারোগ্য ক্ষত।

শিল্প তো স্বাতীর বুকে মানবিক হৃৎপিণ্ড, তাই
আমি তার হৃৎপিণ্ডে বয়ে যাই চিরকাল, রক্তে আমি
শান্তি আর শিল্পের মানুষ।[১০]

("স্বাতীর সঙ্গে এক সকাল", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ১২)

তিরিশের দশকের বাংলা কাব্যে দেহাত্মবাদ ঘনীভূত হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ রমণীর প্রেমকে দেহের আকরে প্রকাশ করে প্রেমের আবহকে করেছিলেন দেহগন্ধী। পূর্ব বাংলার কবিতায় ষাটের দশকে রক্ত মাংসজুড়ে প্রেম-প্রত্যয়ের যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, কোন কোন সমালোচক সেগুলোকে আধূনিক কবিতার আময় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ষাটের দশকের এই স্যাড জেনারেশনের কাব্যে দেহগন্ধী প্রেমের উল্লম্বনে কখন কখন অশ্লীলতা প্রকটিত হয়েছে। আবুল হাসান মধ্যষাটে ঢাকায় এসে কবিতাচর্চায় মনোনিবেশ করেন। কাব্যে রমণীর দেহবর্ণনা নানা ভাবে এলেও সেগুলো কদাপি উৎকট হয়ে ওঠেনি। অধিকতর কাব্যিক সুষমা ও নান্দনিক বিবেচনার জন্য তাঁর দেহাত্মবাদী প্রেম ব্যাখ্যান অশ্লীলতার উপরে উঠেছে। নিম্নে নারীদেহের বর্ণনায় তাঁর সৌকর্য ও শিল্পনৈপুণ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়ঃ

ক. তোমার অনামিকায় কামড় দিয়ে আমি হঠাৎ আবার
'যাহ্-কী-দুষ্টুস্ব ওষ্ঠে তোমার ওষ্ঠ ছোঁবো সকাল বেলায়
সূর্যোদয়ের কাছে কেবল শান্তি চাইবো, বুঝলে কনক।
তোমার মাথা ধরাও আমি এক চুমোতে সারিয়ে দেবো।

("শীতে ভালোবাসা পদ্ধতি", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ১৩)

খ. সেই সুখ নারীর ভিতরে ছিলো
যখন আমরা খুব গলাগলি শুয়ে
অনু অপলাদেন স্তন শরীর মুখ উরু থেকে
.....
অর্থাৎ নারীকে আমরা যখন খুঁজেছি
হরিণের মতো হুররে দাঁত দিয়ে ছিঁড়েছি তাদের নখ, অন্ধকারে
সেই সুখ নারীর ভিতরে ছিলো।

("সেই সুখ", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ১৪)

গ. গণিকা আমার অশ্লীল অভিমান
তবুও যখন দুর্ভিক্ষের অমা
গ্রাস করে দেশ, নাভিতে সবুজ ধান
বুনে দিয়ে তুমি দাসেরে করিও ক্ষমা।

("দাসেরে করিও ক্ষমা", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ১৮)

ঘ. তোমার বুকের উপাধানে তাই মাথা রেখে শুই প্রিয়
ক্ষণজীবনের নিদ্রা বইতো নয়।
চোখে ঘুম আসে, চোখের পাতায় লেগে থাকে স্বর্গীয়
বেদনাবোধের যাতনা হিরন্ময়।

("চিরকালীন", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ১৯)

ঙ. এসো সতী মেয়ে আবার আমরা শুয়ে পড়ি, সেতু বাঁধি
দুই শরীরের মিলনে ঐকতান।
সংরাগে দেই সুন্দর করতালি
আমাদের দুটি হৃদয়ে আজকে প্রথম ধরেছে কলি
এসো উদ্যানে পুষ্পে পবনে অঙ্গার হয়ে জ্বলি।

("জোৎস্নায় তুমি কথা বলছোনা কেন", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ২৩)

প্রেম ও সৌন্দর্যের আধার হিসেবে নারীর অমর্যাদা ও অবমাননায় আবুল হাসান মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। নজরুল ইসলাম সমস্ত নারীকূলকে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখতে গিয়ে যেমন বারাঙ্গনাদেরও 'মা' ডাকে অভিষিক্ত করেছেন, আবুল হাসানও গণিকাকে প্রিয়তমা হিসেবে সম্বোধন করেছেন। আবার প্রেমের অমর্যাদা আর অবহেলার শিকার হয়ে অসহায় নারী কখন কখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আশঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত কবি বলেছেনঃ

শহরে আজকাল শুনি দুর্ঘটনার কথা আত্মহত্যা গেছে বেড়ে,
সবাই আমরা আজ সভ্যতার সচ্ছল শিকার।

("তোমার মৃত্যুর জন্য", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ১৬)

শুধু সভ্যতার হঠকারিতাই নারীর আত্মহননের ক্ষেত্রে দায়ী নয়। কখন কখন কাপুরুষ প্রেমিককূল কিংবা বন্য স্বভাবী নরও এর দায়ভাগে ক্রিয়াশীল থাকে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর পূর্ণতা বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রেমে কার্পণ্যের মাত্রা বাড়লে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই অধঃপতিত পুরুষ তথা প্রেমিক সম্পর্কে আবুল হাসানের মূল্যায়নঃ

এখন বাজারে এই শোক
কেনার পুরুষ নেই- ওরা কেনে অন্য সব স্মৃতিঃ
এখন প্রেমিক নেই, যারা আছে তারা সব পশুর আকৃতি।

("সম্পর্ক", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ৫১)

তবু প্রেমে বলীয়ান কবি নারীর প্রেম ও মর্যাদা প্রদানে গভীর আত্মপ্রত্যয়ী। নারীর প্রত্যাশিত স্বাধীনতা, 'আয়নার দাঁড়ে দেহ মেলে দিয়ে বসে থাকা সবটা দুপুরস্ব এর অবসরের আর্তি কিংবা পুরুষের কাছ থেকে প্রার্থিত রমণীর স্বীকৃতি কবির মতে তেমন কোন বড় চাওয়া নয়। আবুল

হাসানের কাব্য দর্শনে যে নারী মাতৃত্বের মহিমা চিহ্নিতঃ 'জন্মমৃত্যুর শুরুতে এই মা, এই মহিলাই আসলে জীবন, যাকে বলি

সুন্দর বেদনা সবঃ সমস্ত নিষ্পন্ন একটি নারীতে'।
("এক প্রেমিকের কথা", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ৪২)

সেই নারীর প্রণয় পূর্ণতা কিংবা নারীত্বের বিকাশে পুরুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই পুরুষ জাতির কাছে কবির আবেদনঃ

যদি সে সন্তানবতী, তবে তার সংসারের শুভ্র অধিকারে
তোমরা সহায় হও, তোমরা কেউ বাধা দিও না হে
শিশুর মুতের ঘ্রাণে কাঁথা ভিজুক বিজনে
একটি সংসার যদি সুখী হয়, আমি তো সুখী।
("কল্যাণ মাধুরী", 'প্রেমের কবিতা', পৃ. ৩৫)

ব্যক্তি জীবনের নানা সংঘাত-সংক্ষুব্ধতা সত্ত্বেও ভালোবাসার অপার মহিমা থেকে হাসান কখন বিচ্যুত হননি। আত্মকথনপ্রিয় কবি হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি সমস্ত মনোপ্রাণ দিয়ে কামনা করেছেন। কোন বিপন্ন বিষাদ বা বিরহ তাঁকে তেমন হতাশাগ্রস্থ করেনি।[১১] একদিকে তিনি যেমন বলেছেন, 'আমি আমার ভালবাসার স্বীকৃতি চাই/ স্বীকৃতি দে স্বীকৃতি দে স্বীকৃতি দে', তেমনই বিশ্বাস করতেনঃ

যতদূর থাকো ফের দেখা হবে। কেননা মানুষ
যদিও বিরহকামী, কিন্তু তার মিলনই মৌলিক।
("এপিটাফ", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৬০)

একারণে আবুল হাসান প্রেমের ক্ষেত্রে অনবদ্য অস্তিবাদী, নারীর প্রতিষ্ঠা ও শোভনতায় যত্নশীল এবং পাশাপাশি বিচ্ছেদ-বিরহের চেয়ে মিলনের সংবেদে আস্থাশীল।

আবুল হাসানের কবিতা পাঠ করলে বোঝা যায় কবি একটি আদর্শায়িত জীবনধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও তিনি নানান কারণে বোহেমীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, তথাপি 'মানবিক মূল্যবোধের মৃত্যু, অকল্যাণ ও বিকারের মুখ ব্যদানরূপ তাঁকে ব্যথিত, অনুতপ্ত করে তুলেছে। তিনি প্রতিক্রিয়া উন্মুখ হয়ে উঠেছেন, তাঁর কণ্ঠ দীর্ণ হয়েছে অসহায় চিৎকারে'।[১২] ফলে পারিপার্শ্বিক জীবন চেতনায় শঠতা-হানাহানি-অবক্ষয়-অধঃপাত দেখে, সেই ফেলে আসা শান্তসমাহিত গ্রামীণ জীবনের জন্য বেদনা অনুভব করেছেন। বারবার ফিরে গেছেন নষ্টালজিয়ার মম্ময় চৈতন্যে। 'রাজা যায় রাজা আসে' কাব্যের "বনভূমির ছায়া" কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন পুঁজিতন্ত্রের আময় কিভাবে মানুষকে স্বাতন্ত্র্যবাদী করে,বন্ধুত্ব-মানবিকতা ও সৌহার্দ্য এবং প্রকৃতির অনাবিল আস্বাদন থেকে পৃথক করে দেয়। বনভূমির ছায়ায় নিসর্গের মাধূরী স্পর্শে কয়েকজন বন্ধু মিলে কবি যে পিকনিকের পরিকল্পনা মাফিক যাত্রা করেছিলেন, শহরতলীতে একটি সাঁকোর কাছে বাস থামিয়ে খালের স্বচ্ছ জলে দেখলেন বন্ধুদের মধ্যকার পারস্পরিক ঘৃণা আর বিদ্বেষের ছায়া। কবিতার চিত্রকল্পে নাগরিক

জীবনের পরস্পর অবিশ্বাস, শাঠ্য ও ঘৃণার প্রসঙ্গটি আবুল হাসান চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেনঃ

শহরের কাছের শহর
নতুন নির্মিত একটি সাঁকোর সামনে দেখলুম তীর তীর করছে জল
আমাদের সবার মুখ সেখানে প্রতিফলিত হলো,
হঠাৎ জলের নীচে পরস্পর আমরা দখলুম
আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ।
আমরা হঠাৎ কী রকম অসহায় আর একা হয়ে গেলাম।
আমাদের আর পিকনিকে যাওয়া হলো না,
লোকালয়ের কয়েকটি মানুষ আমরা
কেউই আর আমাদের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা একাকীত্ব অসহায়বোধ
আর মৃত্যুবোধ নিয়ে বনভূমির কাছে যেতে সাহস পেলাম না।

("বনভূমির ছায়া", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ১১)

একারণে নিরাবেগ শাহরিক জীবনের মর্মমূল থেকে তাঁর কবিচিত্ত সেই গ্রামীণ নিষ্কলুষ পরিবেশ আর সরল সোজা মানুষের নিবিদে হাজির হয়েছে। এত হানাহানি অবক্ষয়ের মাঝেও সেখানে কিছু আদর্শায়িত মুখের সন্ধান পান তিনি। যেখানে ফাতেমা ফুফুর কোরান পড়া কিংবা তাঁর পিতার সারল্য-সৎজীবন যাপনের অভীপসা আদর্শের মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে। পিতা পুলিশ বিভাগে চাকুরী করেও কোনদিন কখন অসৎ অর্জনকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর না ছিল পুলিশী মেজাজ, না ছিল ব্যক্তিগত আখের গোছানোর প্রবণতা। একটি কবিতায় আবুল হাসান বলেছেনঃ

মা বোলতেন বাবাকে তুমি এই সমস্ত লোক দ্যাখোনা?
ঘুষ খাচ্ছে, জমি কিনছে, শনৈঃ শনৈঃ উপরে উঠছে
কত রকম ফন্দি আঁটছে কত রকম সুখে থাকছে
তুমি এ সব দ্যাখোনা?
বাবা তখোন রাতের বোনা চাদর গায়ে বেরিযে কোথায়
কবি গানের আসরে যেতেন মাঝরাত্তিরে
লোকের ভীড়ে সামান্য লোক, শিশিরগুলো চোখে মাখাতেন।

("চামেলী হাতে নিম্নমানের মানুষ", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ১৬)

শুধু আদর্শায়িত মানুষ নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশের সৌম্য আবেশ আগের মত নেই। আবুল হাসান রোমান্টিক অন্তর্দৃষ্টিতে হারিয়ে যাওয়া জীবন আর মানুষের মুখচ্ছবি নিয়ে বেদনা অনুভব করেছেন। বিশেষতঃ লোকজ ঐতিহ্য ও বিশ্বাস থেকে নির্বাসনের বেদনা তাঁর অনেক কবিতারই উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এর ফলে গ্রাম আর গ্রামীণতা, নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের আবেশ, মানুষের জীবনচিত্রণ, বাউলের গান,পাতার মর্মর, নদীর কুলুধ্বনি কিংবা ঋতু প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং এগুলো হারিয়ে যাওয়ার জন্য অনুশোচনা তাঁর নানা কবিতায় বাঙময় হয়ে উঠেছে। প্রথম কাব্যের "প্রত্যাবর্তনের সময়" কবিতায় ভাঁড়ার ঘরের নুন মরিচ মশলাপাতা গেরুয়াছাই, নক্সীকাঁথা,

গ্রাম্যশালিস, শালিধানের গন্ধ প্রভৃতির জন্য তাঁর আর্তি পুঞ্জীভূত হয়েছে। তিনি আফশোস করে বলেছেনঃ 'আমরা তো ভুলতে ভুলতে সব পাখিদেরও আজ/ডাক নাম ভুলতে বসেছি'।

("একমাত্র কুসংস্কার", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৪৮)

জীবন ও প্রকৃতির স্বাভাবিকতা বিলুপ্তির সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক ও উপাদানের ক্ষেত্র পরিসরে টানাপোড়েন শুরু হয়। হাসান একটি কবিতায় বলেছেনঃ

এই চোখেও স্পষ্ট ছিলো
উদার করতলের রেখা স্পষ্ট ছিলো, স্পষ্ট ছিলো
তোমার পরিধানের পশম, হেমন্ত আর শীতের সকাল।
এখন চুম্বনেও আকাল, শিশির ঝরে অগ্নিহানা
এখন ভালোবাসার কথাও বোলতে মানা, বোলতে মানা।[১৩]

("অগ্নি আমার অগ্নি আমার", 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা', পৃ. ১৮)

দারিদ্র্য ছিল আবুল হাসানের আজন্ম সঙ্গী। ঢাকায় অবস্থানকালে নানাভাবে অভাব আর দারিদ্র্যের ছোবলে তিনি জর্জরিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ঢাকায় যেমন তিনি চালচুলোহীন মানুষের জীবন যাপন করেছেন, অনুরূপভাবে দারিদ্র্যদশাকে অনেকটা আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। স্বাচ্ছন্দ্যবঞ্চিত পিতার ব্যর্থতা ও চেহারা দেখে তিনি বলেনঃ 'জীর্ণশীর্ণ ব্যর্থ চিবুক বিষণ্ন লাল রক্তে ভাবুক রোদন আসে'। বাবার সংসারে দারিদ্র্য ছোট ভাই বোনদের লেখা পড়ার সমস্যা এমন কি অর্থাভাবে নিজের একাডেমিক শিক্ষাও নিষ্পন্ন করতে পারেননি হাসান। ফলে জীবনঘষা এই পর্যায়সমূহ তাঁর কবিতায় অতি সহজ সিদ্ধিতে বঙময় হয়ে উঠেছে। যুগোপযোগী জীবন বিধানে অনভ্যস্ততার জন্য তাঁর পিতা টেনে এনেছিলেন সংসারে নানাবিধ দুর্দশা। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে মনে হয়েছে কেবল একটি ব্যর্থ মানুষ। আবুল হাসান দারিদ্র্যের নগ্ন মূর্তির ছোবলে আক্রুষ্ট মাতৃমূর্তির ছবি অঙ্কনেও পিছ পা হননি। তিনি "কবির মা" এর দারিদ্র্যদগ্ধতার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন কয়েকটি ছবিঃ

নতুন বসতিফের ফুল, পুষ্প, পথের প্রান্তর
কবির মায়ের তবু নেই কোনো ঘর
সে উদ্বাস্তু তার সন্তানেরই মতো।

("কবির মা", 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা', পৃ. ৬১)

নজরুল ইসলাম একদা দারিদ্র্যকে জায়া ও পুত্ররূপে কল্পনা করেছিলেন। আবুল হাসান নিজের পরিপার্শ্ব, তাঁর আপৃথিবী ক্ষুধা ছাড়া আর কিছু দেখেননিঃ

শুধু আমি জানি আমি একটি মানুষ
আর পৃথিবীতে এখনও আমার মাতৃভাষা ক্ষুধা।

("মাতৃভাষা", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ২৪)

বড় বেদনা ও আন্তরিক ক্ষুব্ধতা সঞ্চারক এই উচ্চারণ। শুদু এ উচ্চরণের মধ্যে, নিজের অহম চেতনার মধ্যে হাসান ক্ষুধার বিশ্ব সংহারক প্রাতিস্কিতা ভুলে যাননি। তাঁর মনে হয়েছেঃ

আমি ভুলে গিয়েছিলাম পৃথিবীতে তিন চতুর্থাংশ লোক এখনো ক্ষুধার্ত।
("ভ্রমণ যাত্রা", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ১৩)

ক্ষুধা মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রধানতম। পুঁজিবাদ একদিকে যেমন ধনের বিস্তৃতি ঘটায়, অন্যদিকে নিঃস্ব করতে থাকে মানুষকে। ফলে পৃথিবীতে ধনী আর নির্ধনের ভাগাভাগি ক্ষুধাকে করেছে অসম্ভাবী অলঙঘনীয় যাতক। তৃতীয় বিশ্বে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কেউই এর ছোবল থেকে উদ্ধার পায় না। আবুল হাসানের কবিচিত্ত ওই ক্ষুধার উম্মার্গে বিহবল হয়ে উঠেছেঃ

যেখানে যাই শুধু ক্ষুধার চিৎকার শুধু ক্ষুধার চিৎকার শুধু
তোমাদের অনশন। তোমাদের অনশন। তোমাদের অনশন।
("এক ধরনের প্রতিবাদ', 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা', পৃ. ৫১)

আবুল হাসান ক্ষুধা বিস্তারকারী মনুষ্য নিয়তিকেও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন 'তোমাদের ডানে এক ফালতু এক সোহম সম্রাট,' 'তোমাদের বামে বাস্তহারা বেকার নিকেতন'। এই ডান-বামের মাঝখানে নিজেকে নিঃসঙ্গ কবি হিসেবে চিহ্নিত করে এদের কাউকেই তাঁর পছন্দ নয় বলে জানিয়েছেনঃ 'আমি এদের কাউকেই পছন্দ করি না সত্যি বলছি করিনা করিনা'। (তদেব)।

আবুল হাসানের কবিতার একটি অন্যতম উপজীব্য হচ্ছে অসুখ। দীর্ঘ দিন রোগ-ভোগের অভিজ্ঞতায় অসুখ তাঁর কবিতার ক্ষেত্র পরিসরেও হানা দিয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে অসুখের চিত্র নেই। তবে তৃতীয় কাব্যের কয়েকটি কবিতায় যেমন, "অসুখ", "রোগ শয্যায় বিদেশ থেকে", "সাদা পোষাকের সেবিকা", "অন্য রকম বার্লিন", 'অগ্রন্থিত কবিতা' গ্রন্থের "বেঁচে থাকার জন্যে" প্রভৃতিতে অসুখের নানা চিত্র প্রকটিত। ব্যক্তির অন্তর্দাহ ও সন্তাপ রুগ্ন হলে কেমন হতে পারে আবুল হাসানের অসুখের কবিতাবলীতে সেগুলো চিহ্নিত। অসুখে নিপতিত হলে সকল সুখ-শান্তি, জাগতিকতা থেকে একটা নিস্পৃহ ভাব ঘনীভূত হয়। কোন দিকেই যেন আর আগ্রহ থাকে না। আবুল হাসানেরও সে রকম মনে হয়েছেঃ

সুখের কাছে অসুখে আমি শৃঙ্খলিত
আমার কোন দিকেই আর ভারিককী নেই
.....
সিগ্রেট খাইনা বুকের ভিতর কুয়াশা হবে,
চোখের ভিতর কুয়াশা জমে তাই কাঁদি না
শয্যা থেকে সকালে উঠি ভোরের হাওয়ায় মান
বাঁচানো শোভনতায়।
("বেঁচে থাকার জন্যে", 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা', পৃ. ১২)

শুধু মান বাঁচানোয় নয়-অসুস্থতায় জীর্ণ হলে অনেক কিছুতেই বাধা নিষেধ আরোপিত হয়। ইংরেজ কবি মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪) তাঁর অন্ধত্ব নিয়ে কবিতাই লিখেননি, অন্ধত্বের জন্য যে অনেক কিছু করতে পারেননি সে কথাও "On his blindness" কবিতায় ব্যক্ত করেছিলেন। আবুল হাসানও অসুস্থ মানুষের বেঁচে থাকাকে রুটিন মাফিক দৈনন্দিনতা হিসেবে ভেবেছেনঃ

এখন কেবল রুটিন মাফিক দৈনন্দিনতা,
এখন কেবল মানুষ মাফিক চলাফেরা
এখন কেবল কুকুর কিম্বা কাকের মতো
সরল সহজ বেঁচে থাকা, আর কিছু নয়, বেঁচে আছি।
(তদেব)

আবার অসুখ নিয়ে আত্মব্যঙ্গ থেকে শুরু করে রোমান্টিক ভাবলালিত্যের বিস্তার পর্যন্ত ঘটিয়েছেন। নজরুল যেমন তাঁর দারিদ্র্য নিয়ে রোমান্টিক আবছায়ায় লিখেছিলেন বিখ্যাত "দারিদ্র্য" কবিতা। সেখানে দারিদ্র্যকে সম্মানদাতা এবং অসঙ্কোচ প্রকাশের সাহসদাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবুল হাসানের মধ্যেও তদ্রূপ একটা ভাবের সংক্রম লক্ষ্য করা যায়। অসুখকে তিনি তাঁর অহংকার, পরোপকারী, শ্যামল এবং জীবনকে নিঃশেষে পান করার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেনঃ

অসুখ আমার অমৃতের এক গুচ্ছ অহংকার
আত্মার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ক্ষুধিত জানোয়ারের
রোমশ বলশালী শরীরের দুটি সূর্যসমান রক্ত চক্ষু।
যা দেখে ঈশ্বর পর্যন্ত ভয়ে ভয়াল হিমে শয্যাদায়গ্রস্ত হন।
("অসুখ", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৪৬)

তাঁর ধারণা অসুখ না হলে জীবনের পানপাত্র থেকে সকল রস নিংড়ে পান করা যায় না। বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতাকে সুদৃঢ় এবং পিনদ্ধ করতে চাইলে অসুখেরও প্রয়োজন আছে- প্রয়োজন আছে সেবাব্রতী হাতের শূশ্রষার। অসুখের বরাতে কেউ যদি নরক থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেটাও অভিজ্ঞতার জন্য ঈপ্সিত হতে পারেঃ

আমি অসুখে যেতে যেতে এক চককর তোমাদের নরকে
সব সুখী মানুষদের দেখে এলাম এটাই বা কম কি?
(তদেব, পৃ. ৪৭)

আপাতঃ দৃষ্টিতে অসুখের কবিতায় আবুল হাসানের বক্তব্য আত্মব্যঙ্গ কিংবা আত্মপ্রসাদের সুর ধ্বনিত হলেও এগুলোর মধ্যে এক অভিমানহত কবিচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাগুলো একটু মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই এই সত্য উপলব্ধ হয়।

অস্থিরতা, হতাশা, ক্লান্তি ও দুঃখবোধ আধুনিক যুগ ও যন্ত্রণার একটি বড় লক্ষণ। ধনতান্ত্রিক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমুলিত যান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি থেকে ব্যক্তির জীবনে এই সমস্ত কালো

উপাদান ঘনীভূত হয়। শুরু থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতায় অস্থিরতা, হতাশা, ক্লান্তি ও দুঃখবোধের চিত্র প্রকটিত হয়ে আসছে। এ যুগে বরিশালের অপর কবি জীবনানন্দ দাশ জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে ধারণ করেছিলেন অপরিমেয় ক্লান্তি। আবুল হাসানের কবিতায় নানা ভাবদীপনায় আত্মতা ও আত্মবেদনার সঙ্গে অস্থিরতা, হতাশা বা ক্লান্তি-দুঃখ-কাতরতা উদ্ভিন্ন। এ গুলোর শেকড় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্মূলেই যুথবদ্ধ ছিল না- পারিপার্শ্বিক জীবন চেতনার মধ্য থেকেও এগুলো তাঁর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। আমরা জানি, অনেক কিছু থেকে অপ্রাপ্তি ও অসম্পূর্ণতা হাসানের কবিচিত্তকে বিলোড়িত করেছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতাও তাঁর জন্য কম হুমকির ছিল না। নাগরিক জীবনের হানাহানি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, বিচ্ছিন্নতা, অসুন্দরের অপঘাত, শাঠ্য ও অসাধুতা সর্বোপরি শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে শ্রেয় ও প্রেয়বাদী কবি অস্থির হয়ে উঠেছিলেনঃ

আমি কার কাছে যাবো? কোনদিকে যাবো?
অধঃপতনের ধুম সবদিকে, সভ্যতার সেয়ানাগুন্ডার মতো
মতবাদ, রাজনীতি, শিল্পকলা শ্বাস ফেলছে এদিকে ওদিকে,
শহরের সবদিকে সাজানো রয়েছে শুধু শাণিত দুর্দিন,
বন্যা, অবরোধ আহত বাতাস।

("দূর যাত্রা", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৫৭)

মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা সংবেদনশীল মানুষের এক ভয়ানক সমস্যা। ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজকে 'চাচা আপন পরাণ বাঁচা' ধ্বনি তুলে একলা চলো নীতিতে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের মধ্যে অপসৃত হচ্ছে যেমন সহমর্মিতার বীজ, তেমনই দ্রবীভূত হচ্ছে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর শঠতার অপশক্তি। হাসান দুঃখ করে বলেছেনঃ 'এখন আমরা কেউই কাউকে চিনতে চাই না; স্বজন বন্ধু অন্নদাত্রী। আমরা কেউই চিনিনা কাউকে ব্যক্তিগত পোশাক পরলে'।

("ব্যক্তিগত পোষাক পরলে", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৩৫)

এই পারিপার্শ্বিক আবিলতা, শ্বাসরুদ্ধকর আবহ হাসানের হতাশার উদ্দীপক। যাদের দ্বারা এই হতাশা অপনোদিত হতে পারে তারাও হতাশা আক্রান্তঃ

তাইতো পারি না নেভাতে আগুন চারিদিকে থেকে যারা
নেভাতে আসবে, তাদের চোখেও হতাশার খরধারা-

("অগ্নি দহন বুনোদহনঃ, 'রাজা যায় রাজা আসেম্ব, পৃ. ৬৩)

হতাশা ক্লান্তর দ্যোতক। ক্লান্তি থেকে স্থবিরতা আসে। হাসানের কবিতায় ক্লান্তি এসেছে কিন্তু সেই ক্লান্তি তাঁকে স্থবির করতে পারেনি। 'রাজা যায় রাজা আসে' কাব্যের "ক্লান্ত কিশোর তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখায়" কবিতায় কবি যে কিশোরের কথা বলেছেন সেটা আবুল হাসানেরই প্রতিকৃতি। অভিমানহত কিশোর যখন সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিকেলে বাসায় ফেরে, তখন তাকে ক্লান্ত দেখায়। তবু এই ক্লান্ত কিশোরের হাত উত্তোলিত, ভেতরে তার দুঃখ বোধ। একটা কিছু না পাওয়ার বেদনা। আবুল হাসানের অধিকাংশ কবিতার পরতে দুঃখবোধের আতিশায়ন ঘটেছে।

কবির প্রত্যাশা আর আর্তির অনুগ অপ্রাপ্তিই দুঃখবোধের প্রধান কারণ। প্রথম কাব্যে হাসানের দুঃখবোধ বিচিত্র উপজীব্যের আধারে পুঞ্জীভূত ও ফেনায়িত হয়েছে। দ্বিতীয় কাব্যে এসে এর উৎসারণ ঘটেছে। এখানে "কালো কৃষকের গান", "উদিত দুঃখের দেশ", "অনুতাপ" প্রভৃতিতে দুঃখবোধের অকৃত্রিম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আবুল হাসান বলেছেনঃ

আমিও গ্রহণ করে দেখেছি দুঃখকে
দেখেছি দুঃখের জ্বালা যতদুর না যেতে পারে
তারও চেয়ে বহুদূর যায় যারা সুখী।
দেখেছি দুঃখের চেয়ে সুখ আরো বেশী দুঃখময়।
("এখন পারি না", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ১৮)

রবীন্দ্র কাব্যে দুঃখবরণের অভীপ্সা আছে। আবুল হাসানের মধ্যে দুঃখ অতিক্রমের প্রত্যাশা আছে। দুঃখদীর্ণ যে কবি সুখের মধ্যেও দুঃখের প্রণিপাত লক্ষ্য করেছেন তিনিই দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেনঃ 'দুঃখের এক ইঞ্চি জমিও আমি অনাবাদী রাখবো না আর আমার ভেতর'।
("কালো কৃষকের গান", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ৯)

বলা বাহুল্য দুঃখের মধ্যে আন্দোলিত হয়েও আবুল হাসান দুঃখবাদী হননি। তাঁর সকল কাব্যেই দুঃখকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে।

অন্তর্গত চিত্তবৃত্তির পরিসর থেকে নিসর্গ প্রীতি ও নস্টালজিয়া হাসানের কাব্যে উল্লম্ব। 'রাজা যায় রাজা আসেম্ব গ্রন্থের "গাছগুলো", "বনভূমির ছায়া", 'অগ্রন্থিত কবিতা'র "বনভূমিকে বলো", "হায় বৃক্ষ হায় অন্ধকার", "নারীর চোখ, মুখ হাত ইত্যাদির রূপান্তর" ইত্যাদি কবিতায় নিসর্গের প্রতি কবির অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা আছে। এই নৈসর্গিক রূপ মাধুরীর প্রতি অনাবিল আকর্ষণ থেকেই হাসানের কাব্যে চিত্রধর্মিতা প্রাধ্যান্য পেয়েছে। একজন সমালোচক বলেছেনঃ 'প্রকৃতি ও জীবন তাঁর কাছে ছিলো এক অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাঁড়ার। জীবনানন্দের মতোই তিনি সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে এই ভাঁড়ারের সম্পদ ভোগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় চিত্রধর্মিতা তাই এতো প্রবল'।[১৪] নস্টালজিয়ার পুনঃপুন সংক্রম ঘটেছে তাঁর নানা কবিতায়। শৈশব-কৈশোরের জীবন প্রবাহ, শ্রেয় ও প্রেয়বাদী মূল্যবোধ, গ্রাম আর গ্রামীণতায় পূর্ণ এক ধরণের সহজ সরল জীবনাচরণের দিকে তিনি বারবার অনুধাবিত হয়েছেন। এই নস্টালজিক স্মৃতিমগ্নতার পেছনে ফিরে তাকানো আবুল হাসানের সকল কাব্যেই লক্ষ্য করা যাবে। 'রাজা যায় রাজা আসে' গ্রন্থের "স্মৃতি কথা", "প্রত্যাবর্তনের সময়", 'পৃথক পালঙ্ক' এর "মেধা দূরে ছিল বুঝতে পারিনি", অগ্রন্থিত কবিতার "আবার আমার ফিরে তাকানো" প্রভৃতিতে নস্টালজিক আচ্ছন্নতা বিদ্যমান। পরিবর্তিত জীবন প্রবাহ ও সমাজ-সন্নিধ্যানে সমঝোতা হয়নি বলেই তাঁর এই গৃহকাতরতা পরিব্যক্ত হয়েছে। একটি কবিতায় বলেছেনঃ

আমি আবার ফিরে এলাম, আমাকে দাও
ভাঁড়ার ঘরের নুন মরিচ আর মশলাপাতা গেরুয়া ছাই
আমায় তুমি গ্রহণ করো
.....

পারদ মাখা শয্যা আমায় শান্তি দেয়নি, নারী, আমায় নিদ্রা দেয়নি
গ্রন্থ এখন কেবলি শুধু ছাপার হরফ, সভ্যতা সে অধঃপতন,
অমল কোনো পাইনি মানুষ যাকে ধারণ করলে আমি আলো পেতাম।

("প্রত্যাবর্তনের সময়", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৪৩)

আবুল হাসানের কাব্যের একটি বিশেষ অনুষঙ্গ মৃত্যু চেতনা। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ পর্যন্ত বাংলা কবিতায় মৃত্যু চেতনার নানা পর্যায় উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কখন শ্যাম, কখন বা রাহু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মৃত্যুকে 'নিপুণ শিল্প' বলেছেন। অকাল প্রয়াত আবুল হাসানের মধ্যে অল্প বয়সেই মৃত্যু চেতনা ক্রিয়া করেছিল। একজন সমালোচক বলেছেনঃ 'ব্যক্তিক জীবনের দুর্ভোগের সাথে তাঁকে আচ্ছন্ন করে গেছে মৃত্যুচিন্তা। তিনি তার ছবি এঁকেছেন- 'পৃথক পালঙ্ক'এ'।[১৫] শুধু 'পৃথক পালঙ্ক'তে নয়, পূর্বতর দুটো কাব্যেই মৃত্যুর অনুষঙ্গ হাসান এড়াতে পারেননি। তাঁর চিন্তা মূলতঃ দেহজ। রোমান্টিক পরিবৃত্ত ছাড়িয়ে অলঙ্ঘনীয় মৃত্যু বার বার তাঁর চেতনায় হানা দিয়েছে। প্রথম গ্রন্থেই বাসনার বেলাভূমি গড়তে গিয়ে যেখানে ভাঙন ধরল, সেখানে তাঁর অকৃত্রিম উচ্চারণ ধ্বনিত হলঃ 'মৃত্যু আমাকে নেবে। জাতিসংঘ আমাকে নেবে না'।

("জন্ম মৃত্যু জীবন যাপন", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ২১)

দ্বিতীয় গ্রন্থে এটা আরও স্পষ্টতর হয়েছে। এখানে মৃত্যুভয়ের প্রসঙ্গ এসেছে "টানাপোড়েন" কবিতায়। "কবির ভাসমান মৃতদেহঃ কবিতায় সুনিশ্চিত মৃত্যুর চিত্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে" 'কবির মৃত্যু নিয়ে আজো দ্যাখো ঐ খানে লোফালুফি/ঐতো পদ্মায় ওরা কবির ভাসন্ত মরা দেহ নিয়ে/ খেলছে, খেলছে।'

("কবির ভাসমান মৃত দেহ", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ৪৮)

'পৃথক পালঙ্ক' এর একাধিক কবিতায় যেমন, "শেষ মনোহর","মৃত্যুর হাসপাতালে হীরক জয়ন্তী", "সাদা পোশাকের সেবিকা" প্রভৃতিতে এই চেতনা স্থিরতা পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেনঃ

রাহুর মতন মৃত্যু ফেলে ছায়া।
পারেনা করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।[১৬]

আবুল হাসানের কবিতাতে অমোঘ মৃত্যুকে অতিক্রম করার তেমনই শাণিত স্পৃহা রয়েছে। তাঁর প্রত্যয় দীপ্রতার মধ্যেই সীমায়িত থাকেনি, তিনি মৃত্যুকে রীতিমত শাসিয়ে দিয়েছেনঃ

অনাহারে মারীতে মৃত্যুতে আমি মরবো না! না! মরবো না!
আঙ্গুল উচ্চে তুলে ধরে উষ্ণ স্রোতের ভিতর
আমার অনুপস্থিতি ডুবিয়ে বলছিঃ

জাপানের চেরীফুলের দোহাইঃ
দুর্দৈবের দেশে যেনো আমার মৃত্যু নিবারণ হয়
সূর্যের রৌদ্রে চাবুক বানিয়ে আমি মৃত্যুকে সাবধান করে দেই!
("অসুখ", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৪৭)

শুধু এতেই কবি পরিতৃপ্ত হননি। সকল জরা-বরাভয়-ক্লান্তি-মৃত্যু-অবসাদ সব কিছুর উপরে উঠে তাঁর বিশ্বাস ঘনীভূত হয়েছে জীবনেরই বন্দনায়। মৃত্যু নয়-জীবনেরই মহিমা নিরন্তর ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত করে প্রবাহিত হচ্ছে। হাসানের ভাষ্যঃ

আমাকে গ্রহণ করতে হবে সব মানুষের উত্থান পতন,
জয় পরাজয় বোধ, পিছু ফেরা, সামনে তাকানো-
আমার অনলে আজ জাগো তবে হে জীবন জয়শ্রী জীবন!
("জল সত্তা", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৭২)

একারণে মৃত্যু চেতনার পাশাপাশি জীবন চেতনা এমনভাবে তাঁর কবিতায় এসেছে, যার জন্য জীবনের সৌকর্য, ঐশ্বর্য ও মহিমার কাছে মৃত্যু ম্লান হয়ে গেছে। 'রাজা যায় রাজা আসে' গ্রন্থের "ফেরার আগে", 'যে তুমি হরণ করো'র "স্থিতি হোক", 'পৃথক পালঙ্ক'এর "ভিতর বাহির", "অপরূপ বাগান", "আমি আছি শেষ মদ" ইত্যাদিতে হাসানের জীবনবাদ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্তরঙ্গ উপজীব্যগুলোতে হাসান তাঁর সমস্ত আবেগ নিংড়ে দিয়ে তাঁর দর্শন ও বোধনকে উপস্থাপিত করেছেন। এগুলোতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ দুর্ভোগের আর্তি গভীর মমত্ব নিয়ে প্রকটিত।

চার.

বস্তুনিষ্ঠ পরিসর থেকে যে সকল উপজীব্য আবুল হাসানের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমাজ ও সভ্যতা। একজন সমালোচকের ভাষ্যঃ

> সমাজ সচেতনতা ... অপূর্ব নতুন আঙ্গিকে, ভাষার বুনটে তিনি প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর বাচনভঙ্গী সব কিছুতেই তাঁর সমসাময়িক কবি গোত্রের মধ্যে ব্যতিক্রমী এবং অল্প সংখ্যক অন্যদের মধ্যে তিনি অতি অল্প সময়ে নিজের এই কণ্ঠস্বরের স্বকীয়তা পাঠক বর্গকে চিনিয়ে ছেড়ে ছিলেন।[১৭]

আবুল হাসানের সমাজ মনস্কতা মূলতঃ সমাজের অধঃপতন ও অবক্ষয়ের চিত্রে উদ্ভাসিত। যে সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির উদ্‌বেলন নেই, যেটা মানুষ আর মানবতার বিকাশের কোন সহগ নয়, সেটাকে হাসান সমাজ বলতে চাননি। হাসান বলেছেনঃ

সব রগরগে জীবন যাপন মানেই পতন বিলাসী শিল্প
সমাজ মাত্রই একটা মাথামোটা মানুষের
হুলস্থুল মিলিত প্রবাহ।

আর তোমরা যাকে চাকরী বা প্রফেশন বলো
উন্নতি ও অভ্যুত্থান, তারা
আমার বিশ্বাসে আজ এক বিন্দু অনলের লকলকে
অজস্র বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়।
আর কিছু নয়।

("অবহেলা করার সময়", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ২৯)

যে সভ্যতার আলোছায়ায় গড়ে উঠেছে হাসানের দেখা বস্তুতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, সেখানে নেই মানুষের মূল্য। হাসান একাধিক কবিতায় মানুষের বরাতে অমানবিক ঘৃণ্য জীবনাচরণের জন্য ক্ষোভ আর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সভ্যতার অন্ধকার ও অবক্ষয়ের জন্য মানুষ যে হীনকর্ম সম্পাদন করে, কবি সেটা ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। মানবিক কার্পণ্য, পারস্পরিক অবিশ্বাস, হানাহানি সব কিছুকেই সভ্যতার আময় রূপে চিহ্নিত করেছেন। সভ্যতার নেতিবাচক দিকগুলো হাসানের লেখনীতে কতটা সফল দৃষ্টান্ত দেখুনঃ

ক. পৃথিবীতে আজ বড় অবিশ্বাস!
কখনো কন্নার কাছে মুখ নিয়ে মানুষ দেখিনি!

("তুমি ভালো আছো", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ৩২)

খ. মানুষ জন্ম চায় না, মানুষের মৃত্যুই আজ ধ্রুব!

("কুরুক্ষেত্রে আলাপ", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ৪৬)

গ. দেয়ালের ফাঁকে তবু জায়গা আছে, আমাদের জায়গা নেই!
এতো ছোট, এত ছোট হয়ে গেছি আমরা সবাই!

("ডোয়ার্ফ", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৫৯)

ঘ. দেশে দেশে নিমখুন, গুমখুন কত,
ভুতে পাওয়া ভ্রুঘাতক, পাতক, বদমাশ
হাঁস ফেলে ঘরে তোলে লাশ।

("চাকা", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৬২)

ঙ. শহরে আজকাল শুনি দুর্ঘটনার কথা
আত্মহত্যা গেছে বেড়ে,
সবাই আমরা আজ সভ্যতার সচ্ছল শিকার।

("তোমার মৃত্যুর জন্য", 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা', পৃ. ৬)

চ. আমরা এখনো সেই তীব্রমুখ ধৈর্যহীন। অধঃপতনের পথজুড়ে সভ্যতার ক্বাথ-এ,
ঘাসে ও কষায় বসে আছি শ্রম বিমুখতা নিয়ে?

("ব্যাপারটা তুলনামূলক", 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা', পৃ. ৯)

সভ্যতা ও সমাজের ক্রূরতা ও অবক্ষয়ী অবয়ব থেকে যে রেহাই পাবার কথা হাসান ভাবেননি তা নয়। এই বিনাশ থেকে অব্যাহতি পেতেহলে সমাজের পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি যে 'বেশ্যার বেদনা বোধ', 'বেকারের হু-হু কান্না' ("এই সব মর্মজ্ঞান", 'পৃথক পালঙ্ক'), নুলো ভিখিরীর গান, ধনীর আধিপত্য ও দারিদ্র্যের অভিমান দেখেছেন, এগুলো অপনোদিত করতে হলে পরিবর্তন প্রয়োজন। আবুল হাসান 'রাজা যায় রাজা আসে' কাব্যের 'ব্লেড' কবিতায় চুম্বন উপযোগী মুখাবয়ব নির্মাণে মুখের কালো কচুরীপানা সদৃশ আগাছার কর্তনে ব্লেডকে আহবান জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত 'সামাজিক ওষ্ঠ আর অন্তরাল'কে স্নিগ্ধ করতে অনুরূপ ব্লেডের প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। আর সমাজবদলের তাগিদ দিয়েছেন কবিতায়ঃ

কিছুটা বদলাতে হবে বাঁশী
কিছুটা বদলাতে হবে সুর
সাতটি ছিদ্রের সূর্য, সময়ের গাঢ় অন্তঃপুর
কিছুটা বদলাতে হবে
মাটির কনুই, ভাঁজ
রক্তমাখা দুঃখের সমাজ কিছুটা বদলাতে হবে।
("বদলে যাও, কিছুটা বদলাও", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৪৭)

আবুল হাসানের কাব্যে দেশ-জাতি-জাতীয়তা ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের কিছুটা স্ফূর্তি ঘটেছে। কবি নিজেকে কোনদিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেননি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মহান আত্মত্যাগের কথা তাঁর কবিতায় পরিব্যক্ত করে গেছেন। নয় মাসের যুদ্ধে ভাই হারিয়েছে বোনকে, বোন হারিয়েছে ভাইকে। এদের আত্মত্যাগের পথ ধরে মুক্তি পেয়েছে পতাকা-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতা। পতাকা উড়িয়ে বিজয় বার্তার সঙ্গে স্বাধীনতার যে উৎসব পালিত হয়, তাতে কবির হারানো স্বজনদের সম্পর্কে গভীর মমত্বে বলা হয়েছেঃ

কেবল পতাকা দেখি
কেবল উৎসব দেখি
স্বাধীনতা দেখি।
তবে কি আমার ভাই আজ ঐ স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার বোন, তিমিরের বেদীতে উৎসব?
(উচ্চারণগুলি শোকের", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ২৭)

স্বাধীনতা অর্জিত হল। অনেকের প্রত্যাশা ছিল এদেশের নিরন্ন মানুষের হাহাকার বিদূরিত হবে। অনাহার, মারী, মন্বন্তর থেকে রক্ষা পাবে এদেশের চিরবঞ্চিত ও ভাগ্যাহত কৃষককূল। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করল। বাঙালীর দুধ-ভাতের সমস্যা অপনোদিত হল না। আবুল হাসানের চোখে এটা "উদিত দুঃখের দেশ" রূপেই প্রতিভাত হল। 'যে তুমি হরণ করো' কাব্যের এই কবিতায় ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর মতই হাসান দুধভাতের জন্য আকুতি জানিয়েছেন। বাঙালীর চিরকাম্য দুধভাত লতিতলোভন কান্তি কবিদের মতই যেন ফিরে আসে, এটাই ছিল তাঁর

প্রার্থনা। কবি এখানে চুয়াত্তরের তৎকালীন খাদ্য সংকটের প্রত্যক্ষতা স্পর্শ করেছেন বলে মনে হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক ফটকাবাজি করে কেবল নিজের আখের গোছানোর পাঁয়তারা সন্দর্শনে হাসান রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন- কটাক্ষ করেছেন। সবকিছুতেই রাজনৈতিক ছলচাতুরী করে যে ভাবে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা হয়, তাতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পুরণের কোন চেষ্টা থাকে না। এ জন্য হাসান রাজনৈতিক মারপাঁচের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেনঃ

তরুণেরা অধঃপাতে যাচ্ছে তাও রাজনীতি, পুনরায়
মারামারি যুদ্ধ আর অত্যাচার, হত্যার আগ্রাসী খুন, মানুষের
ছড়ানো বীর্যের ব্যথা, বিষণ্ন মিথুন
মহিলার রক্তের ভেতরে ভ্রূণ, সমস্যার ছদ্মবেশে আবার আগুন
উর্বর উর্বর হচ্ছে, রাজনীতি তাও রাজনীতি।

("অসভ্য দর্শন", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৫৪)

এভাবে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, আত্মদান কিংবা আশাভঙ্গের বেদনা তাঁর কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে। কখন কখন খেদোক্তির বহিঃপ্রকাশও ঘটিয়েছে। তথাপি হাসান বাঙালীর এই মহৎ অর্জনকে তাচ্ছিল্যের চোখে কিংবা সুন্দরের বৈপরীত্যে স্থাপন করেননি। বরং এত কিছু পরেও দেশের জন্য নানাভাবে তিনি গর্ব প্রকাশ করেছেন। এত কিছুর পরেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপনিষদের বাণী প্রোথিত করেছেন কাব্য পরতেঃ

এই দেশে জন্মেছি বলেই ফুল ফোটানোর প্রজ্ঞা আমি
পেয়েছিলাম, অনাচরণ, আজ যদি বা হত্যাপ্রবণ
খরায় আমি।
পুড়তে পুড়তে এই ভাবে যাই, এই ভাবে যাই
এই দেশে জন্মেছি বলেই ব্যর্থ বাউল, আমি তবুও বলেছিলাম
চরৈবেতি ... চরৈবেতি।

("আমার চোখে বলেছিলাম", 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা', পৃ. ১৩)

সবশেষে আবুল হাসানের উপজীব্যগত আরেকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে চাই- সেটা হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তি। একাধিক কবিতায় হাসান মানবকল্যাণ ও শান্তির জন্য আকুতি জানিয়েছেন। 'রাজা যায় রাজা আসে' গ্রন্থের "সবিতাব্রত", "শান্তিকল্যাণ", "ফেরার আগে", 'যে তুমি হরণ করো'-র "ভিতর বাহির", 'পৃথক পালঙ্ক' এর "শূন্যন্ত", "আত্মা চলো যাই", "বলো তারে শান্তি শান্তি" প্রভৃতিতে বিশ্বের অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের মূলে শান্তি ও মানব কল্যাণের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রয়েছে। জীবন জিজ্ঞাসার বিচিত্র আকুতি থেকে মানুষের হীনমন্যতা ও শঠতার নানাচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন কবিতায়। কিন্তু সর্বোপরি মানবতন্ত্রের মহিমাকে তিনি এড়িয়ে যাননি। সবার উপরেই মনুষ্যত্বের দীপ্তিকে স্থান দিয়েছেন। একটি কবিতায় তাঁর মানব প্রত্যয়ের বাণী প্রতিমূর্তঃ

আমার শরীর খোঁড়ো, দুঃখময়, আত্মার গাঁথুনী দ্যাখো আমি ঠিকই
খণ্ডিত ইঁটের মতো খুলে যাবো সহজেই, কিছুই থাকবো না।
মায়া ও মমতা ছাড়া মানুষের দুঃখবোধ, ব্যথাবোধ ছাড়া আমি
কিছুই থাকবো না।

("ভিতর বাহির", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ৪০)

বলা বাহুল্য, হাসান শেষ পর্যন্ত এই মায়া-মমতায় মানবিক জীবনদৃষ্টি নিয়ে মানুষের শান্তির স্বপক্ষে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। "শান্তিকল্যাণ" কবিতায় শান্তির শর্তে সময়ের রাস্তাঘাট, ব্যবহৃত দালান, দোকানপাট, মানুষের মুখ, ভালবাসা প্রভৃতিকে বদলে নেবার সংকল্প আছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেনঃ

যদি দেখি, না,
পৃথিবীর কোথাও এখন আর যুদ্ধ নেই, ঘৃণা নেই ক্ষয়ক্ষতি নেই;
তাহলেই হাসতে হাসতে যে যার আপন ঘরে
আমরা ফিরে যেতে পারি।
হাসতে হাসতে যে যার গন্তব্যে আমরা ফিরে যেতে পারি।

("দেবার আগে", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৬৭)

এ কারণে আবুল হাসান কবিতায় ব্যথা-বেদনা ও হাহাকারের নিটোল রূপায়ণ ঘটালেও শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁকে মানবতন্ত্রী, আশাবাদী কবি হিসেবে দেখতে পাই। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় পরিসর থেকে গৃহীত কাব্য বিষয়ে হাসানের প্রাণের অকৃত্রিম সংবেদনশীলতা প্রোথিত। তাঁর অর্ন্তমুখী ও বর্হিমূখী জীবনদৃষ্টি যুগপৎ সমান তালেই কাব্য দেহে সন্নিবিষ্ট হতে পেরেছে।

পাঁচ.

কাব্যের প্রকরণ তথা ভাব-ভাষা-ছন্দ-রসের ক্ষেত্রে আবুল হাসান অনেকটা সার্থকতা অর্জন করেছিলেন। বিচিত্র ভাব ও বিষয় নিয়ে যে তিনি কাব্যচর্চা করেছেন, উপর্যুক্ত আলোচনায় তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কাব্য ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর কবিত্বের একটা বলিষ্ঠ যোজনামূর্তি লক্ষ্য করা যাবে। একজন সমালোচকের ভাষ্যঃ 'প্রথম দু'টি কাব্য গ্রন্থে আবুল হাসানের ভাষা ও ভঙ্গী গীতল, তৃতীয় গ্রন্থ 'পৃথক পালঙ্ক' এ তিনি মিশ্রণ ঘটিয়েছেন নিরাসক্ত একভাবাবেগের সঙ্গে এক ধরনের অভিমান'।[১৮] আবুল হাসানের কাব্যভাষা আবেগময়-গীতোচ্ছল। বুদ্ধির নৈপূণ্য নিয়ে আধূনিক কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আবুল হাসানের কবিতায় বুদ্ধির চেয়ে হার্দিকতা, মননের চেয়ে আবেগতা এবং কাঠিন্যের চেয়ে পেলবতা প্রশ্রয় পেয়েছে। ফলে অনুভূতির আন্তরিকতা ও অনুভবে সংবেদনশীলতা প্রতিটি কবিতাতেই লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর বর্ণনা যেমন চিত্রধর্মী, তেমনই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আধূনিক কবিতার অন্যতম যে বৈশিষ্ট্য অনিকেত ও অনন্বয়ধর্মিতা, হাসানের বক্তব্য উপস্থাপনেও অনেক সময় এই লক্ষণ দেখা যায়। একজন সমালোচক বলেছেনঃ 'তাঁর বক্তব্য অবশ্য সর্বত্র পারম্পর্যপূর্ণ, সুসংহত এবং পিনদ্ধ নয়, প্রসঙ্গ

থেকে প্রসঙ্গান্তরে একই কবিতায় তাঁর ইতস্তত যাত্রাও অনুভব করা যায়। বক্তব্যের চেয়েও বক্তব্য প্রকাশের আবেগ-আর্তি এবং উপমা, চিত্রকল্প তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিল।'[১৯] যাই হোক গ্রাম ও নগর জীবনের অভিব্যক্তি অর্থাৎ উভয় সংস্কৃতির উপাদান তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে। এ কারণে নাগরিক জীবনের আটপৌরে শব্দ থেকে শুরু করে গ্রামীণ লোকজ আমেজ মিশ্রিত শব্দের ব্যবহার পর্যন্ত তাঁর কবিতায় রয়েছে। যেমন, প্রথম কাব্য 'রাজা যায় রাজা আসে'-র "বনভূমির ছায়া" কবিতায় পিকনিক, সিনেমা, থীম, ফ্লাস্ক,ডেটল, টার পুলিনের টেন্ট, টেপরেকোর্ডার, ড্রাইভার, ইত্যাদি শব্দাবলীর ব্যবহার রয়েছে। পরের কবিতা "পাখি হয়ে যায় এই প্রাণ" এ গ্রামীণ চিত্রকল্পে বা ওড়, সিনান, সরজু দিদি, হরিকীর্তন যাত্রা, সারস, দীঘি, গাঁয়ের হালট প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। অর্থাৎ ভাব ও পরিবেশের সমন্বয়ী চেতনায় শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য তাঁর ছিল।

ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবুল হাসান অনেক ক্ষেত্রেই সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রিয় ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। তবে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দেও কবিতা লিখেছেন। কখন কখন কথ্যভঙ্গীতেও কবিতা লিখেছেন। সেখানে কোন ছন্দের ফর্ম ব্যবহার করেননি। স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা গুলো ছন্দ ও পর্বের পারম্পর্যে নির্ভুল। যেমন,

আমি যেনো/আবহমান/থাকবো বসে/৪+৪+৪
ঠুকরে যাবো/সূর্যলতা/গাছের শিকড়/ ৪+৪+৪
অন্ধকারের/জল ৪+১
আমি যেনো/অনাদিকাল/থাকবো বসে/ ৪+৪+৪
বিশ্রুতিময়/জীবনে ক/ল্লোল ৪+৪+১

("মানুষ", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৭২)

মুক্তক ছন্দে পর্বের মাত্রা ঠিকরাখা যায়। আবুল হাসান দক্ষতার সঙ্গে এগুলো করেছেন। মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার করেছেন খুবই কম। 'যে তুমি হরণ করো'-র "পরাজিত পদাবলী" কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে এখানে প্রতিটি পর্বে ৫ মাত্রা নির্দিষ্ট হয়ে থাকলেও কোথাও কোথাও অসাবধানতার জন্য মাত্রা বিন্যাসে গড়মিল দেখা যায়ঃ

আমার বাহু বকুল ভেবে গ্রীবায় পরে ছিলে ৫+৫+৫+২
মনে কি পড়ে প্রশ্নহীন রাতের অভিসার? ৫+৫+৫+২
অন্ধকারে আড়ালে পেয়ে ওষ্ঠে তুলে নিলে ৫+৫+৫+২
হঠাৎ গাড় চুম্বনের তীব্র দহন গুলি? ৫+৫+৬+২
মনে কি পড়ে বলেছিলে এ পোড়াদেশে যদি ৫+৫+৪+২
বিরহ ছাড়া কিচ্ছুতে নেই ভালবাসার বোধি ৫+৬+৫+২

("পরাজিত পদাবলী", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ২০)

এই যে কোথাও কোথাও পর্বে ৪ মাত্রা, কখন বা ৬ মাত্রা হয়েছে এগুলো অসাবধানতার ফসল। অনুরূপভাবে অক্ষরবৃত্তে রচিত কোন কোন কবিতায় হোঁচট খেতে হয়। যেমন, তাঁর বিখ্যাত কবিতা "উদিত দুঃখের দেশ" অক্ষরবৃত্তে রচিত। অথচ এখানেও 'বোঝোনি আমাদের', 'আত্মাহুতি দানের যোগ্য কাল', 'সাইকেলে পথিক' 'দুধ আনতে গেছে দূর বনে' ইত্যাদি বাক্যাংশে ছন্দের গরমিল লক্ষ্য করা যায়।

ছন্দের মত অলংকার ব্যবহারের নৈপুণ্যও আবুল হাসানের কবিতায় দৃষ্ট হয়। অনপ্রাস, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি প্রভৃতির বুদ্ধি দীপ্ত ব্যবহার রয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। অনুপ্রাসে ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাসানের প্রবল অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। 'রাজা যায় রাজা আসেস্ব কাব্যে বাওড়ের বৈকালিক, দারুণ দুর্দশা, নরোম নোলক, মুখস্থ মানুষ, কুঠারের ক্রশে; 'যে তুমিহরণ করোম্বতে ধানের ধারণা, সুন্দরের সর্বনাশ, শোষকের সান্নিধ্য সকল শাখায়, বকুল বৃক্ষকে, নখের নৃশংসতা, মিথুন মূদ্রা, ব্যথার বারুদে, নারীর নাভীতে ইত্যাদি অসংখ্য শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে ধ্বনিমাধূর্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কখন কখন অনুপ্রাসের শব্দমালাও গ্রথিত হয়েছেঃ

ক. মানুষের মনীষার, মঞ্জুষার, মুগ্ধতার মহিমার
মৌনতাবাহক, ওতো সকলেরই সহ অবস্থান দিতে
সমূহ ইচ্ছুক।

("সবিতাব্রত", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ১৯)

খ. সমস্যায় শূন্য শূন্যতায় এ শহর যদি ফের
শত্রু কবলিত হয়, হলে হোক মহামারী বাড়ুক পাঁজরে আর
মাংসের ভিতরে তার অন্ধকার আগ্রাসী আভায়

("দূর যাত্রা", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৫৭)

গ. আকাশের সুবিস্তৃত শূন্যতায় সহিষ্ণু ভূবন যদি পাই

("ফেরার আগে", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৬৭)

ঘ. সেই আমার প্রত্যাখ্যাত প্রথম পুষ্পের জন্যে ফের অনুতাপ।

("অনুতাপ", "যে তুমি হরণ করো', পৃ. ১৬)

ঙ. একমাত্র একালের ক্ষুধার্ত নৈতিক মূর্তি
শক্তিতার সুন্দরের শুভ্র হাতিয়ার বটে।

("বিপ্লবী", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৩৬)

চ. পতঙ্গের প্রণত প্রার্থনা বামে ফেলে (তদেব)

উপমা অলংকারের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আবুল হাসানের কবিতায় রয়েছে। উপমায় নগর ও গ্রামীণ আটপৌরে জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে শুরু করে নিসর্গ ও অনুভূতির সূক্ষ্ম কারুকার্য তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুনঃ

ক. হে ধূলো, বিবর্ণ ঘাস, কাকে রাখো? কাকে ফেলে দাও
উচ্ছিষ্ট ভাতের মতো? কুকুরের মতো?

("শিকড়ে টান পড়তেই", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৬১)

খ. এ মুহূর্তে সিগ্রেটের ছাই থেকে
শিশিরের মত নম্র অপেক্ষার কষ্টগুলি ঝেড়ে ফেলছি
কালো এ্যাসট্রেতে।
("প্রতীক্ষার শোকগাথা", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৬৫)

গ. নেবু পাতার মতো নিদ্রাহীন আমার নির্জন বুকে
বইছে বাতাস।
("তুমি ভালো আছো," 'যে তুমি হরণ করো' , পৃ. ৩২)

ঘ. আমি তাঁকে ধারণ করেছিলাম মৃত্যু
যেমন ধারণ করে জন্মঃ জন্ম যেমন জীবন এবং মৃত্যু ঠিক
পাশাপাশি সে রকম আমার এই ধারণ ক্ষমতা।
("এক প্রেমিকের কথা", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৩৪)

ঙ. পাকা আতা ফলের মতো মরে গেছি
ঘোরঋতু শেষের জামদানীর দিনে।
("অসুখ", 'পৃথক পালঙ্ক', পৃ. ৪৬)

আবুল হাসানের কাব্যে রূপক অলংকারের ব্যাপকতা আছে। তাঁর ছিল উচ্চ মার্গের কবি কল্পনা। ফলে কাব্যিকতার প্রায় ক্ষেত্রে রূপকতা প্রাধান্য লাভ করেছে। কয়েকটি রূপকের উদাহরণঃ

ক. পিপাসার রক্ত সাগর মাখা সমস্যার
সাম্রাজ্যে এখানে বুঝি বাজে না সানাইয়ে সুর?
("দূরযাত্রা", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৫৭)

খ. যৌবনের অসহায় রোদে মুখ নত কোরে
বুকের ভ্রমর হাতে রাখছে লুকিয়ে তাও রাজনীতি।
("অসভ্য দর্শন", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৫৪)

গ. আমি পকেটে দুর্ভিক্ষ নিয়ে একা একা অভাবের রক্তের রাস্তায় ঘুরছি। (তদেব)

ঘ. বেদনার বিষবাষ্পে জর্জরিত এখন সবার চতুর্দিকে খাঁ খাঁ। (তদেব)

এগুলো ছাড়াও প্রথম কাব্যে, সময়ের সাহসী সন্তান, সভ্যতার সুন্দর প্রহরী, আলোর ইশকুল, নক্ষত্রের পরিবার, যৌবনের সাহস, অভাবের কালোব্যাধি, অন্ধকারের জল, নদীর বালিশ, দ্বিতীয় কাব্য 'যে তুমি হরণ করো'তে দুঃখের এক ইঞ্চি জমি, নীল শোষক, লোনা মাংসের প্রতিমা, যৌবনের সাতমহল, 'পৃথক পালঙ্ক'তে মৃত্তিকার মলিন কাগজ, স্বেচ্ছাচারের তরবারী, বীজের ধনুক, ঘাতকের বিষ, বুকের বকুল ঝরা কারখানা, হাওয়ার হলকুম, বিষের বালি প্রভৃতি অসংখ্য রূপকসিদ্ধ শব্দাবলীর ব্যবহার রয়েছে। আবুল হাসানের কবিতায় অন্যান্য অলংকারও বিভিন্ন

পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কাতপয় দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়ঃ

উৎপ্রেক্ষাঃ

ক. শিরীষের কোলে ঢালছে আগুন নীলিমা
হলুদ পাখিটা বুঝিবা সোনার পিণ্ড
লুকিয়ে রয়েছে আবছায়া শাখা শেলফএ
যেনো মেটে কুপি ধরে আছে সাঁঝরাত্রে
কোনো কালো মেয়ে কোনো পুকুরের পার্শ্বে।
("নিঃসন্দেহ গন্তব্য", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ২৯)

খ. দেখি আমি মর্মর খিলান ছাঁদ ঢের
মসলান তাঁতের খটাখট কানে আসে যেনো তুমি তাঁত
যেনো তুমি কুয়াশার চেয়ে মিহি মসলিনে ফের
ফিরে আসা না শিল্পকলা।
("আশ্রয়", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ৩০)

সমাসোক্তিঃ

ক. ভদ্র শান্ত কেবল কয়েকটি গাছ বেফাঁস নারীর মতো
চুল ঝাড়লো আঙ্গিনায় হঠাৎ বাতাসে।
("বৃষ্টি চিহ্নিত ভালোবাসা", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ২৫)

খ. প্রকৃতির সবচেয়ে নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারী
ঐ মেঘ,
ওরও তো রয়েছে বহু শিল্পকর্ম
এবং বাসনা।
("মেঘেরও রয়েছে কাজ", 'রাজা যায় রাজা আসে', পৃ. ৩৬)

গ. লাজুক পাড়া গাঁ তার নিসর্গের বারান্দায় তবু
বসে থাকে অপেক্ষায়।
("সে আর ফেরে না", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ৩১)

ভ্রান্তিমানঃ

আমার বাহু বকুল ভেবে গ্রীবায় পরেছিলে
মনে কি পড়ে প্রশ্নহীন রাতের অভিসার?
("পরাজিত পদাবলী", 'যে তুমি হরণ করো', পৃ. ২০)

সন্দেহঃ

আমি যে ছিলাম, কী ছিলাম, সঙ্গমিত্রা নাকি সে সুদূর
সভ্যতা সন্ধির রাণী, অন্য কোনো অশোকের বোন।
("সেই মাননীয় কণ্ঠ", 'যে তুমি হরণ করো', পৃঃ ২০)

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের কাব্যাঙ্গনে আবুল হাসান ছিলেন ঝড়ের পাখি। এক দশকের কোলাহল, জীবন আর সংগ্রামের ইতিরেখায় তিনি যেভাবে কাব্যিক পরিলেখ যোজনা করে গেছেন, তা নিরতিশয় প্রশংসার দাবীদার। তাঁর কাব্যোৎকর্ষ ও শিল্পমণ্ডন বহুলাংশে মহাকালীনতার অভিসারী।

তথ্যনির্দেশ

১ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, "অকাল প্রয়াত আবুল হাসান", 'দৈনিক বাংলা', ২৩শে নভেম্বর, ১৯৮০।

২ বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'আবুল হাসান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯।

৩ আবুল হাসান 'রাজা যায় রাজা আসে', খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৭২।

৪ বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৫ তদেব, পৃ. ২৫।

৬ তদেব, পৃ. ৪৩।

৭ তদেব, পৃ. ১৮।

৮ আবুল হাসান, 'যে তুমি হরণ করো' দ্বি-স, নসাস, ঢাকা, ১৯৮৫।

৯ আবুল হাসান, 'পৃথক পালঙ্ক', সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫।

১০ আবুল হাসান, 'প্রেমের কবিতা', ২য় প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২।

১১ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, "আবুল হাসানের কবিতা", 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃঃ ২৮৭।

১২ তদেব, পৃ. ২৮৪।

১৩ মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রমুখ (সম্পাদিত) 'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা', নসাস, ঢাকা, ১৯৮৫।

১৪ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পূর্বোক্ত।

১৫ আলী রীয়াজ, "বনভূমি লোকালয় থেকে কেন", 'দৈনিক বাংলা', ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৬।

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শেষ লেখা', ২ সংখ্যক কবিতা।

১৭ সুরাইয়া খানম, "আবুল হাসানঃ বিতর্কিত ব্যক্তিত্বঃ কবিতা এক সন্ন্যাসী", 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫।

১৮ হারুন হাবীব, "কবি আবুল হাসান", 'সংবাদ', ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮০।

১৯ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১।

শিষ্ট উচ্চারণে ধ্বনি সৌন্দর্যের গুরুত্ব

বেগম জাহান আরা

শিষ্ট উচ্চারণ এবং ধ্বনি সৌন্দর্য, বিষয় দুটি একে অন্যের সম্পূরক। অর্থাৎ শিষ্ট উচ্চারণে ধ্বনি সৌন্দর্যের অনুপস্থিতি যেমন শ্রুতিঘাতক হয়ে ওঠে, তেমনি শাস্ত্রসমর্থনহীন ধ্বনি ব্যবহার করে শিষ্ট উচ্চারণে কথা বলাও হয়ে ওঠে অর্বাচীন এবং অনর্থক প্রয়াস। বহুকাল আগেই বৈয়াকরণরা ধ্বনি সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন। অতঃপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে ভাষা বিজ্ঞানীরা ভাষার প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লেষন করে তার বৈশিষ্ট চিহ্নিত করেছেন। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও একথা সত্যি। বাঙলা ভাষার প্রতিটি ধ্বনির বৈশিষ্ট এখন বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার মতো বস্তুনিষ্ঠ, দৃশ্য এবং শ্রব্য। ডাক্তার যেমন করে মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করেন, তার গঠন অন্ত্র তন্ত্র অস্থি শিরা নালীর বিবরণ দিতে এবং দেখতে পারেন, একজন পদার্থ বিজ্ঞানী যেমন করে আলো এবং বাতাসকে পাত্রের মধ্যে বন্দী করে গবেষণাগারে তার ব্যবচ্ছেদ করে অণূ পরমাণূর রূপ ও গতিরীতি কি ও কেমন তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন, ভাষা বিজ্ঞানীও তেমনি করে মুখের ভাষাকে ব্যরচ্ছেদ করে বুঝিয়ে দিতে পারেন ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির গতিরীতি ও প্রকৃতির মধ্যে কি আছে।

ভাষা বিজ্ঞানীরা যেহেতু জানেন কোন ধ্বনির কি বৈশিষ্ট এবং কি কি তার স্বাতন্ত্র থাকা উচিত, তাই তাঁরা এটাও বুঝতে পারেন-কোথায় তা রক্ষিত হয়েছে এবং কোথায় তা রক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ ধ্বনির উচ্চারণ বিজ্ঞান সম্মত বা শাস্ত্রীয় হয়েছে, না শাস্ত্র রহিত হয়েছে এবং কতোটা শাস্ত্র বর্জিত হয়েছে। আর শাস্ত্রবর্জিত উচ্চারণের ফলাফলই বা কি? ইত্যাদি আলোচনা থেকেই ধ্বনি সৌন্দর্য বা ফোনো-এসথেটিক্স-এর ধারণা গড়ে উঠেছে। এও যথার্থ যে, ধ্বনির উচ্চারণ যদি শাস্ত্রীয় না হয়, তাহলে শাস্ত্রীয় তথা শিষ্ট উচ্চারণ নির্মাণ করা যাবে না কোন মতেই। যেমন, কেউ যদি বলেন- 'ফুলের কমল পাঁপড়ি', তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আমার একটি প্রবাদ মনে পড়ে- 'সোনার পাথর বাটি'। জানি ফুল আর ধাতু তুলনীয় নয়, তবুও অর্থগত বৈষম্যের দিকটায় কিছু মিল খুঁজে পাই। যাঁর কানে উচ্চারণের ফারাকটা ধরা পড়বে না, তিনি হয়তো প্রশ্ন করে বসবেন, এখানে ভুলটা কোথায়? কোমলকে কমল বলা হয়েছে, এ আর এমন কি? বোঝাতো যাচ্ছে বাক্যটা। যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নেই। তবে বাক্যের অর্থ একজন বাঙলা ভাষীর কাছে যতো সহজে বোধগম্য হবে, একজন বিভাষীর কাছে তা হবে না। আবার একজন ভাষা বিজ্ঞানীর ধ্বনি ব্যবচ্ছেদে অতি সহজেই ধরা পড়বে ভুলটা তথা ঘাটতিটা কোথায়, এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারবেন যে, শব্দের শুরুতেই একটি ধ্বনি অনুপস্থিত। যার ফলে শব্দের অর্থতাত্ত্বিক পরিচয় পাল্টে যাবেই। কোমল- অর্থ নরম, আর কমল অর্থ পদ্ম। একটি বিশেষণ পদ, অন্যটি বিশেষ্য। এদের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক প্রযুক্তিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেউ কারো সম্পূরক নয়। সমার্থক হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এবার কয়েকটি বাক্যের নমুনা দেয়া যাকঃ

১. ক. আমার যাত্রা পথকে কাঁদায় পিছল করোনা। (কান্না)

খ. আমার যাত্রা পথকে কাদায় পিছল করোনা। (কাদা)

২. ক. এই ছোঁড়াই তার সর্বনাশের কারণ। (ছেলে)
খ. এই ছোরাই তার সর্বনাশের কারণ। (অস্ত্র)

৩. ক. বেশি ঘোড়া আমি চাইনি। (জন্তু)
খ. বেশি ঘোরা আমি চাইনি। (চলাফেরা)

৪. ক. দোকানে তো শার নাই। (জমিতে দেয়ার সার)
খ. দোকানে তো সার নাই। (শিক্ষক)

৫. ক. শুভা যদি নাই থাকে, তাহলে এ ফুল দিয়ে কি হবে? (নাম)
খ. শোভা যদি নাই থাকে, তাহলে এ ফুল দিয়ে কি হবে? (সৌন্দর্য)

৬. ক. সে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। (মন)
খ. সে মানুষিক ভাবে বিপর্যস্ত। (মানুষের মতো)

১ থেকে ৬-এ বারোটি বাক্য আছে, তা কিন্তু শিষ্ট ভাষার কানুন মোতাবেক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে অহোরহ। এবং সবই আমার নিজের কানে শোনা। লক্ষণীয় যে একটি মাত্র ধ্বনির হেরফের ঘটার জন্য শব্দের উচ্চারণই শুধু নয় বাক্যের অর্থেও ব্যাপক হেরফের ঘটছে। ফলে ধ্বনি পরিবর্তন অথবা ধ্বনি বিচ্ছেদজনিত উচ্চারণ শ্রুতিকে কঠিনভাবে আঘাত করছে। এবং নিষ্ঠুরভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে ধ্বনির ললিত ও শাস্ত্রীয় সৌন্দর্য। এবার অন্য রকম কিছু বাক্যের দৃষ্টান্ত দেয়া যাকঃ

৭. ক. আজি এ প্রভাতে রবির কর। (prɔsbhate)
খ. আজি এ প্রোভাতে রোবির কর।

৮. ক. বন্যায় বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। (bɔsnnay)
খ. বোন্যায় বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

৯. ক. ওসুখে ছেলেটা কাহিল হয়ে গেছে।
খ. অসুখে ছেলেটা কাহিল হয়ে গেছে। (ɔsukhe)

১০. ক. রিদয় আমার নাচেরে .....।
খ. হৃদয় আমার নাচেরে.....।

১১ ক. দিকে দিকে শুনি ঐ কিসের আহোববান/আহববান/আওভান (ইংরেজী-ভি-এর মতো)
খ. দিকে দিকে শুনি ঐ কিসের আওভান/আহোবান।

১২. ক. ছাত্রছাত্রীরা আজকাল বেশ পড়াশোনা করে। (ছ-ইংরেজী এস-এর মতো)
খ. ছাত্রছাত্রীরা আজকাল বেশ পড়াশোনা করে।

৭ থেকে ১২-তে যে বারোটি বাক্য আছে, মূলত তা ছয়টি বাক্য। কারণ প্রতি সংখ্যায় যুগ্ম বাক্যের কাঠামো তো বটেই, অর্থও অভিন্ন। তবে উচ্চারণের বিপর্যয় কর্ণবিদারক না হলেও শ্রুতিপীড়ার কারণ হয়। আর সেই শ্রুতি-পীড়া হাসি বা বিরক্তির কারণ হতে পারে, কিংবা হতে পারে রাগ বা দুঃখের কারণ। একটা বিশেষ পরিবেশে বিশিষ্ট লোকের মুখে আমরা যখন শিষ্ট উচ্চারণ শোনার স্থিত বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করি, তখন শ্রীহীন ধ্বনির কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত উপস্থিতি

কারোই ভালো লাগে না। কেউ বলেন কেউ বলেন না। কেউ বোঝেন, কেউ বোঝেন না। কেউবা বোঝেন কিন্তু বলেন না, কিংবা বলার সুযোগ সাহস ভাষাপ্রীতি কোনটারই প্রমাণ দেয়া হয়ে ওঠে না। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ, তা হলোঃ ধ্বনি সৌন্দর্য জ্ঞান সবারই কম বেশি আছে। তাইতো শিষ্ট ভাষার ললিত ব্যবহারে সাধারণত সকলেই পরম সন্তোষ অনুভব অথবা প্রকাশ করেন। বস্তুত শিষ্ট ভাষার লালিত্য পুরোপুরি রক্ষা করে ধ্বনির শাস্ত্রীয় আচরণ; যা শ্রব্য হয় উচ্চারণে তথা ভাষায় তার প্রায়োগিক শৈলীতে। আর বোঝা যায় কথোপকথনের ক্ষেত্রে। জন্মগতভাবে যাঁরা বাঙলাভাষী (যদি না প্রবাসে জন্ম এবং বৃদ্ধি হয়), তাঁরা মাতৃভাষা বাঙলার জন্য অবশ্যই গৌরব বোধ করেন। নইলে বাহান্ন-র ভাষা আন্দোলন হতো না। আর ভাষা আন্দোলন না হলে স্বাধীনতা যুদ্ধের শক্তি এবং সাহসও অর্জিত হতো না। তবু এখন দুটো প্রশ্ন বড়ো প্রকট এবং বিকট জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথম, জীবনের সর্বস্তরে বাঙলা ভাষার ব্যবহার এখনও সম্ভব হচ্ছে না কেনো? দ্বিতীয়, বাঙলা ভাষার আদৌ কোনো শুদ্ধ রূপ আছে কি, এবং তার উৎস কোথায়?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ধ্বনি সৌন্দর্য ও ধ্বনির শাস্ত্রীয় উচ্চারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারণ ভাষার মূলে আছে ধ্বনি। প্রতি ভাষায় ধ্বনির সংখ্যা সীমিত, কিন্তু সেই ধ্বনি দিয়ে গঠিত শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি। আর বাক্যের সংখ্যা অগুনতি। আমরা জানি, পৃথিবীর যাবতীয় বিশ্লেষিত ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষিত। সেই বিশ্লেষণ অনুযায়ী ধ্বনি বৈশিষ্টের স্বাতন্ত্র তথা সাত্বিকতা যদি অক্ষুণ্ন রাখা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে ভাষার শুদ্ধরূপ কি এবং কোথায় তার উৎস। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। শিষ্ট ভাষা ব্যবহারে ধ্বনি সৌন্দর্য চেতনার উৎসও তো ঐ শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণে ধৃত আছে।

আমরা দেখেছি বিদেশীরা বাঙলা ভাষায় কথা বললে সরলমতি শিশু এবং কিছু দুষ্টু ছেলেমেয়ে ফিক ফিক করে হাসে। এই হাসির কারণ কি? নিশ্চয় বলা যায়, সেই ধ্বনি সৌন্দর্যের ব্যাপারটাই তাদের হাসির কারণ। ওরা ব্যাখ্যা করতে না পারলেও শ্রুতিকে তো বিশ্বাস করতেই হয়। তাই একজন বিভাষী যখন 'কলা' কে 'কোলা/খোলা'; 'টাকা'-কে 'ঠাকা /থাকা' 'তালা'-কে 'থালা/টালা'; 'পাকা'-কে 'ফাকা/ফাখা', ইত্যাদি বলে তখন বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝতে পেরেও শাসন মানে না হাসির বেগ। বিপরীত অবস্থা হয় আমাদেরও। বিভাষীয় উচ্চারণে আমরা যখন ধ্বনি সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারি না, তখন আমরাও হয়ে যাই হাসির পাত্র। যেমন, Father, Verb, Kite, Time, Park, Phonology, Phonological, Particular, ইত্যাদি ইংরেজী শব্দের উচ্চারণে ধ্বনি সৌন্দর্য রক্ষা করা তো দূরের কথা, সে ব্যাপারে সচেতন কজন? কিংবা জার্মান শব্দ -nur, dir, zeit, verbinden, wasser, liber, arbeits - amt, uber, ইত্যাদি উচ্চারণে ধ্বনি সৌন্দর্যের ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রে ধরতেই পারি না। ছোট্ট একটা গল্প মনে পড়ে। জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে এক বাঙালি-জার্মান দম্পতি (স্বামী বাংলাদেশী) হাসাহাসি করছে 'ত্সুয়েলভ' শব্দের উচ্চারণ নিয়ে। বাঙলাভাষীর কানে 'ত' ধরাই পড়ে না। ও বলে-'সুয়েলভ', আর বৌ বলে 'ত্সুয়েলভ'- অর্থাৎ বারো। নিজে উচ্চারণ করে আমি পার্থক্যটা বিশ্লেষণ করলে ও বুঝলো এবং উচ্চারণও করলো চমৎকার ভাবে।

বিদেশীদের ভাষা শেখাতে গিয়ে তাদের অজান্তেই বাঙলা ধ্বনির যে বেহাল অবস্থা আমি দেখি তার বর্ণনা দিতে গেলে মহাকাব্য বয়ান হয়ে যেতে পারে। তাই এখানে মাত্র কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেয়ার চেষ্টা করছি। যেমনঃ

ক. রাতে খুব ঝড় এসেছিলো-বাঙলা

খ. লাতে খুব জল এসেছিলো-চীনা

গ. রাতে খুব-উ জর-উ এসেছিরো-জাপানী/কোরিয়ান

ঘ. রাতে কুব জোর এসেইচিলো-ইংরেজী/আমেরিকান/রুশ

ঙ. রাতে খুব ঝার এসেছিলো-হিন্দী

চ. রাতে খুব ঝড় এস্‌চিলো-কোলকাতার বাঙলা

চীনা ভাষায় ল ও র-এর আপোস বদল যেমন চলে, জাপানী এবং কোরীয় ভাষাতেও তেমন চলে। তবে চীনা ভাষায় ল-এর সহধ্বনি র, অন্যদিকে জাপানী এবং কোরীয় ভাষায় র-এর সহধ্বনি ল। কোরীয় এবং জাপানী ভাষায় শব্দের অন্তে বদ্ধস্বর নেই। সবই স্বরান্ত। তাই বাস হয় বাস-উ, আইসক্রিম হয় ইসুকিরিমু। ইংরেজ এবং আমেরিকানদের শ্রুতিতে বাঙলা ধ্বনির অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণতা সহজে ধরা পড়ে না, সুতরাং তাদের উচ্চারণেও তারা ধরা দেয় না। আর দিলেও দুষ্টু বাচ্চার মতো লুকোচুরি খেলে। অর্থাৎ অল্পপ্রাণের জায়গায় মহাপ্রাণ ধ্বনি হাজির হয় এবং মহাপ্রাণের জায়গায় মহাপ্রাণতা লুকিয়ে থাকে। র এবং ড়-এর আপোস বদল (interchange) ঘটে অকারণে। স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থানে সাধারণত একটু যোগিকত্ব (dipthong) এ সে যায় আপনা থেকেই (এসেছে-এসেইচে/এইসেছে)।

হিন্দী ভাষীদের মুখে বাঙলা 'অ' প্রায় আ-র মতো হয়ে যায়। কোলকাতার শিষ্ট ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দন্ত-স প্রকৃত অর্থে দন্ত-স হতে চায়। যা শুনলে আমরা আবার একটু উসখুস করি। তার উপর কোলকাতাই উচ্চারণে ধ্বনির মহাপ্রাণতা এখন প্রায় গতায়ু অবস্থায় উপনীত হয়েছে, প্রাণটা আছে-শ্বাসটা নেই বললেই চলে।

বাঙলা ঘোষ অঘোষ ধ্বনির গাম্ভীর্য আর তরলতা তো অনেক সভ্য জাতি এবং সভ্য ভাষীও কানে শুনতে পায় না। কারণ তাদের ভাষায় ঐ বৈশিষ্ট আপোষ বদলের পর্যায়ে চলে গেছে। তাই কোরিয়া ভ্রমণকালে লক্ষ্য করেছি, জাতীয় বাদ্যযন্ত্র কায়াগুম-কে গায়াগুম/গায়াকুম/কায়াকুম/কায়াগুম সবই বলতে পারে কোরীয়রা। ঘোষ অঘোষ ধ্বনির স্বাতন্ত্র রক্ষা না করলেও তাদের বেশ চলে। শুদ্ধ এবং সিদ্ধভাবেই চলে। ধ্বনি শাস্ত্র ক্ষুণ্ন বা বিপন্ন হয় না। অথচ আমাদের বাঙলা ভাষায় তা চলবে না। বাঙলা ঘোষ অঘোষ ধ্বনির কম্পন যেনো নুপুর নিক্কনের মতো, গুরু লঘু শব্দের গতি প্রকৃতিও প্রকাশ করে দেয়। একজন সাধারণ ভাষীও সেটা বুঝতে পারবেন। সেজন্য বাঙলায় কাস-কে খাঁস-/গাস/ঘাস কিংবা তান-কে থান/দান/ধান বলা অসম্ভব। এতে ভাষীর শিষ্ট বচন শুধু ধ্বনি সৌন্দর্য বর্জিতই হবে না, শাস্ত্রচ্যুত ধ্বনিই হবে ভাষার হন্তা। আর সেই ধ্বনি- হন্তার ঘায়ে ভাষার ভাব এবং অর্থও হারাবে ভাব চলাচলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং প্রায়োগিক সৌষ্ঠব ও যোগ্যতা। এ যুক্তি মানতেই হবে আমাদের।

প্রসঙ্গত কয়েকটি বাক্যের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো;

১৩. অল্পপ্রাণ বনাম মহাপ্রাণ ধ্বনির আর্থ-শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যঃ

ক. কাপড়গুলো পালা করে রাখো।

খ. কাপড়গুলো ফালা করে রাখো।

গ. আমার তালা কোথায়?

ঘ. আমার থালা কোথায়?

ঙ. তার মাথা খারাপ।

চ. তার মাতা খারাপ।

১৪. ঘোষ বনাম অঘোষ ধ্বনির আর্থ-শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যঃ

ক.তার গলা ভালো না।

খ.তার কলা ভালো না।

গ. এতো বেশি বান হয়েছে।

ঘ. এতো বেশি পান হয়েছে।

ঙ. ধান দিলেই গান হয় না।

চ. তান দিলেই গান হয় না।

১৩ ও ১৪ নম্বরের বাক্য গুচ্ছে যথাক্রমে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির আর্থ-শৈল্পিক পার্থক্য দেখানো হয়েছে। ধ্বনি সৌন্দর্যের অভাবে বা পরিবর্তনজনিত অবস্থানে বাক্যের অর্থও বিপন্ন হতে পারে বিদেশীদের কাছে। ধরা যাক প্রশ্ন উঠলো, শিষ্ট তথা মানযুক্ত ভাষার মানটা কিসের, কোথায় এবং কেনো? উত্তর হবে, মানযুক্ত ভাষার মান তার বাকশৈলীতে, এবং বাকশৈলীর মধ্যে পরিমার্জিত যে শব্দ ব্যবহৃত হয়- সেখানেও তার মান বোঝা যায়। আর বোঝা যায় ব্যবহৃত শব্দের উচ্চারণে লগ্ন থাকে যে ধ্বনি সৌন্দর্য, তার সুকুমার শোভায়। এতোসব বন্ধন এড়িয়ে যেতে চাইলে ভাষার আভিজাত্য বজায় রাখা দুরূহ হয়ে উঠবেই।

তাছাড়া ধ্বনি সৌন্দর্যের ক্রিয়াকলাপ অন্যদিকেও বিস্তৃত। শিষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত একটি শিথিল ধ্বনি ফাঁস করে দেবে ব্যক্তির আঞ্চলিক পরিচয়। যেমন, গেছে-কে যদি বলা যায় 'গেলছে' কম-কে যদি বলা হয় 'কোম' তাহলে প্রায় চোখ বন্ধ করে বলা সম্ভব যে ভাষী যথাক্রমে রাজশাহী এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা। অথবা এ উপভাষার প্রভাব তার উপর ছায়া ফেলেছে, তা সে যে কোনো কারণেই হোক না। এছাড়া ধ্বনির সঠিক ব্যবহার বহন করে ব্যক্তির শিক্ষাগত ও ব্যবহারিক আচার এবং আচরণ। আমরা জানি, সম্মানিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা বলতে হলে ক্রিয়া পদে ন/এন যোগ করতে হয়। অথচ দেখা যায়, কথা বলার সময় অনেকেই যে ক্রিয়া ব্যবহার করেন তা ঐ ধ্বনি বর্জিত অবস্থায় উচ্চারিত হয়। ভাষা ব্যবহারে এ হেনো প্রায়োগিক স্খলন শুধু যে শিক্ষাগত ত্রুটি বা পারিবারিক শিক্ষার অভাবে হয়, তা নয়। বরং এর পেছনে প্রবল ভাবে কাজ করে আঞ্চলিক তথা উপভাষার একরোখা প্রভাব। পর্যাপ্ত শিক্ষা এবং দীর্ঘ প্রশিক্ষণও যার কাছে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য হার মানতে পারে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষের ভাষিক আচরণের উপর

আঞ্চলিকতার প্রায়োগিক দাপট একটু বেশি পরিমাণেই থাকে। সেক্ষেত্রে বহু চেষ্টা এবং প্রচণ্ড নিষ্ঠার ফলে ধ্বনি বর্জনের ত্রুটি দূর হতে পারে। একথা মানতেই হবে যে, শিষ্ট ভাষায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ধ্বনি সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বাক্য পরীক্ষা করে দেখা যাকঃ

১৫. ধ্বনিসহ বনাম ধ্বনিবর্জিত ক্রিয়ারূপের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যঃ

ক. মাস্টার মশায় সকালে ফোন করেছিলো।

খ. মাস্টার মশায় সকালে ফোন করেছিলেন।

গ. উনি খবর দিয়েছে, আজই আসবে।

ঘ. উনি খবর দিয়েছেন, আজই আসবেন।

ঙ. তিনি আজ ভাত খাবে না।

চ. তিনি আজ ভাত খাবেন না।

১৫ নম্বরের বাক্যগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ক্রিয়ার শেষে ন/এন ধ্বনি ব্যবহার না করলে কেমন শোনা যেতে পারে। যে কোনো সচেতন ভাষীর শ্রুতিতে ধ্বনিবর্জিত ক্রিয়ার ব্যবহার রীতিমতো আঘাত করবে। কারণ সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে ক্রিয়ার শেষে ব্যবহৃত সম্মানসূচক ন/এন ব্যবহারের রীতি আছে। সেই রীতি লংঘিত হয় ধ্বনির অভাবে। ক্ষুণ্ন হয় শিষ্ট ভাষার আভিজাত্য। অবহেলিত হয় ধ্বনি সৌন্দর্যের প্রায়োগিক গুরুত্ব। যার সঙ্গে যুক্ত থাকে ভাষীর শিক্ষাগত এবং পারিবারিক আচরণিক ঐতিহ্য। অথবা যুক্ত থাকে আঞ্চলিকতার বেয়াড়া প্রভাব বা ভাষার সৌন্দর্য সম্বন্ধে অসচেতনতা কিংবা অজ্ঞতা। উত্তরাঞ্চলের কোনো কোনো উপভাষায় এরকম বাক্য ব্যবহৃত হয় যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ক্রিয়ার বন্ধন শিথিল। কথা শুনলে মনে হয় ভাষী একই বাক্যে 'তুমি' এবং 'আপনি' একই সঙ্গে, একই ব্যক্তির জন্য, ব্যবহার করছে। শিষ্ট ভাষায় যা একেবারেই অচল। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'আপনি তুমি' মিশিয়ে না ফেলার সাধারণ সচেতনতা শিক্ষিত এবং সামাজিকভাবে মর্যাদাবান মানুষের জন্য অপরিহার্য ভাষিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান হওয়া একান্ত কাম্য। ফলে ঐ সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা ঘরেই শিখে নেবে তা। আর বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে এসে তো আনুষ্ঠানিকভাবে ওটুকু শিখতেই হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যক্তিত্ব গঠনে ভাষিক সৌন্দর্যবোধ অসাধারণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

ধ্বনি সৌন্দর্যের তন্ময়তা আরও বিস্ময়কর। তা যেমন গভীর তেমনি আবেগ কাতর। আমরা দেখি একই কথা শুধু স্বরভঙ্গির কারণে কোমল বা কঠিন হতে পারে। একই শব্দ প্রেমে এবং রণে ব্যবহৃত হতে পারে শুধুমাত্র ধ্বনি তরঙ্গের কৌশলী বিভঙ্গে। যেমন, এই (মৃদুকণ্ঠে), আবার-এই (উচ্চকণ্ঠে), দুরকমভাবে মনকে স্পর্শ করবে কিংবা অন্তর বিদারক হবে। সেই রকম যাহ্ (মৃদু-স্বরে) এবং যাহ্ (তুচ্ছার্থে) দুরকম অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করবে। আবার যদি বলা হয়- কি চাই (প্রসন্ন/রহস্য/সাধারণ প্রশ্ন) এবং কি চাই (বিরক্তি/রাগ), তাহলে দুরকম আবেগ প্রকাশ পাবে স্পষ্টভাবে। শিষ্ট ভাষায় ধ্বনি সৌন্দর্যের প্রায়োগিক দিক যে খুব স্পর্শকাতর এবং তথ্যজ্ঞাপক, তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এখন একনজরে দেখা যাক ধ্বনির প্রধান কর্মকান্ড কি কি? যেমনঃ

ক. ধ্বনি হতে পারে শ্রুতিঘাতক,
খ. ধ্বনি হতে পারে অর্থঘাতক,
গ. ধ্বনি হতে পারে আঞ্চলিক পরিচিতি জ্ঞাপক,
ঘ. ধ্বনি হতে পারে ব্যক্তিত্ব নির্দেশক,
ঙ. ধ্বনি হতে পারে শিক্ষা-সচেতন মনের পরিমাপক,
চ. ধ্বনি হতে পারে পারিবারিক ও ভাষিক ঐতিহ্য জ্ঞাপক,
ছ. ধ্বনি হতে পারে তন্ময় স্পর্শক, এবং
জ. ধ্বনি হতে পারে সম্মোহক।

সুতরাং ধ্বনি সৌন্দর্যের ব্যাপারকে অবহেলা করার জো নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- ভাব চলাচলের বাহন হলো ভাষা। তা সে বাহনটা যতো মনোলোভা ও আরামদায়ক হয় ততোই ভালো। পথে চলতেও তো উত্তম বাহনের সন্ধান করি আমরা। তার কারণও ঐ স্বস্তি বোধের চেতনায় প্রোথিত।

ধ্বনি সৌন্দর্যের ব্যাপারটা কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার ভাব চলাচল প্রক্রিয়াতেও আছে। সে আরও সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র। আমরা সবাই জানি সচল ও সজীব বস্তুর চলমানতায় যে নব নব বৈচিত্র এবং রহস্য তা অতিমাত্রায় জটিল এবং দুরুহও বটে। সে যাই হোক, মূল কথা হলো, শিষ্ট বচনে ধ্বনি সৌন্দর্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করতেই হবে। এই উপলব্ধি থেকেই হয়তো আজকাল ব্যাপক চেতনা এসেছে উচ্চারণ অনুশীলনের প্রতি। সচেতন জনগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছেন যে, উচ্চারণ পরিশীলিত না হলে রেডিও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করা যাবেনা, আবৃত্তি বা সংবাদ পাঠের যোগ্যতা অর্জিত হবে না, অনুষ্ঠান উপস্থাপন কিংবা আলোচনা চক্রে আদর পাওয়া যাবেনা, এমন কি বিয়ের বাজারে বর ও কনের দামও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা। এমন সব ভয়াবহ পরিণতি আমাদের কাম্য নয় কিছুতেই।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাঙলা শব্দতত্ত্ব* (৩য় সং), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯১
চমস্কি ও হালে, *দি সাউন্ড প্যাটার্ন অব ইংলিশ*, নিউইয়র্ক/লন্ডন, ১৯৬৮
বেগম জাহান আরা, *বাঙলা উচ্চারণঃ বিধি ও রীতি*, ঢাকা, ১৯৯০

পরিশিষ্ট ঃ

প্রবন্ধ পাঠের পর মুক্ত আলোচনার সময় কিছু কিছু প্রশ্ন এসেছিল দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের পক্ষ থেকে। যেমনঃ

প্রঃ শিষ্ট ভাষা কাকে বলে?

উঃ ভাষা বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা মতে ধ্বনি যথার্থ উচ্চারণসহ যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, যেখানে উপভাষা বা আঞ্চলিকতার প্রভাব লক্ষ্যণীয় হবে না, যে ভাষার পারস্পরিক বোধগম্যতা অনেক বেশি, আনুষ্ঠানিক পরিবেশে যে ভাষা আদরণীয়, নাগরিক জীবনে যে ভাষা সহায়ক, ভাবচলাচলের বাহনরূপে যে ভাষা সবার জন্যই স্বস্তিদায়ক- তাকেই শিষ্ট ভাষা বলা যায়।

প্রঃ বাঙলাদেশে কোন অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষ নিজ উপভাষা সগর্বে বলেন, তার কারণ কি মূর্খতা, নাকি আঞ্চলিকতাবাদ যার দ্বারা গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করা যায়?

উঃ আমার জানা নেই। উপভাষায় কথা বলা নিন্দনীয় নয়। তবে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে গায়ের জোরে উপভাষা ব্যবহারের কারণ হতে পারে দুটি; প্রথম, অযৌক্তিক ভাষিক আভিজাত্য দাবি করা; দ্বিতীয়, দুর্বলতা ঢাকার সচেতন প্রয়াস।

প্রঃ সহজে উচ্চারণ শেখা যায়, এমন বই লেখার পরিকল্পনা আছে কি?

উঃ আছে। বড়দের জন্য *'বাঙলা উচ্চারণঃ বিধি ও রীতিস্ব +++* বইটির চতুর্থ সংস্করণের কাজটি প্রেসে আছে, আশা করি এ বছরেই তা বাজারে লভ্য হবে (এখন বাজারে আছে বইটি)।

প্রঃ ধ্বনির শাস্ত্রীয় তথা বিশ্লেষিত উচ্চারণ কি শিথিল হয় না কখনও?

উঃ প্রধানত তিনটি কারণে হয়, যা সমস্ত জীবন্ত ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; যেমন, ভাষার স্বেচ্ছাচারগুণ, ভাষার রীতিসিদ্ধতা, এবং সাদৃশ্যজনিত প্রভাবে কখনও কখনও (বিশেষ করে সন্ধিযুক্ত শব্দে তা প্রকট) শাস্ত্র উপেক্ষিত হয়; মাতৃভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে তা খুব বড় বাধা হয় না বলেই মনে করি। তবে ভাষীকে এ ব্যাপারগুলো জানাতে পারলে ভালো, যে কাজ প্রাথমিক ভাবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যিক।

প্রঃ শিষ্ট ভাষায় ধ্বনির উপর এতো গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন কি?

উঃ ধ্বনিই ভাষার প্রাণ। শিষ্ট উচ্চারণ শ্রুতিসুখকর হয় বলে আবৃত্তি-কে আজকাল আমরা বাকশিল্পের পর্যায়ভুক্ত করেছি। আর বাকশিল্প বিচারের প্রধান মাপকাঠিই হলো ধ্বনি। ধ্বনির সুচারু উচ্চারণ।

প্রঃ সংক্ষেপে ভাষার সংজ্ঞা কি?

উঃ কঠিন প্রশ্ন। ভাষাবিজ্ঞানের ক্লাসে যা শিখেছি তারই ভিত্তিতে বলা যায়, ধ্বনি অঙ্গভঙ্গি ইশারা ছবি প্রতীক চিহ্ন যখন অর্থবাহী হয় তখনই তা হয়ে ওঠে ভাষা। মূলত ভাষা রীতিবদ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়, যাকে বলা হয় 'সিস্‌টেম'। ভাব চলাচলের ক্ষেত্রে ধ্বনি প্রতীক বা ইশারা যদি নিয়ম মাফিক অর্থপ্রকাশে সক্ষম হয়, তাহলে তাই-ই ভাষা। মানুষের তৈরি ভাষা মানুষের পরিমন্ডলেই সর্বোত্তমভাবে সার্থক, প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর।

* *আরও বহু ছোটো খাটো প্রশ্ন ছিল, আলোচনায় যার নিস্পত্তি করা হয়েছে তাৎক্ষণিক ভাবে। তদুপরি সেগুলো তেমন গুরুত্বপুর্ণ নয়, মোটামুটি সবারই জানা কথা।]*

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থাঃ সার্ক-এর স্বরূপ ও সম্ভাবনা

মুঈন উদ্দীন আহমদ খান

১ প্রসংগ কথা

হিমালয়ান উপমহাদেশ ঘিরে দক্ষিণ এশীয় সাতটি রাষ্ট্রপুঞ্জের আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম সার্ক। এ অঞ্চলে একশ কোটি মানুষের বাস এবং সার্কের উদ্যোক্তাদের চিন্তা-ভাবনায় এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর 'উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ- চেতনার সমৃদ্ধ ফসল, এ রাষ্ট্র সংস্থা। এই সেদিন- ১৯৮৫ সালে এর জন্ম। তবুও সংবাদপত্রের ভাষ্যে 'বয়স বেশী না হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি সাতটি দেশের মানুষের মনকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে।'[১]

অবশ্য সার্ক (SAARC) কথাটি একটি ইংরেজী সংক্ষিপ্ত প্রতীকী শব্দ। সাউথ্ এশিয়ান এসোসিয়্যাশন ফর রিজিয়ন্যাল কো-অপারেশন-শব্দগুলির প্রথম অক্ষর সমূহের সমন্বয়ে এ শব্দটি গঠিত। বাংলা ভাষান্তরেঃ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে গঠিত রাষ্ট্র সংস্থা।

এহেন ইংরেজী শব্দ মূলে একটি গুরুত্বপূর্ণ নামের মাধ্যমে অত্র এলাকার বহুজাতিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা লাভের বা যোগানের প্রয়াস- এ সমগ্র অঞ্চলে বিগত দুশ্বশ বছর ধরে বিরাজমান পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গের, বিশেষতঃ ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট ও অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শক্তিধর, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী রাজত্ব বা রাজনৈতিক প্রভাবের ইতিহাসের বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এতদসংগে একটি উজ্জ্বল দিকঃ জাতি সংঘের অতি সাম্প্রতিক কালের চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন এলাকার রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অঞ্চল ভিত্তিক সম্মিলিত উন্নয়ন কার্যক্রম ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান করার সিদ্ধান্তকেও ইহা নির্দেশ করে। তাই সার্ককে কটাক্ষান্তরে পুরাতন মননশীলতার ফসল রূপে চিহ্নিত করলেও, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় ইহাকে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করা যায়।

তাই স্বদেশী কার্যদ্যোগে বিদেশী ঐতিহ্যের অনুপেক্ষণীয় ও আকর্ষণীয় অনুপ্রবেশ, সনস্তাত্ত্বিক অঙ্গণে শিক্ষিত সমাজের নিকট সহজবোধ্য হলেও, আপামর জন সাধারণের মনে কিয়দ পরিমাণ ঐতিহ্যিক ওলট-পালট ভাবের জন্ম দেয় এবং চিন্তাপটে প্রশ্ন থেকে যায়।

সে যাই হোক, বপনের উদ্দেশ্য মূলে ও ফলাফলের প্রত্যাশার আদলে, সার্কের কর্মকাণ্ড যাচাই করে দেখলে, প্রথমতঃ ইহাকে একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার রাজনৈতিক প্রচেষ্টা হিসাবে সনাক্ত করা বিধেয়। অর্থাৎ সার্কের জন্ম আন্তর্জাতিক কৌশলনীতির রাজনীতিতে, তথা ডিপ্লোমেসির ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়।

রাজনীতি শাস্ত্রের দৃষ্টিতে বিষয়টির জটিলতার পাক খোলার জন্য একটি তুলনামূলক উপমার আশ্রয় নেয়া যায়। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাল খননের পলিসি, রাজনৈতিক দল বি. এন. পি-র দলীয় রাজনীতিতে আছে। দলীয় রাজনীতি হলঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দলীয় রণনীতি

বা পার্টি ট্যাকটিক্স, যা মাঠ পর্যায়ে সংঘটিত হয়। কিন্তু দলীয় রণনীতি একটি গণতন্ত্র ভাবাপন্ন রাষ্ট্রে রাজনীতির জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা গণতন্ত্রের রাজনীতি অবশ্যই জাতীয় স্বার্থ প্রণোদিত হতে হবে। দলীয় স্বার্থে জাতীয় রাজনীতি চালালে ভোট বিপর্যয় ঘটবে। তাই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি জাতীয় পর্যায়ে হতে হবে এবং তাতে একমাত্র জাতীয় স্বার্থে, সার্বিক জাতীয় প্রেক্ষাপটে জাতীয় রাজনীতিকেই যথার্থ অর্থে রাজনীতি বলা হয়। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জাতীয় সংসদেই নিতে হয়। অতএব, দলীয় রণনীতিকে যথার্থ রাজনীতিতে উন্নীত করতে জাতীয় স্বার্থের সাথে খাপ খাওয়াতে অথবা পাক দিতে হয়, যাতে দুই পাকে বা দুই গুণে, রজ্জুটির পাক স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু রাজনীতির রজ্জু দুই গুণে নড়বড় থাকে, তিনগুণে মজবুত হয়। যেমন খাল খননের রণনীতি, দলীয় নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু জাতীয় পরিচর্যায় পরিচালিত হয়ে, যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা ডিপ্লোমেসীর স্তরের, দাতা রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং "কাজের বদলে খাদ্যঃ লাভ করে, একমাত্র তখনই খাল খননের পলিসী কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করে এবং তিনগুণে রজ্জুটি মজবুত হয়।

অতএব, বিপরীত দিক থেকে সার্ক এর রাজনীতি আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমেসীর ক্ষেত্রে জন্ম লাভ করে, বিভিন্ন জাতীয় রাজনীতির সাথে কার্যকরীভাবে বিজড়িত হয়ে যখন সদস্য দেশগুলোতে দলীয় রণনীতির বলিষ্ঠ সমর্থন পাবে, একমাত্র তখনই সার্কের রশি মজবুত হবে।

এ স্তরে গভীর ভাবে চিন্তা করার বিষয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতি গোড়ার দিকে যে পরিমাণ হতচকিত ছিল, বিশ বছরেও তার সম্পূর্ণ উপশম হয়নি এবং তা এখনও দলীয় ও জাতীয় রাজনীতির দুইগুণি পাকেই আবর্তিত হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমেসীর তৃতীয় গুণে এখনও পাক পড়েনি। অতএব, বাংলাদেশের রাজনীতির রজ্জুকে মজবুত করার জন্য সার্কের কৌশলনৈতিক ক্ষেত্র যারপর নাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সম্ভাব্য সকল উপায়ে সার্কের জনপ্রিয়তা এ অঞ্চলের দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার যুৎসই পন্থা অবলম্বন করা আমাদের জন্য বিধেয়।

২ সার্কের স্বরূপ, ভৌগলিক অবস্থান ও বৈচিত্র

সার্ক আন্তর্জাতিক ঐক্য জোট, হিমালয়ান উপমহাদেশের রাষ্ট্রপুঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত। এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি হলঃ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ। এর প্রত্যেকটিই সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র। অতএব, মূলতঃ সার্ক একটি আন্তর্জাতিক স্তরের রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় জোট। তবে ইহা সিয়াটো, সেন্টো বা ন্যাটোর মত যুদ্ধংদেহী জোট নয়, আসিয়ান ও ই.ই.সি.-র মত যুদ্ধ প্রতিরোধক, অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণ উন্নয়নে সহযোগিতামূলক, শান্তিকামী জোট।

এ রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি ভৌগলিক অবস্থান ও পরস্পর সংলগ্নতা, এ গুলির সম্মিলিত একক জোট কল্পনা করতে সাহায্য করে। ভূ-তাত্ত্বিক দিক দিয়েও এ রাষ্ট্রগুলি হিমালয় পর্বত মালার সম্প্রসারিত ভূ-ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন ভূ-খণ্ড।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি বৈসাদৃশ্যতায় সীমাহীন বৈচিত্র মণ্ডিত। এর উত্তর পাশে তুষারাবৃত পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃংগ এভারেষ্ট ও কে-টু পর্বত মালা, দক্ষিণে বংঙ্গোপসাগর ও

ভারত মহাসাগরের অতল সমুদ্র, পূর্বে লুসাই পবর্তমালার আকাশচুম্বি পাহাড় ও অরণ্য ভূমি, পশ্চিম সুদূর প্রসারী আরব উপসাগরের কড়া লবনাক্ত জলরাশি। তবুও এর অশেষ বৈচিত্রের মধ্যে আবহাওয়ার দিক দিয়ে মৌসুমী বায়ুর এলাকা হিসাবে এ অঞ্চলটিতে আবার ঐক্যতান ফুটে ওঠে। তাই আবহাওয়াবিদদের নিকট এ অঞ্চলটি একটি সম্মিলিত একক হিসাবে গণ্য হয়।[২]

এতদসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে, আবহ ক্ষেত্রের এ ঐক্যতান বাস্তবতার সীমাহীন বৈচিত্রের মধ্যে প্রায়শঃ বিলীয়মান হয়ে পড়ে। উত্তরের বরফঢাকা হাড়-কাঁপানো পার্বত্য শীত, দক্ষিণ-পশ্চিমে মরুপ্রান্তরের চর্ম-বিগলিত ভ্যাপ্সা গরম, পশ্চিমের বৃষ্টিপাতহীন উষর মরুভূমি, পূর্বের প্রবল বৃষ্টিপাতের সমাবেশ, এ রাষ্ট্রপুঞ্জকে বৃহত্তর বিশ্বের বুকে একটি ক্ষুদ্রকায় বৈচিত্রময় একান্ত বিশ্বে রূপায়িত করে।[৩]

এ অঞ্চলে বিচরণকারী পশুপক্ষী, জলে স্থলে বিদ্যমান গাছ-পালা, তরুলতা, ফলফুল ইত্যাদির রকমারী বৈশিষ্ট, জ্ঞান-অন্বেষী পণ্ডিতবর্গ ও সৌন্দর্য-পিয়াসী পর্যটকদল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় মনোহারী পণ্যদ্রব্যের বণিক সওদাগরকে যুগযুগান্তরে আকৃষ্ট, বিস্মিত ও বিমোহিত করে রাখে।

সর্বোপরি মানুষের রং ঢং, চেহারা সুরত, দৈহিক গঠন, মানসিক ধ্যান-ধারণা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, ধর্ম, কর্ম, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, যুক্তি-তর্ক, কথাবার্তা, বহুধা লিখন পদ্ধতি ও অক্ষর-বিক্ষরের বৈচিত্রের পরিধি অন্তহীন। শক্তদেহী বেঁটে নেপালী গূর্খা, শূকনাদেহী নরম চর্ম-ধারী বাংগালী, লম্বা সুঠাম পাঠান ও পাঞ্জাবী, কমলা রংগী কাশ্মীরী, সুশ্রী রাজপুত, কালচে করংগী, বাদামী রং এর মংগোলীয় ও হলুদচে চীনা রক্তের আমেজ যুক্ত পাহাড়ীয়া, ছড়ানো ছিটানো নিগ্রো ও পলিনেশীয় রক্তের প্রভাবযুক্ত জনগোষ্ঠীর ছড়াছড়ি, এ অঞ্চলের সাদৃশ্য থেকে বৈশাদৃশ্যের দিকেই জোরালো ইংগিত বহন করে।

এরূপ বৈশাদৃশ্যের ফলশ্রুতিতে, এ অঞ্চলের জাতিগত শত্রুতা ও প্রজাতিগত বিদ্বেষ এবং বর্ণবাদী হিংসা, এমনকি গোত্রীয় হিংস্রতা ও দলীয় নিষ্ঠুরতা দুনিয়ার বহু অঞ্চলকে অতিক্রম করে। এখানে জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে, বর্ণে বর্ণে, দলে দলে সংঘাত, সংঘর্ষ, গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক দলাদলি, হানাহানি, বিদ্রোহাত্মক উস্কানি, কূটনৈতিক চক্রান্ত, ফন্দি ইত্যাদির মাত্রা প্রায়শঃ সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মর্মান্তিক ভাবে ব্যাহত করে। ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা, স্বাচ্ছন্দ্য অহরহ বিপন্ন হয়, ও নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতা, অশান্তি ও হতাশার সৃষ্টি হয়।[৪]

ফলে, 'পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা, বৈদেশিক নীতির বিভিন্নতা, কৌশলগত দৃষ্টিভংগী, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা ও প্রতিযোগিতার ঝুঁকি, এ অঞ্চলের ভূখণ্ড নিয়ে কলহ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির গোষ্ঠিগত ও ভাষাগত অধিকারের প্রশ্ন, এ অঞ্চলের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়।'[৫]

এ অঞ্চলের রাষ্ট্রের গঠনও এক প্রকার নয়। ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গণতন্ত্র ভাবাপন্ন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার জিগিরে অভ্যস্ত, পাকিস্তান ও মালদ্বীপ বিঘোষিত ইসলাম ভাবাপন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র; আর নেপাল হল সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ভিত্তিক গণতন্ত্র এবং ভুটান বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র। তাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে বিরোধই বর্তমান।

অতএব, এ অঞ্চলের রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে ভৌগোলিক, মানসিক বা রাজনৈতিক যে কোন প্রকার শাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুস্কর। বরং তাদের সর্বস্তরে বৈসাদৃশ্য, বিদ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদ, সীমান্ত বিরোধ, হানাহানি, সীমান্ত পেরিয়ে লুটতরাজ, পরস্পরের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি, সীমান্ত বিদ্রোহের উস্কানী ইত্যাদির পাল্লা এতই ভারী যে, এতে ঐক্যের স্বপক্ষে ভোটের পরিবর্তে, ঐক্যের বিরুদ্ধে ভেটোর মনোবৃত্তিই অধিকতর প্রকটাকারে দেখা দেয়।

অতএব, নিরীহ ধরণের চোখ-বোজা সহানুভূতি, তিরস্কারবিহীন নীরব সহনশীলতা, সীমাহীন ও অকুণ্ঠ ধৈর্য, এক কথায় নিথর সহিষ্ণুতা, এ অঞ্চলে সৎ গুণ বা শধর্রলণ হিসাবে প্রশংসিত।

৩ কৌশলগত বিবেচনা

এতদসত্ত্বেও মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়াস, আরাম, আয়াস ও আনন্দ উপভোগ করার বাসনা, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের প্রেরণা, সমঝোতা মূলে একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করার তাগিদ, সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক তৎপরতার কলা-কৌশল, আর বিশেষ করে আধুনিক যুগের কঠোর অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় সত্ত্বা বজায় রাখার তাগিদে, বিশেষতঃ দীর্ঘ দুই শত বছর ধরে পশ্চিমা বেনিয়া উপনিবেশবাদী ও আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক সওদাগরী পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যে নিষ্পেষিত দক্ষিণ এশিয়ার নিপীড়িত, অধঃপতিত, দারিদ্রক্লিষ্ট, রোগাক্রান্ত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সন্ধানে, এ অতুল সুন্দর, সম্পদে ভরপুর, মনোরম, মনোহারী বহুজাতিক জনগোষ্ঠীর বৈচিত্রময় অধিবাস, দক্ষিণ এশীয় হিমালয়ান উপমহাদেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যজোটবন্দীর ডাক অল্প সময়ের এমনকি তোড়জোড় বিহীন হাঁকডাকে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'পর পর পাঁচটি দেশে দক্ষিণ এশিয়া গেমস প্রতিযোগিতা সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, এ অঞ্চলের মানুষের মনে আত্মিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে'। মালদ্বীপ এবং ভূটান তাদের স্ব স্ব দেশে দক্ষিণ এশিয়া গেমস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে অপারগতা প্রকাশ করলেও সার্কের চেতনা সমুন্নত রাখার প্রয়াসে, প্রতিটি প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াবিদ পাঠিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ষষ্ঠ সাফ গেমস পুনরায় বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যার জন্য এখন থেকেই আয়োজন ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৬]

উদ্যোক্তাদের আভাস ইঙ্গিতে মনে হয়, ধন বৃদ্ধির প্রয়াসে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের ই.ই.সি (E.E.C) আঞ্চলিক জোটের মডেলে এবং সমৃদ্ধি অর্জনের প্রত্যাশায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (ASIAN) এর দৃষ্টান্ত মূলে তারা সার্কের সাংগঠনিক অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন।[৭]

আদতে, অত্যাধুনিক যুগের কঠোর প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে, শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি যেখানে বিশ্ব বাজারকে ছলে-বলে-কৌশলে কুক্ষিগত করেছে এবং ব্যাংকিং কারবার, কারেন্সী নিয়ন্ত্রণ ও টেরিফ প্রবর্তনের মাধ্যমে, তাদের দূর-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী একচেটিয়া পনির বাজারে পরিণত করেছে, তদুপরি যেখানে তাদের পুঁজিবাদী ধাঁচের মুক্ত বাজার অর্থনীতি ধনী দেশগুলিকে ক্রমশঃ অধিকতর ধনী ও গরীব দেশসমূহকে অধিকতর গরীবে পরিণত করছে, সেখানে সময়

থাকতে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা ও আত্ম সংরক্ষণের এবং যুক্তি সংগতভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক প্রগতি অর্জন করার জন্য, একজোট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সার্কের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্রে এবং ঘোষণা পত্রাদির মূল সুরে এরূপ ধ্যান-ধারণাই প্রতিভাত হয়।

এ ধরণের বাস্তব উপলব্ধির তাগিদে এবং চিন্তা-ভাবনা মুলে বাংলাদেশের মরহুম রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (১৯৮০ খৃঃ) তিনি এ অঞ্চলের সরকার প্রধানদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অব্যাহত রেখে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

অবশেষে বাংলাদেশ সরকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসাবে, সার্ক আত্মপ্রকাশ করে।[৮] অতএব, সার্কের প্রতিষ্ঠার পেছনে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌশলগত কারণই বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

৪ সার্কের উদ্ভূত প্রয়োজনীয়তা

হিমালয়ান উপমহাদেশের রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়নের জন্য জোট গঠন ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথভাবে দণ্ডায়মান হবার কৌশলগত প্রয়োজনীয়তার উদ্ভূত কারণ বহুবিধ। কেননা, দুই শত বছর ধরে সমগ্র বিশ্বের উপর পাশ্চত্যের নিরংকুশ আধিপত্য পূর্ববর্তী উৎপাদনমুখী বিশ্ব অর্থনীতিকে বাজারমুখী অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করে। পূর্ববর্তীতে অর্থনীতি 'দক্ষ শ্রমের মূল্য'-কেন্দ্রিক ছিল ও পরবর্তীতে অর্থনীতি 'আড়ৎদারীর মাহাত্ম্য' -কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিবর্তন লক্ষ্য করে মহাকবি ইকবাল বলেছিলেনঃ 'হে পাশ্চাত্যের অধিবাসী, এ দুনিয়াকে তোমরা খোদার দোকান মনে করো না'। আদতে ইত্যবসরে তারা শ্রমকে দাসত্বে পরিণত করে এবং আড়ৎদারীর সার্বভৌমত্ব বিশ্ববাপী কায়েম করে বসে। তাতে সওদাগরি বুদ্ধি, উৎপাদনের দক্ষতাকে অতিক্রম করে যায়।

তদুপরি ছলে-বলে-কৌশলে, তাদের আধুনিক রাজনীতির পথপ্রদর্শক ম্যাকিয়াভেলীর ভাষ্যেঃ 'শিয়ালের চামড়ার মোড়কে সিংহের পদচারণা' করার মাধ্যমে তারা সমগ্র দুনিয়াকে ছলে-বলে-কৌশলে শোষণ করে, বিশ্বজোড়া সম্পদকে তাদের কুক্ষিগত করে ফেলে। তখন ভাগ্যচক্রে, পূর্বাঞ্চলীয় এশিয়া আফ্রিকার সভ্যতায় মন্দা দেখা দেয় ও পক্ষান্তরে তাদের নব অর্জিত সম্পদের সাথে উন্নততর ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত হয়। তারা সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে একদিকে কারিগরি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করে ও কল-কারখানা ভিত্তিক বিপুল উৎপাদনের মাধ্যমে দুনিয়ার বাজারের আড়ৎসমূহ ভর্তি করে দেয়। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে মারাত্মক মারণাস্ত্র উৎপাদন করে, অস্ত্রের সাহায্যে দুনিয়ার সার্বভৌমত্ব আঠারো শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক কৌশলে এবং দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক কৌশলে কুক্ষিগত করে রাখে। তাদের প্রথমার্ধের 'শিয়ালের

চামড়ার মোড়কে সিংহের' খেলা, দ্বিতীয়ার্ধে 'লাঠি ও কলা প্রদর্শনীর নীতিতে' রূপায়িত হয়।[১০] এ নীতিকেই নব-উপনিবেশবাদ[১১] ও নব-আধিপত্যবাদ[১২] নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এমত অবস্থায়, প্রথমতঃ এ সমগ্র অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ভাগ্য চক্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তির দাপটে একশ থেকে দুইশ বছর ধরে বিরতিহীন ভাবে নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত ও শোষণ-এ জর্জরিত হয়ে পশ্চাদপদতার শিকার হয় এবং অত্র এলাকার পণ্য উৎপাদনকারী ও শ্রমজীবিরা নিজ নিজ পেশাগত কাজ কারবার থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমাহীন দরিদ্র, অসহায়তা, অজ্ঞতা ও রোগাক্রান্তের অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয়।[১৩]

দ্বিতীয়তঃ ইংরেজ দখলদার শক্তি এ সমগ্র এলাকার ঐতিহ্যগত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগর্বকে ধ্বংস করে প্রথম ধাপে এ অঞ্চলকে নেতৃত্বহীন ক্ষুদে সমাজে পরিণত করে ও পরবর্তীতে দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে ধারাবাহিক ভাবে বিধ্বস্ত করে, জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জনের আশা-আকাঙ্খাকে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের দোসর হিসাবে চাকুরীবৃত্তি, লেজুড়বৃত্তি ও সহায়ক বুদ্ধিজীবিবৃত্তির দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। একটি ইংগিত পূর্ণ দৃষ্টান্ত হল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Education Despatch.[১], যাতে বলা হয় যে, ভারতীয়দের জন্য First Grade শিক্ষার প্রয়োজন নাই, Secondary Education তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা এমন জ্ঞান বিতরণ করতে চায়নি, যদ্বারা স্বাধীন- চিন্তা সম্পন্ন পূর্ণ মানবতার বিকাশ ঘটে, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত তারা এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক Functionaries ও clerk তৈরী করতে চেয়েছিলেন। যারা তা গ্রহণ করল তারা Catchword কে শিক্ষা বলে জ্ঞান করে। ১৮৮২ সালে হান্টার সাহেব বলেনঃ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা একটি "Sterile exercise in obtaining useful knowledge rather than a real culture of mind.[১৪]

ফলে এ সমগ্র এলাকায় প্রায় একই রকম অধঃপাত ও বিপর্যয় মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে এবং এর শেষ পরিণতিতে মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনকে এমনি ভাবে আচ্ছন্ন করে যে, অত্র এলাকার সাধারণ পশ্চাদপদতার সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ উপযোগী পুঁজির প্রকট অভাব সর্বস্তরের জনজীবনকে নৈরাশ্য, অস্থিরতা ও বিক্ষুব্ধ ভাবের আকারে পরিণত করে, যা সহজেই রাজনৈতিক বিক্ষোভে ও লক্ষ্যহীন কাল্পনিক সমাজ-বিপ্লবের আন্দোলনে ফেটে পড়তে সর্বক্ষণ উদ্যত থাকে।,[১৫]

মূলতঃ একটি বিশাল বহুজাতীয় জনগোষ্ঠীর জাতিগত, প্রজাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত ও দলগত বিভেদ, বিসম্বাদ, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণাদুষ্ট, পরস্পর বৈরী ভাবাপন্ন সামাজিক চত্বরে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপা জ্বালাময়ী বিক্ষুব্ধ ভাবের প্রলেপের মারাত্মক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াশীলতাকে যথাযথ ভাবে সংযত, অবদমিত, প্রশান্ত ও প্রত্যাশান্তরিত করতে পারা না গেলে- এই নেতিবাচক ঋণাত্মক দাবানলের দাবদাহে এ সমগ্র অঞ্চলের মানবিক উন্নতি ও সম্পদের উন্নয়নের সর্বপ্রকার আশা, ভরসা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড ভস্মিভূত হতে বাধ্য।

অতএব, এ অঞ্চলের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক অনাক্রমণের নীতি অবলম্বন করে, পরস্পরের সার্বভৌম সমতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, একে অন্যের এলাকার অভ্যন্তরে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার উস্কানী ও সহায়তা প্রদান থেকে বিরত থেকে, গুপ্ত চরবৃত্তি ও সন্ত্রাসী তৎপরতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একে অন্যের এলাকার মধ্যে নাশকতা মূলক কার্যকলাপে লিপ্ত না

হওয়ার অথবা একের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অপরের হস্তক্ষেপ না করার অংগীকারে পরস্পরের মানবিক উন্নতি ও সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে, জীবন রক্ষা ও জীবনোন্নয়নের ক্ষেত্রে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করার আশু প্রয়োজনে, দক্ষিণ-এশীয় জোট প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের প্রতি সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।[১৬] এতে বিশেষ ভাবে নিহিত ছিল একটি সম্মিলিত মহৎ প্রত্যাশা, যাতে অত্র অঞ্চলের ছোট বড় রাষ্ট্রগুলি একে অন্যের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, পরস্পরের প্রগতির পথে বাধ না সাধে, পরস্পরের সাংবিধানিক অগ্রগতি ব্যাহত না করে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাতে পরস্পরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় সৌহার্দপূর্ণ ভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ নীতি মূলে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তার সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা।

তৃতীয়তঃ অত্র অঞ্চলের এক থেকে দুই শত বছরের অধীনতার কবলে সৃষ্ট সর্ব ব্যাপী ক্ষুদার তাড়না, অজ্ঞতার অন্ধকার ও রোগের প্রকোপ নিরসনে মানবিক সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীর নামে কোন কোন শক্তিধর ধনী রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্যবাদী অপকৌশল, ক্ষতিকর প্রচারণা, গুপ্তচর বৃত্তি, এমনকি সন্ত্রাসী-মদদ তৃতীয় বিশ্বকে সম্প্রতি অতিষ্ট ও আতংকিত করে তুলেছে, যা কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নকামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। এসব অপকৌশলকে সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ করার জন্যও সার্কের প্রয়োজন অনুভব হয়।

চতুর্থতঃ বৃহৎ শক্তি বর্গের আধিপত্যবাদী দৌরাত্ম ছাড়াও, তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত কোন কোন রাষ্ট্র, নিজেদের সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করে দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের প্রতি মাতব্বরীপনা বড় ভাই সুলভ ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছে। এরূপ মুরুব্বীয়ানা আচরণে ভুক্তভোগী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দেয় এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট ছাড়াও উন্নয়ন কর্মকান্ড জঘন্য ভাবে ব্যাহত হয়। এক সময়ে ইন্দোনেশিয়া যেমন প্রতিবেশী রাষ্ট্র মালেশিয়ার প্রতি হুমকী সৃষ্টি করেছিল কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ঐক্য জোট এসিয়ান প্রতিষ্ঠার খাতিরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম সমতা মেনে নিয়ে পরবর্তীতে একটি মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে[১৭] অনুরূপ ভাবে ভারতের সাথে শ্রীলংকার, পাকিস্তানের, নেপালের ও বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষেত্রে মরণপণ বিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। ভারত যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রবর্গের সাথে সার্কের শর্ত মোতাবেক সার্বভৌম সমতার নীতি মেনে চলে তবে এ অঞ্চলেরও বিপুল কল্যাণ সাধিত হতে পারে। অন্যথায় দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এশিয়ান প্রতিষ্ঠা-পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার দাপটগ্রস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমতুল্য থেকে যাবে, যা কিছুতেই এ অঞ্চলের ছোট বড় কোন রাষ্ট্রের জন্য কাম্য নয়।

দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল যে, এ অঞ্চলে বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে পরিবেষ্টন করে অবস্থিত। ভারতের সাথে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের যৌথ সীমানা রয়েছে। তদনুরূপ অন্য কোন দুই রাষ্ট্রের যৌথ সীমানা নাই। অতএব, এ অঞ্চলের কঠিন আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি ভারতের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক। এখানে বিদ্যমান কোন বহুপক্ষিক সমস্যা চোখে পড়ে না। অথচ সার্কের চার্টারে আলোচ্য বিষয় বস্তুর তালিকা থেকে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলি বাদ দেয়া হয়েছে। এতে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে সার্কের কার্যকারিতার দুই-তৃতীয়াংশ সম্ভাবনা ইচড়েই বিনষ্ট হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে বিস্তর সমালোচনা দৃষ্টে মনে হয়, দ্বিপক্ষীয় আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি ও সার্কের বিবেচনাধীন করা- এ

অঞ্চলের প্রগতি ও সার্কের অগ্রগতির জন্য বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলজনক হতে পারে। সার্কের চার্টারের দশম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ 'দ্বিপাক্ষিক ও বিবাদমান বিষয়গুলি বিবেচনা থেকে বাদ দেয়া হবে'।[১৮] সার্ক কে এভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয় থেকে অন্তরণ করার নীতির যথার্থতা সম্বন্ধে ইদানিং বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান হয়ে পড়েছেন।[১৯]

আর একটি বহুল আলোচিত বিষয় হল, সার্কের শীর্ষ সম্মেলনের বেলায়, সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি সাংবিধানিক ভাবে প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন, তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির শর্ত আরোপ। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বেলায় এ প্রভিশনটির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু শ্রীলংকা ও ভারতের অভ্যন্তরে বর্ণগত, সাম্প্রদায়িক, বংশগত ও ধর্মগত দাংগা এবং প্রজাতিগত হানাহানি, বিদ্রোহ ও স্বাধীনতাকামী যুদ্ধ বিগ্রহ, যা সদা সর্বদা লেগেই আছে বা থাকে, এমনকি ভারতের বাইরে শ্রীলংকায় ভারতীয়দের বিদ্রোহ এবং ভারতীয় মদদ পুষ্ট পাহাড়িয়া উপজাতীদের বাংলাদেশে নাশকতামূলক কার্যকলাপ, এ অঞ্চলের অস্থিরতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব অস্থিরতার কারণে কোন না কোন সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না পারায়, সার্কের শীর্ষ সম্মেলন কয়েকবার ব্যাহত ও বাধ্যগত ভাবে স্থগিত হয়েছে।

ভারতের এ অস্থিরতার প্রকোপ, ভারতীয় রাজনীতির প্রধান স্থপতি পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর প্রত্যাশা অনুযায়ী, 'সময়ের আবর্তে উপশম হওয়ার'[২০] পরিবর্তে আরো গুণাগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংক্রমণের মাধ্যমে উপরন্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন করেছে।[২১] অতএব, এ বিষয়টি বর্তমানে ভারতের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলিকে এবং প্রকারান্তরে সার্ক এলাকাধীন সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। কেননা, সার্ক অঞ্চলের সমস্ত রাষ্ট্রগুলিই ভারতের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র এবং এগুলির কোনটির পক্ষেই ভারতের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া থেকে গা সারা বার উপায় নেই।

সুতরাং কথা উঠেছে যে, ভারত স্বাধীনতা উত্তর যুগ থেকেই পূর্ববর্তী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন কেন অপরিবর্তিত ভাবে বজায় রেখে চলেছ? এমনকি ভারতীয় প্রশাসনে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যও বহুলাংশে বজায় রয়েছে কেন?

তদুপরি অধুনা বিধ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে ভারতের ক্ষমতাধারীরা শান্তির জন্য আন্তরিকতা ও মনের মিলের উৎসের সন্ধানের পরিবর্তে, সামরিক শক্তি ও মারণাস্ত্রের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে সচেষ্ট হয়েছে কেন? এ উদ্দেশ্যে উত্তরোত্তর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে ভারত শক্তির দাপটে একলা চলার মান্ধাতা আমলের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ করে চলেছেই বা কেন? পরাশক্তি ও বৃহৎ শক্তিবর্গের গোয়েন্দাদের কাছ থেকে প্রায়শঃ শোনা যায় যে, ভারত মহাসাগরে বৃটিশের পরিত্যক্ত ভূমিকা ভারত কাঁধে তুলে নেয়ার জল্পনা কল্পনা করছে।

ভারতের পুরানো ঐতিহ্য ঘেঁটে অনেকে দেখেছেন যে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতির দুইজন প্রয়াত স্থপতি, কে. এম. পানিক্কর ও কৃষ্ণমেননের নির্দেশনা অনুযায়ী উপরোক্ত অসম নীতি গুলির পদচারণায় ভারত প্রাচীন যুগের গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্যের দণ্ডনীতির অনুসরণ করে চলেছে।

বিশ্বব্যাপী এরূপ কানাকানি ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বুদ্ধিজীবিদেরকে সার্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত ও শংকিত করে। কেননা, এ অঞ্চলটি ভৌগলিক দিক থেকে একান্তভাবে ভারত-কেন্দ্রিক। তাই সার্কের স্থায়িত্ব ও প্রগতি একান্তভাবেই ভারতের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ভারত যদি এ অঞ্চলে 'শক্তির দাপটে একলা চলার' নীতি গ্রহণ করে,[২২] অথবা কৌটিল্যের বৈদেশিক নীতি প্রসূত ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে 'দণ্ড মূলে পোষণ'[২৩] করার নীতি অবলম্বন করে, তবে অচিরেই সার্কের দফা রফা হয়ে যেতে বাধ্য। আবার এ অঞ্চলে ভারতের বৈদেশিক নীতিতে পাশ্চাত্যের ম্যাকিয়াভেলিয়ান সুযোগ সন্ধানী নীতির আভাস দিন দিন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় 'শিয়ালের চামড়ার মোড়কে সিংহের পদচারণা'[২৪] বা বানর নাচার মতই 'লাঠি ধরে কলা দেখানোর খেলা'।[২৫] এ অঞ্চলের বুদ্ধিজীবিদের ধারণায় এ সব নৈতিকতা-বিগর্হিত নীতির আমূল পরিবর্তন করে একমাত্র মানবিক মূল্যবোধ ও সার্বভৌম সমতার নীতিভিত্তিক গণতন্ত্রমুখিন বৈদেশিক নীতি, খোদ ভারতের পক্ষে এবং ভারতীয় দৃষ্টান্ত মূলে অন্য সব রাষ্ট্রের পক্ষে, অবলম্বনের মাধ্যমেই সার্কের স্থায়িত্বকে সুদৃঢ়, অবস্থানকে সতেজ ও ভবিষ্যৎকে বিপুল সম্ভাবনাময় করে তোলা সম্ভব।

৫ সার্কের ক্রম বিকাশ

সার্কের ক্রমবিকাশের পদচারণাকে সাধারণতঃ তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে একটি আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করার জন্য এ অঞ্চলের সরকার প্রধানদের নিকট ১৯৮০ খৃঃ সনে একটি বার্তা পাঠান। ফলে ১৯৮১ সনের এপ্রিল মাসে এ অঞ্চলের সাত জন পররাষ্ট্র সচিব কলম্বোতে, অতঃপর একই সনে কাঠমুণ্ডুতে, ১৯৮২ সনে ইসলামাবাদ ও ১৯৮৩ সনে ঢাকায় এবং পরিশেষে ১৯৮৩ সনে পুনরায় কলম্বোতে মিলিত হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার একটি সহযোগিতা মূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এক প্রস্থ বিস্তারিত কর্মসূচী তৈরী করেন।[২৬]

দ্বিতীয় পর্যায়ে সাত দেশের বৈদেশিক মন্ত্রীরা প্রথমে ১৯৮৩ সনে নতুন দিল্লীতে, মিলিত হয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৮৪ সনে মালে-তে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী একত্রে মিলিত হয়ে ১৯৮৫ সনে ঢাকায় সরকার প্রধানদের একটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সনের মে মাসে থিম্পুতে পুনরায় মিলিত হয়ে শীর্ষ বৈঠকের কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করেন।

ফলে তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে, ঢাকায় সাত দেশের সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানদের শীর্ষবৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা নামের সার্ক রাষ্ট্রজোট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য, আদর্শ, কার্যক্রম নির্দেশ করে, এর পরিচালনার জন্য একটি বিধিমালা বা চার্টার গ্রহণ করা হয়।[২৭]

সার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ডিপ্লোমেটিক বা কূটনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কেননা, পূর্বে এ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেখানে দ্বি-

পাক্ষিক চুক্তির আওতাভুক্ত ছিল, সার্ক প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বহুপাক্ষিক চুক্তিমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্র তৈরী হয়।[২৮]

তদুপরি এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পারস্পরিক বিরোধ, সংঘাত ও শত্রুভাবাপন্নতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, পারস্পরিক উপকারার্থে পরস্পর সহযোগিতার আকাঙ্খা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়।[২৯]

অতএব, ডিপ্লোমেসীর দৃষ্টিতে এক 'শূন্য বিন্দু' থেকে সার্কের পদচারণা আরম্ভ হয়। অতঃপর নেতৃবৃন্দ তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও সহযোগিতার উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে শীর্ষ বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সার্ক চার্টারে প্রতি বছর ন্যূন পক্ষে একবার শীর্ষ বৈঠকের নিশ্চয়তা বিধান করেন।

তারা কয়েকটি সংকটাপন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তদারক করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন "স্টাডি গ্রুপের" প্রতিষ্ঠা করেন যাদেরকে নিজ নিজ ক্ষেত্রের অবস্থা অধ্যয়ন করে সদস্য দেশগুলির সহযোগিতামূলক কর্মসূচী তৈরী করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রগুলি প্রথমতঃ ছিল নিম্নরূপঃ

(১) সন্ত্রাস ও মাদক দ্রব্য পাচারের ক্ষেত্র;
(২) উন্নয়ণ কর্মে মেয়েদের ভূমিকা;
(৩) নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা;
(৪) বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গ্যাট (GATT) এর মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ সুবিধা নিরূপণ।

দ্বিতীয় সার্ক শীর্ষ বৈঠক ১৯৮৬ সনের নভেম্বর মাসে বাংগালোরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কাঠমুণ্ডুতে সার্কের একটি স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই শীর্ষ বৈঠক-এ এ অঞ্চলের জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে শিশুদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ পারিবারিক দারিদ্রতার কারণে শিশুদের মৃত্যুরোধ করা ও শারীরিক প্রবৃদ্ধির অন্তরায় দূর করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে বলে আশা পোষণ করা হয়।

বাংগালোর শীর্ষ বৈঠকে, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংঘটিত সর্বপ্রকার সন্ত্রাসকে সর্বোতোভাবে নিন্দনীয় বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়

তদুপরি এ অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের জন্য রেডিও ও টেলিভিশনে, আঞ্চলিক সম্প্রচার কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা, একটি দলীল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, সার্ক অধ্যাপকের চেয়ার প্রতিষ্ঠা এবং সার্ক ফেলোশীপ ও স্কলারশীপ-এর প্রবর্তন করা, একটি যুব স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচী চালুকরা ও পর্যটনে উৎসাহ প্রদানের সিদ্ধান্তও এই বৈঠকে গৃহীত হয়।[৩০]

১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে কাঠমুণ্ডুতে তৃতীয় সার্ক শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সর্বপ্রথম সার্ক অঞ্চলের সরকার প্রধানগণ যৌথভাবে সন্ত্রাস দমন কনভেনশনে এবং সার্ক অঞ্চলের আকস্মিক দুর্ভিক্ষের মোকাবেলার জন্য দুই লক্ষ টন খাদ্য সংরক্ষণের এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

তদুপরি সার্ক সেক্রেটারিয়েটের তৎপরতার মাধ্যমে ২০০০ সাল নাগাদ সদস্য রাষ্ট্রগুলির মৌলিক প্রয়োজনাদির স্বরূপ নিরূপণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের হদিস, শিল্প প্রটেকশন নীতি, আন্ত-আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা পরীক্ষা, ল্যাণ্ডলক্ড্ দেশ গুলির

পরিবহণ সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান, স্বল্পকালীন সাময়িক বাণিজ্যের অর্থযোগানের কৌশল উদ্ভাবন, বাণিজ্যের ভারসাম্য হীনতার সমস্যাদির বিবেচনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্য সেক্রেটারিয়েট পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়

১৯৮৭ সনে প্রদত্ত সার্ক সেক্রেটারিয়েটের এক বক্তব্য অনুযায়ী তখন ১৭টি যৌথ ক্ষেত্রে সার্কের প্রকল্প তৈরী হয়েছিল এবং সার্ক অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে ১৩টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়েছিল।[৩১] তা ছাড়াও শীর্ষ বৈঠক বেসরকারী সংস্থা সমূহকে দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অংগনের উন্নয়ন ক্ষেত্রে সার্ক সেক্রেটারিয়েটের সৌজন্যে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।[৩২]

১৯৮৮ সনে ইসলামাবাদে সার্ক শীর্ষবৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সার্ক আওতাভুক্ত এলাকার আঞ্চলিক পরিচিতি বা আইডেন্টিটী পরিস্ফুট করা ও আঞ্চলিক অনুভূতি সৃষ্টি করার দিকে সচেষ্ট হবার জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং সার্ক অঞ্চলের এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র থেকে দূরে সরে যাবার কারণ দূরীভূত করে ও বিবর্জন মনোভাব পরিহার করে, পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার মনস্কামনা ব্যক্ত করা হয়।[৩৩]

৬ মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সার্কের সাংগঠনিক প্রাথমিক প্রস্তাবে বাংলাদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর উদ্দেশ্যঃ 'অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক অংগনে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় উৎসাহ প্রদান' বলে উপস্থাপন করেন।[৩৪] তদনুসারে 'বাংলাদেশ ওয়ার্কিং পেপার' নামে পরিচিত সার্কের প্রতিষ্ঠা লগ্নের মূল দলিলে বলা হয়ঃ 'দক্ষিণ এশীয় দেশ সমূহের গোষ্ঠিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের প্রকৃষ্ট চত্বরে ইহা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত'।[৩৫] তদুপরি সার্কের মূল উদ্দেশ্যের সর্ব সম্মত ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, ইহা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক প্রগতি, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে এ অঞ্চলের সম্মিলিত আত্ম নির্ভরশীলতাকে জোরদার করতে এবং সদস্য রাষ্ট্র মণ্ডলীর মধ্যকার পারস্পরিক সাহায্য সহায়তা ও যুক্ত কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি করতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে নিবেদিত।[৩৬]

প্রণিধানযোগ্য যে, বিগত ২৫০ থেকে ১৫০ বছর পর্যন্ত সময়ে, তথা ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত, একশত বছর ব্যাপী, পাশ্চাত্যের উদীয়মান জাতিগুলি দক্ষিণ এশিয়ার সমগ্র ভূভাগের উপর প্রথমে অতি সন্তর্পণে, অতঃপর ছলে-বলে-কৌশলে ও পরিশেষে সামরিক শক্তির দাপটে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য কায়েম রাখে এবং তৎপরবর্তী আরো ৯০ বছর, অর্থাৎ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সাশ্রয়ে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক শোষণ নীতির দৌরাত্মে এ স্বর্গতূল্য সমৃদ্ধশালী অঞ্চলকে মর্মান্তিক ভাবে শোষণ করে একটি বিস্তীর্ণ শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত করে।

সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে যে, তাদের ভারতে আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা ইউরোপ থেকে অধিকতর স্বচ্ছল ছিল, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ইউরোপ থেকে অধিকতর উন্নত

ছিল এবং রাজনৈতিক শক্তিতে এ অঞ্চল অধিকতর বলীয়ান ছিল। তদুপরি এ অঞ্চলের সামরিক শক্তিও ইউরোপ থেকে কোন অংশে নিম্নতর ছিল না। তবে খ্রিস্টীয় আঠারো শতক থেকে ইউরোপের চত্বরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং উনিশ ও বিশ শতকের আমেরিকা সমেত পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কারিগরি কৌশল অভাবনীয় উন্নতির উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। আর একই সময়ে ভাগ্যচক্রে এশিয়া আফ্রিকার দেশ সমূহে ব্যাপক ভাবে সামাজিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটে এবং ক্ষমতাসীনদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ধ্বংস নামে, যা দেয় রোষানলের যুদ্ধ বিগ্রহে এ অঞ্চলের মহা শক্তিধর সমর শক্তি তছনছ হয়ে যায়। বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীদের নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উচ্চ প্রযুক্তির উদ্ভাবনের বদৌলতে তাদের পার্থিব উন্নতি স্মরণাতীত কাল থেকে এ পর্যন্ত মানব সভ্যতার সমগ্র ব্যবহারিক উন্নতিকে অতিক্রম করে এবং ছড়িয়ে যায়। ফলতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বলে, তারা সমগ্র বিশ্বকে হাতের মুঠায় কুক্ষিগত করতে সমর্থ হয়। অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে এহেন অভাবনীয় আধুনিক সভ্যতার গরিমাসক্ত পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ তুলনামূলক ভাবে তাদের চেয়ে অধিকতর সভ্য এশিয়া-আফ্রিকার জনগোষ্ঠিকে মহাশক্তিবলে নিদারুণ ভাবে শোষণ করে অস্থি-মজ্জা-সারে পরিনত করে। আধুনিক পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ বাদের এই হৃদয়হীন শোষণনীতির দাপট দক্ষিণ এশিয়ার এ স্বর্গতুল্য হিমালয়ান অঞ্চলের উপর সর্বাধিক বল-বিক্রমে আপতিত।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতামত্ত পাশ্চাত্যের বিশ্ব-অভিভাবকেরা দুনিয়াকে একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট সভ্যতার বাজারে পরিণত করেছে। মানুষের নৈতিকতাকে, অর্থনীতি দিয়ে রদ বদল করে বসেছে এবং শেষ মেষ দুনিয়ার গতি-প্রগতির স্রোতকে বাজার অর্থনীতির খাতে প্রবাহিত করে ছেড়েছে। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সভ্যতার দুরাচার দাপট বর্তমান কালেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় সন্তর্পণে প্রচারিত হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের আসল স্বার্থ এখনও এশিয়া-আফ্রিকার জলস্থলে নিহিত রয়েছে, যা সংরক্ষণের দায়িত্ব এখন ন্যাটো শক্তিজোটের উপর ন্যস্ত হতে চলেছে।

অধিকন্তু পাশ্চাত্যের সর্বগ্রাসী আধুনিক সওদাগরী পুঁজিবাদের বা commercial capitalism এর অন্তর্দ্বন্দ্বের মহা-বিস্ফোরণ জনিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আহুতি স্বরূপ পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে এশিয়া আফ্রিকার শতাধিক দেশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছে। এদেরকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের উত্তর সূরী হিসাবে পোষণ করার জন্য তারা সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সমতা ভিত্তিক ভোটাধিকারের আদলে বিশ্ব জাতিসংঘ গঠন করে এবং জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় ভেটো পাওয়ারের শক্তিধর নিরাপত্তা পরিষদ বা সেকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করে, যাতে নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ সব রাষ্ট্রগুলির, পূর্ববর্তী সুসভ্য সমৃদ্ধশালী মহান ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন করতে না পারে এবং তাদের লেজুর হয়ে বসবাস করতে স্বতস্ফুর্ত ভাবে অভ্যস্ত হয়।

তদুপরি তারা এ সব নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র সমূহকে রাজনৈতিক ছাড় দিলেও বৈদেশিক ঋণ সাহায্য ও সমাজ সেবা কর্মসূচীর আবর্তে, তাদেরকে, ব্যাংকিং কারবার, কারেন্সী নিয়ন্ত্রণ, টেরিফ আরোপ, ও পাশ্চাত্যের বাজারে এদেশগুলির রপ্তানী কোটা নির্ধারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের জালে আটকিয়ে রাখে।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুঞ্জন উঠেছে।ঃ এশিয়া বর্তমানে গণতন্ত্রের একটি নিজস্ব সংজ্ঞা নির্ধারণে চেষ্টিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, এশিয়ার মানুষ মানবাধিকার, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কেও পৃথক একটি অভিমত তুলে ধরতে আগ্রহী। বিশেষতঃ চীন, জাপান, সিংগাপুর ইত্যাদি প্রাচ্যদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোপন রহস্যটি আয়ত্তে আনার পর এখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগুতে চাইছে। এশিয়ার আবহমান কালের ঐতিহ্য হচ্ছে সমষ্টিবাদ, পারিবারিক বন্ধন, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কতকক্ষেত্রে ভাববাদী চিন্তাধারার কাছে আত্মসমর্পন। এশিয়ার এ সংস্কৃতি পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।[৩৭]

'গ্রীক রোমান সভ্যতা ও খৃষ্টীয় মতবাদের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে ইউরোপের আজকের ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে রূপ পেয়েছে। আমাদের পৃথক সমাজ বৈশিষ্টের জন্যেই ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যবাদের উগ্র রূপটি এখানে সংগতিপূর্ণ নয়।'

আমাদের সমাজে ঐক্যের দিকটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর ঐক্যের মূল উপাদানটি হচ্ছে সমষ্টিবাদ।

পশ্চিমা জৌলুস দেখে চোখ ধাঁধায় ঠিকই, তবে তার ভেতরে কোন প্রাণ নেই।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নামে তারা সমস্ত মূল্যবোধ জলাঞ্জলী দিচ্ছে। প্রাচ্যের ধারণায় মূল্যবোধই হলো জীবনে মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। মূল্যবোধ না থাকলে মানুষ আর মানুষ থাকে না।[৩৮]

সার্কের উপরোক্ত মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে উৎসাহ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এর প্রথমটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে ইংগিত করে, দ্বিতীয়টি আদর্শের দিকে আংগুলি নির্দেশ করে ও তৃতীয়টি সম্মিলিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।তাই উপরে উল্লেখিত পূবর্তন সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্যের মহা শক্তিবর্গের আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভংগি ও সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রাচ্যের জাতি সমূহের অর্থনৈতিক ও আদর্শিক অভিলাষের পরিপ্রেক্ষিতে, মূল্যবোধের বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

৭ মূল্যবোধঃ প্রাচ্যে ও প্রতিচ্যে

মূল্যবোধ সম্পর্কিত উপরোক্ত বক্তব্যগুলির সারকথা হলঃ পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের উৎস মুখ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে নিহিত ও প্রাচ্যের মূল্যবোধের উৎস মুখ সমষ্টিবাদে নিহিত। কথাটিকে ইংরেজী করলেঃ Individualism versus Collectivism- এ দাঁড়ায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশ্বদর্শনের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে, কথাটি একটু বেখাপ্পা ঠেকে। আসলে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর ভিত্তি করা এবং মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদ (আসলে তাও পাশ্চাত্যের ভাবদর্শন) সমষ্টিকতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্যনীয় যে পাশ্চাত্যের সমষ্টিবাদও প্রকারান্তরে ব্যক্তিবাদের সমষ্টিকতা। কেননা, পাশ্চাত্যে প্রাচ্যর সমতুল্য সামাজিক ব্যবস্থা বহুপূর্বে বিলীন হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ রোমান সাম্রাজ্যে, সমাজের বদলে সরকার প্রদত্ত নাগরিকতার প্রভাবে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস মুখে প্রবেশ করে এবং আধূনিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনের হাওয়া সমাজকে ভেঙ্গে চুরে, মানুষের জীবন ধারাকে ব্যক্তি স্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থের মুখামুখি দাঁড় করায়।[৩৯]

পক্ষান্তরে প্রাচ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তি স্বার্থের আদলে আত্ম-স্বার্থ বা স্বার্থপরতা রূপে চিহ্নিত এবং এর মুখামুখি, নিছক বহু ব্যক্তি-এককের সামষ্টিক স্বার্থ নয়, বরং বিশ্বজনীন ধরণের সমাজ, সামাজিক কল্যাণ, সামাজিকতাবোধ ইত্যাদিকে মূল্যবোধ নামে অনুধাবন করা হয়। তাই প্রাচ্যে স্বার্থ ও মূল্যবোধ পরস্পর মুখামুখিঃ 'স্বার্থ বনাম মূল্যবোধ' রূপে সুপরিচিত।

সুতরাং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মূল্যবোধের উৎসমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বনাম সামষ্টিকতাবাদ এর সূত্রটি পরিশোধন করে বলা যায়- পাশ্চাত্য প্রাচ্যের মূল্যবোধের প্রকৃত পার্থক্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সামাজিকতা বোধে নিহিত। কেননা, প্রতীচ্যে যেখানে বর্তমান যুগে প্রাচীন সমাজের লেশমাত্র চিহ্ন কোথায়ও বিদ্যমান নাই, সেখানে প্রাচ্যের লোকেরা গ্রাম, গঞ্জ, দিহাত, কামপং ইত্যাদি গ্রামীণ সমাজে বসবাস করে, যেগুলি আকার-আকৃতিতে সামাল যোগ্য, চলনসই, ছোট খাট হলেও, সভ্যতা -বভ্যতা, আদব-কায়দা, চাল-চলন ও আদর্শ-উদ্দেশ্য, সার্বজনীন, তথা বিশ্ব জনীনতার কল্যাণকর মূল্যবোধ-উদ্বুদ্ধ। আদতে প্রাচ্যে এ কারণে ক্ষুদ্র সমাজকে বিশ্বসমাজের একক হিসাবে নয়, বরং বিশ্বসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে গণ্য করা হয়। কেননা, প্রাচ্যে মূল্যবোধের উৎস মূলে রয়েছে বিবেক ও বিশ্বজনীন কল্যাণবোধ।

এক কথায়, প্রাচ্যের হাজার হাজার বছরের সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে অনুধাবন করা হয়ঃ আত্মার অভিব্যক্তি বিবেক, আর বিবেকের যুক্তি ও বিচার মুলে আদর্শ। এই আদর্শই হল প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের উৎস মূল, আর মূল্যবোধ হল এই আদর্শের উৎস মূল থেকে উৎসারিত মানবিক জীবন ধারার উৎসমুখ।

কাজেই প্রাচ্যের জনগোষ্ঠী যেখানে বিবেকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা বলছে, সেখানে পাশ্চাত্যের জনগোষ্ঠী নিছক অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির মানসিক চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, অধিক সংখ্যক মানুষের জীবনকে পারতপক্ষে অধিকতর সুখময় করার উদ্দেশ্যে, সুন্দর সুন্দর মতবাদের কথা বলছে এবং মতবাদের আদলে মানবতাবাদী মূল্যবোধের বুলি আওড়াচ্ছে। আদতে আদর্শিক মানবিক মূল্যবোধ সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন, যার বাস্তব অভিব্যক্তি মানবতাবোধ। আর উদ্দেশ্যিক মূল্যবোধের উৎসমূল- অর্থনৈতিক ও গাণিতিক, যার বাস্তব অভিব্যক্তি-মানবতাবাদ। সার্কের ১৯৮৮ সালের "ইতিহাস সম্মেলনে" আমরা দক্ষিণ-এশিয়ার আদর্শিক ঐতিহ্যের মূল্যবোধের বিশেষণ করে দেখিয়েছি যে, এ অঞ্চলের গণমানস মানবতাবোধের মূল্যবোধের উপর হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত এবং এ মানবতাবোধই এ অঞ্চলের সর্বস্তরের জনগনকে মানবিক উন্নতি ও সম্পদ উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক অনুপ্রাণিত ও একতাবদ্ধ করতে পারে।[৪০]

এর পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশার দিকে নির্দেশ করে বলা যায় যে, ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দক্ষিণ-এশিয়ার মহান বৈদিক, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মই বহুলাংশে মানবিক মূল্যবোধের মৌলিক অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টান্ত মূলক অনুশীলনী সরবরাহ করেছিল এবং এ অঞ্চলে এখনও এ ব্যাপারে তাদের সাথে একাত্মবোধের ভাবধারা বিরাজ করছে।[৪১]

৮ পর্যালোচনা

পর্যালোচনার দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম লক্ষ্যনীয় যে, সার্ক একটি আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্থা। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমেসী বা কুটনীতি বা কৌশলনীতির ঔরসে এর জন্ম ও একাধিক জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবননীতির ক্ষেত্রে এর কার্যকর অবস্থিতি। অতএব, সদস্য রাষ্ট্রগুলির জাতীয় রাজনীতির পরিসরে অধিকতর প্রশস্ততা সৃষ্টি, ক্রমান্বয়ে পারস্পরিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং জনজীবনের উন্নতি ও আঞ্চলিক সম্পদের উন্নয়ন কার্যে অধিকতর চলমানতা সৃষ্টি করাই সার্কের ফাংশন বা কার্যক্রম হওয়া বাঞ্চনীয়।

এদিক থেকে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মহলে গুঞ্জন শোনা গেছে যে, (ক) বিগত এক দশকে সার্কের অগ্রগতি এতই মন্থর পদক্ষেপে পরিচালিত হয়েছে যে, প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন উদগত বিভিন্ন জাতীয় সংকটের তোড়ে ও একের পর এক উদ্ভূত আন্তর্জাতিক ঘূর্ণিপাকের বানভাসিতে সার্কের কার্যক্রম, এর আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবিলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে পেছনে তলিয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে, (খ) এসিয়ান ও ই.ই.সি. প্রভৃতি অন্যান্য আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক সংস্থার ব্যতিক্রমে, সার্ককে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রগুলিতে সম্প্রসারণের পরিবর্তে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে, প্রশাসনিক কুটকৌশলের আবর্তে জাতীয় রাজনীতিকে সার্কের আঞ্চলিক স্তরে সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে, (গ) কোন কোন গুরুত্বপুর্ণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বহুপাক্ষিক সমস্যাকে কেটে-ছেঁটে দ্বি-পাক্ষিক প্রতীয়মান করে সার্কের আওতা বহির্ভুত করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে (ঘ) বহুক্ষেত্রে পারস্পরিক সৌহার্দ্য গড়েতোলা ও সন্ত্রাস দমনে সার্কের সহায়তা ও সহযোগিতা করার আহবানকে জলাঞ্জলী দিয়ে, দ্বি-পাক্ষিক সন্ত্রাসী ও বিদ্রোহাত্মক সমস্যাগুলি বজায় রাখার কুটনৈতিক লক্ষ্যে, ভিনদেশী সন্ত্রাসী ও বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় গোপন মদদ যোগানো হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া-আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহকে একতাবদ্ধ করার জন্য ১৯৫৫ সালের বাণ্ডুং সম্মেলনে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা সম্প্রসারণের চত্বরে, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকারে পঞ্চনীতি ভিত্তিক এশিয়া-আফ্রিকার ঐক্যের ডাক দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে চার মহান নেতা নাসের, নক্রোমা, সুকর্ণ ও নেহরুর, পরাশক্তির সমান্তরাল স্বৈরাচারী আধিপত্যবাদী তৎপরতা, গণ-ঐক্যতানে ফাটল ধরায় এবং লীগ অব নেশন ও আরবলীগের মত তা একটি নিছক জনপ্রিয় সম্মেলনী প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। সার্ক যাতে এরূপ দশাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ লক্ষ্যণীয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতালগ্নে, এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃটিশ সরকার গুটিয়ে নিয়ে যায় এবং উপমহাদেশের প্রশাসন যন্ত্রকে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তানের ইংরেজী শিক্ষিতদের নেতৃত্বের আবর্তে ও বৃটিশ প্রশিক্ষিত চাকুরীজীবীদের হাতে ন্যাস্ত করে যায়। আর এ যাবত মানব জীবন রক্ষা ও মানব জীবনোন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত জীবন নীতি,তথা একটি জনকল্যাণকর সুষ্ঠু নীতিগত ডিপ্লোমেসী-কাম-পলিটিক্স, অর্থাৎ সংযুক্ত কল্যাণকর শাসন-প্রশাসনের অলীক পাখী, এখনও এ অঞ্চলের জনগণের হাতে ফিরে আসেনি। না এ অঞ্চলের জ্ঞানীগুণীরা বিদ্যা ও জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছে, না শাসক-

প্রশাসকেরা শাসন নীতি ও প্রশাসন নীতির সম্পর্ক নির্ধারণ করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। ফলে, একটি সেক্রেটারিয়েট-কেন্দ্রিক আমলাতান্ত্রিক কুটকৌশলী রাজনীতি এ অঞ্চলে পরিচালিত হচ্ছে। সার্ক যাতে অনুরূপ একটি আমলাতান্ত্রিক কূটনীতিগ্রস্ত না হয়, এ অঞ্চলের রাজনীতিবিদদের সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং সার্কের অস্তিত্বের যুক্তি যার সাথে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত, তা হলঃ এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ ও মাধ্যম খুজে বের করা। এগুলির মধ্যে রয়েছে (ক) শ্রীলংকার তামিল সমস্যা, (খ) বাংলাদেশের পানি সমস্যা, (গ) নেপালের ট্রানজিট সমস্যা, (ঘ) ভূটান ও মালদ্বীপের নিরাপত্তা সমস্যা, (ঙ) পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার কাশ্মীর সমস্যা। এ সমস্যাগুলি বিদ্যমান থাকলে এ অঞ্চলের যুক্তিসংগত ও সুষম উন্নয়ন মূলতই অসম্ভব। সার্ক যদি এ গুলির কোনটিরই সমাধান করতে না পারে, তবে সার্কের অবস্থা কুমির ছানাবৎ হবে, এ অঞ্চলের গণ অর্থনীতিতে বা গণ মানসে সার্ক কোন দাগ কাটবে না। তাই দ্বি-পাক্ষিক বনাম বহু পাক্ষিক ইলিটিজম বা বুরজুয়াজী ভকিঝকি, তথা ভদ্রলোকামী কথায়, এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিরা ভিজবে না। এদিকে, মন দিয়ে, চিন্তা ভাবনা না করলে, অচিরেই সার্ক একটি ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হবার আশংকা মুক্ত হবে না।

পঞ্চমতঃ এ অঞ্চলের ইংরেজী-শিক্ষিত আধুনিকমনা রাজনীতিকেরা ইংরেজী পাঠ্যবই থেকে যে উদ্দেশ্যমূলক ডেফিনেশন বা সংজ্ঞায়ন সর্বস্ব নীতিমালা বা নীতিকথার যে বিদ্যাসংগ্রহ করেছেন, তা এ অঞ্চলের গণ-মানসের আদর্শিক নীতির মানদণ্ডে অচল। কেননা, ন্যায় ও নৈতিকতা থেকে নীতির উদ্ভব। তাই অন্যায়ের ভিতে Principle তৈরী করা গেলেও নীতির জন্ম হয় না। অতএব, এ অঞ্চলের ভদ্র-মানস ও গণ-মানসের বাস্তবতা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমার মনে হয় যে, সার্ককে গণ-মুখী করার জন্য বৃটিশ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণলব্ধ ভদ্রলোকীয় মানসকে[৪২] যথা শিগগির আঞ্চলিক গণ-মানসে রূপায়িত করে, এ অঞ্চলের স্বাধীনতাকে বিবেকসম্মত, অর্থবহ ও কল্যাণকর করা বাঞ্ছনীয়।[৪৩]

ষষ্ঠতঃ স্বাধীনতা লগ্নের ১৯৪৭ খৃঃ থেকে ভারত, অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎসাহ ও সহযোগিতায় একটি বৃহৎ শক্তি বা পরাশক্তি হবার আকাংখা ও স্বপ্নে নিমগ্ন ছিল[৪৪] এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলিকে কৌটিল্য নীতির মাধ্যমে জবর দখল বা পদানত করার উন্মত্ততায় মেতে উঠে ছিল। সম্ভবতঃ বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সে কংগ্রেস পন্থী গানঃ

বল বল বল সবে শত বীণা বেনু রবে,
ভারত আবার বিশ্ব সভার শ্রেষ্ঠ আসন লভে।

এবং খণ্ডিত ভারতকে পুনঃ অখণ্ডিত করার স্বপ্নিল অভিলাষ, পণ্ডিত নেহরুকে ছোট প্রতিবেশীদের মেরে ধরে পোষণ করার বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে ইদানিং শ্রীলংকায় অস্তিত্ব বিপন্নকারী গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়[৪৫] এবং বাংলাদেশে শান্তি বাহিনীর উৎপাত বৃদ্ধি পায়।[৪৬]

অতএব, ভদ্রলোকীয় শ্রেণীস্বার্থ পরিত্যাগ করে, সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলির গণ-স্বার্থের আদলে পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করাই সার্কের অগ্রগতির জন্য বাঞ্ছনীয় হবে।[৪৭] পররাষ্ট্রে বিদ্রোহের ইন্ধন না যোগানো, পররাষ্ট্রে বিদ্রোহীদের টাকা পয়সা ও অস্ত্র শস্ত্র

এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে মদদ না করা ও সন্ত্রাস দমনে পারস্পরিক সহযোগিতা করা, সার্কের গৃহীত ও স্বীকৃত নীতি। ঈমানদারীর সাথে এ নীতিসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ পালন করলে সার্কের কাংখিত লক্ষ্য অর্জন করা সহজ সাধ্য হবে।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক রাজনীতি আতুর ঘরে জন্মপ্রাপ্ত সার্কের অবস্থান অবশ্যই রাজনৈতিক কৌশলনীতি, ডিপ্লোমেসী বা কুটনীতির চত্বরে আবর্তিত হতে হবে। ইহা নিছক জাতীয় রাষ্ট্রনীতি, বা প্রশাসনিক সেক্রেটারিয়েল নীতির আবর্তে ঘূর্ণায়মান হলে, ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। তবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির জাতীয় রাষ্ট্রনীতি, সেক্রেটারিয়েল নিয়ম-পদ্ধতি, এমনকি সদস্য রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ দলীয় রণরীতিও সার্কের কর্মকাণ্ডে সহায়ক শক্তি বা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবার দাবী রাখে। এরূপ সহায়ক কাজ আনজাম দেবার জন্য সার্ক সেক্রেটারিয়েট এর প্রতিষ্ঠা সময়োপযোগী ও কার্যকর হয়েছে।

উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সার্ক অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের আকার আকৃতি, কথা-বার্তা, চাল-চলন সবই বৈসাদৃশ্য পূর্ণ; একমাত্র মানবতাবোধেই তাদের একাত্মতা খুজে পাওয়া যায় এবং মহান ধর্মগুলি কর্তৃক প্রচারিত বিবেকভিত্তিক মানবতাবোধই এ অঞ্চলের মহত্তম বৈশিষ্ট, যা বহুলাংশে এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দুরপ্রাচ্যে সম্প্রচারিত হয়েছে। আর এ মানবতাবোধই, পাশ্চাত্যের মতবাদভিত্তিক মানবতাবাদের মুখামুখি তুলনায়,এ অঞ্চলকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে।

দ্বিতীয়তঃ বৈচিত্রময় মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর স্বর্গতুল্য এ অঞ্চলকে, দারিদ্রতার গ্লানি, মূর্খতার অন্ধত্ব ও রোগাক্রান্তের জ্বরা থেকে মুক্ত করে পরস্পর সহযোগিতার আদলে মানবিক উন্নতি ও সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে, বাস্তব স্বর্গে পরিণত করার লক্ষ্যে, যদি এতদঞ্চলের রকমারী জনগোষ্ঠির মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করতে হয়, তবে সার্কের বিঘোষিত স্পিরিট বা চৈতন্যকে অবলম্বন করার পথই হবে এ অঞ্চলের জনগণের পথিকৃত। একমাত্র সার্কের চৈতন্যের আদলেই এ অঞ্চলের সাত জাতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচিতির অনুপ্রেরণা, এ অঞ্চলের অলস জনশক্তিকে সক্রিয় মহাশক্তিতে পরিবর্তিত করতে পারে এবং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

তৃতীয়তঃ সার্কের চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ মননশীলতা, এ অঞ্চলের বর্তমানে প্রচলিত অন্ধত্বব্যঞ্জক ও মারাত্মক শ্রেণী-সংঘাতপূর্ণ প্রশাসনিক অন্তর্মূখিন কুটনীতিকে, বহির্মূখী সত্যিকারের রাজনৈতিক কল্যাণকর কৌশল নীতিকে পরিবর্তিত করতে পারে। এ অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের কর্মোদ্যমকে দক্ষতার মাধ্যমে গ্যাল্‌ভেনাইজ করার এটাই একমাত্র মহাসম্ভাবনাময় উপায় ও অহিংসার পথ।

অতএব, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এতদঞ্চলে কৌটিল্য নীতি ও ম্যাকিয়াভেলিয়ান নীতির ছলে-বলে-কৌশলের রণনীতিকে রাজনীতিতে রূপায়িত করার অসাধ্য-সাধনের কুটনৈতিক অধ্যবসায় পরিহার করে, সার্কের কল্যাণকর মানবতাবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, এ স্বর্গতূল্য হিমালয়ান অঞ্চলকে উন্নতি ও উন্নয়নের পথে পরিচালিত করার মধ্যেই এ অঞ্চলের বৃহত্তর মানবিক উৎকর্ষ সাধনের মহামন্ত্র নিহিত।

নির্দেশিকা

১। *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ৯ই কার্তিক, ১৩৯৯ বাংলা সন, পৃঃ ১০ঃ কাজী শামসুল ইসলাম, "ষষ্ঠ সাফ গেমস্ ও প্রাসংগিক কিছু কথা"।

২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ (a) L. Dudley Stamp: *Asia. A Regional and Economic Geography*. London, 11th edn. 1962, pp. 188 ff. and 365 ff. for India, Pakistan and Ceylon; (b) O.H.K. Spate: *India and Pakistan* London, 1964; and (c) C. Mazwell Lefroy: *The Land and People of Ceylon*. London, 1964, chap. VIII, pp. 56ff. about the people.

৩। উপরে উল্লেখিত নির্দেশিকা গুলি দ্রষ্টব্য। আরো দেখুনঃ (a) O.H.K. Spate and A.T.A. Learmonth: *India and Pakistan, A General and Regional Geography*, 2nd edn. 1967; (b) L. Dudley Stamp: *India, Pakistan, Ceylon and Burma*. London, 1960.

৪। C.L. White and G.T. Renner: *Human Geography. An Ecological Study of Society*. New York. 1948, chap. 41: "The Region as a Geographical Unit" pp. 639 ff.

৫। Abul Ahsan : *S A A R C: A Perspective*. Dhaka, University Press Limited, 1992, p. 271.

৬। দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত।

৭। (a) Abul Ahsan: *SAARC, op. cit.* 25 ff. 65 ff. 74 ff. 83 ff. (b) M.L. Rahman ed.: *SAARC. Facts and Economic Development*. Dhaka, SAARC Association, 1986,: see "The Dhaka Declaration".

৮। *Ibid.*, also Atiur Rahman: *Politaical Economy of SAARC*. Dhaka, 1985, p. 71.

৯। ইংলিস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ভাষ্যেঃ "piece the foxes skin to the lion", cf. Madras letter to Trevisa, 29 August 1660, p. 393, quoted by Professor M. Mohar Ali: *History of the Muslims of Bengal, Vol. IA: Muslim Rule in Bengal*. Riyadh, 1985, p. 395.

১০। যাকে ইংরেজীতে বলে "Stick and Banana policy", যেমনটি বৈদেশিক ঋণ ও ক্ষেপনাস্ত্রের প্রচলিত বিশ্বব্যাপী প্রলোভন ও ধমক প্রদানের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্যের শক্তি বর্গের খেলায়, বর্তমানে প্রকট ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে।

১১। ইন্দোনেশিয়ার মরহুম রাষ্ট্রপতি সোকর্ণো নবউপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সোচ্চার ছিলেন এবং তাঁর রচিত "পঞ্চ শিলায়ঃ তা সংযোজন করেছিলেন।

১২। "আধিপত্যবাদ" কথাটি বর্তমান যুগে চীনের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মাও সে তুং পাশ্চাত্যের কুটকৌশলের বিরুদ্ধে প্রচলিত ও জনপ্রিয় করে তুলেন।

১৩। Gabriel A. Almond and James S. Coleman ed.: *The Politics of the Developing Areas*. Princeton, N.J., 1960, p. 153: "The Politics of South Asia", by Myron Weiner.

১৪। (a) For a case study see: present writer's book: *Muslim Struggle for Freedom in Bengal*, 2nd edn. Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1980, chap. 1: "Socio-economic conditions of the Muslims of Bengal; (b) A. R.

Mallick: *British Policy and the Muslims in Bengal. 1757-1856*, Dhaka, 1961; (c) Present writer's article: "Economic conditions of the Muslims of Bengal under the East India Company, 1757-1860," *Islamic Studies*, Islamabad, Pakistan, Vol. VI, No. 3, Sept. 1967, pp. 277-88. (d) K.K. Aziz: *The British in India, a study in imperialism*, Islamabad, 1975.

১৫। Present writer's article: "In search of Unity in the Tradition of the SAARC countries", *Pakistan Journal of History and Culture*, Islamabad, Vol. IX, No. 1, Jan-June, 1988, pp. 53-64.

১৬। See "Charter of the South Asian Association for Regional Co-operation" in Abul Ahsan: *SAARC: A Prespective*, 1992, pp. 55-60.

১৭। "The Primacy of the Political Strategy: South Asian Regional Cooperation (SAARC) in Comparative Perspective", in Atiur Rahman: *Political Economy of SAARC*, Dhaka, 1985, chap. 2, pp. 8-13, "Precondition for Regional Cooperation".

১৮। Abul Ahsan: *SAARC, op. cit.* p. 59.

১৯। *Ibid.*, p. 271.

২০। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রসিদ্ধ উক্তিঃ "Time is the greatest healer".

২১। যেমন ইদানিং ভারতের মৌলবাদী বি.জে.পি.-র করসেবক শিবসেনাদের দ্বারা ভারতের বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে গেছে।

২২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব যুগে বৃটিশ সরকার ইউরোপে অন্যান্য শক্তির সাথে একজোট না হয়ে একলা চলার নীতি অবলম্বন করেছিল। ইদানিং ই.ই.সি.-তে প্রবেশ করার কারণে তা বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছে, যদিও সময় সময়ে তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়।

২৩। কৌটিল্যের প্রসিদ্ধ "অর্থ শাস্ত্রে" বৈদেশিক নীতির প্রেক্ষিতে তিনি রাজাকে "তোষণ এবং পোষণের" উপদেশ দিয়েছেন; অর্থাৎ নিজের থেকে অধিক শক্তিশালীকে উপঢৌকনের মাধ্যমে তোষন করা ও কম শক্তিশালীকে দণ্ড, তথা মেরে ধরে বা ধমক, আক্রমণ ইত্যাদির দ্বারা পোষণ করার কথা বলেছেন।

২৪। প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী রচিত *The Prince* গ্রন্থে তিনি বলেনঃ রাজাকে সিংহের মত সাহসী হতে হবে এবং শিয়ালের মত ধূর্ত হতে হবে।

২৫। উপরে ১০ নং দ্রষ্টব্য।

২৬। Abul Ahsan: *op cit.* p. 222.

২৭। ঐ, পৃঃ ২২২-২৩।

২৮। ঐ

২৯। ঐ

৩০। ঐ, পৃঃ ২২৩-২৪।

৩১। ঐ, পৃঃ ১৩৩।

৩২। *ঐ*, পৃঃ ২২৪-২৬।
৩৩। *ঐ*, পৃঃ ২৩২ সম্মুখে।
৩৪। *ঐ*, পৃঃ ২৬৪।
৩৫। *ঐ*, পৃঃ ২৬৫, ধারা ৩।
৩৬। *ঐ*, পৃঃ ২৬৫-৬৬।
৩৭। *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ বাংলা সন, পৃঃ৩।
৩৮। *ঐ*।
৩৯। মুঈনুদ্দীন আহমদ খানঃ *রাষ্ট্রদর্শন শাস্ত্রে মুসলিম অবদান, প্রথম খণ্ড, মুকাদ্দমা-উপক্রমণিকা*, ঢাকা, ১৯৭৭ খৃঃ, পৃঃ ২৩।
৪০। Muin-ud-Din Ahmad Khan: "In Search of Unity in the Tradition of the SAARC Countries. *"Pakistan Journal of History and Culture*, Islamabad, Pakistan, Vol. IX, No. 1, Jan-June, 1988, pp. 53-64.
এবং প্রবন্ধঃ "অধুনা নৈতিক সংকট ও বাংলাদেশ" *ইসলামী ঐতিহ্য*, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম, জুন, ১৯৮৫, পৃঃ ২৪-৩২।
৪১। উপরে দ্রষ্টব্য।
৪২। J.H. Broomfield: *Elite Conflict in a Prural Society: Twentieth Century Bengal*, University of California Press, Berkeley, 1968, pp. 1-41: Introduction, Part 1: "Bengal and the Bhadralok", Part II: "The Bhadralok and the British".
৪৩। *প্রাগুক্ত*, ৪০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
৪৪। *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১১ শ্রাবণ ১৪০০ বা, সন, ২৬ জুলাই, ১৯৯৩, পৃঃ ৭, সম্পাদকীয় প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য।
৪৫। *Daily, the Morning Sun*, Dhaka, 28 April, 1993, pp. 5-6.
৪৬। *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা ৪ শ্রাবণ ১৪০০ বাংলা সন, ১৯ জুলাই, ১৯৯৩, পৃঃ ৭, সম্পাদকীয় প্রচ্ছদ, এবং ঐ, ২০ জুলাই, ১৯৯৩, পৃঃ ৭, সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।
৪৭। *ঐ*, ২০ জুলাই, ১৯৯৩, পৃঃ ১০ঃ "চাণক্য নীতি এবং"- আবু সালেক, দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র

এম, জয়নুল আবেদীন

সূচনা

মানুষ সামাজিক জীব। যে পরিবেশেই থাকুক না কেন সে সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে ভালবাসে। এই সমাজের রীতি নীতির ও আচার আচরণের আবর্তে আবর্তিত হয় তার চলন, বলন, রুজি, রোজগার, সুখ, শান্তি, বিচার, বিবেচনা ও রাজনীতির মাপকাঠি। সমাজের এই রীতি নীতি এবং আচার আচরণ কিন্তু একদিনে বা একটা বিশেষ সময়ের ব্যবধানে গড়ে ওঠেনা। যুগ যুগ ধরে কোন একটি জনগোষ্ঠি যে সভ্যতা লালন করে চলে তা দিয়ে গড়ে ওঠে ঐ জনগোষ্ঠির সমাজ জীবন। প্রফেসর এফ, আর খান সত্যি বলেছেন, "মানুষের সাধারণ জীবন ধারা এবং সামাজিক সংগঠন ও আচার রীতির বিবর্তন রক্ষণ ও বংশ পরম্পরায় উহার উত্তরাধিকারিত্ব এবং স্বয়ং মানুষ সম্পর্কেই সমাজ ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকে। — প্রতি জন সমাজের অগ্রগতির পটভূমিতে উহার পূর্ববর্তী সকল জন সমাজের জীবন অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটে।"[১]

কোন জনগোষ্ঠির সমাজ জীবন কতটা ব্যাপৃত, কি কি বিষয় এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলেন, "মানুষের সামগ্রিক জীবন সমাজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানুষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রমোদ জনিত ও ধর্মীয় জীবনের সকল দিকই সমাজ ইতিহাসের আওতায় পড়ে।"[২] এ থেকে বুঝা যায় যে অসংখ্য কর্ম স্রোতের মাঝে মানুষের যে জীবন-চিত্র ফুটে ওঠে তাই তার সমাজ জীবনের আলোচ্য বিষয়।

এবার চলে আসা যাক প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের আলোচনায়। এ আলোচনা সুকঠিন ও দুরূহ। কারণ এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য বা সংবাদ আমাদের জানা নেই। রাজশাহীর 'পাহাড়পুর' বগুড়ার 'মহাস্থান', কুমিল্লার 'ময়নামতি' বিহারের 'নালান্দা' ও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এবং পুরাতন ধর্মগ্রন্থ, পুঁথি-পুস্তক, পর্যটকগণের বিবরণ, পন্ডিতগণের গবেষণার ফসল, বিভিন্ন কাব্য, লোকগাঁথা, লোকাচার ও প্রত্নতাত্বিক গবেষণার ফলাফল থেকে যে সব খবর পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে আমরা প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের একটি মোটামুটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।[৩]

প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন বাংলা আজকের বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বড় ছিল। বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকলেও ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত বন্ধনে বাংলার বিভিন্ন জনপদ একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় "প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ (অথবা

ব্রহ্মা), তাম্রলিপি, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল।"[৪] প্রাচীন নরপতিগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথমে বাংলার বিভিন্ন জনপদকে রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় অনেকাংশে স্বার্থকতা অর্জন করেছিলেন। এ প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে পুর্ণাঙ্গতা দিয়েছিলেন ৮ম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল ও সেন বংশীয় রাজাগণ। এ সময়ে কেবল মাত্র বঙ্গ ছাড়া অন্যান্য এলাকা-গুলো গৌড়রাজ্যের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে লাগল। কিন্তু "বঙ্গ" তখনও তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল। দক্ষিণ পূর্ব বাংলা বিভিন্ন সময়ের বঙ্গাল, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট ইত্যাদি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, আবার কোন কোন সময়ে এ গুলো একই রাজ্যের আওতায় স্থানীয় নাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে ছিল। উত্তর বঙ্গ অঞ্চল 'বরেন্দ্রভূমি' নামেও পরিচিত ছিল। বর্তমানের "মহাস্থান" (অতীতের পুণ্ড্রনগর) আসলে প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। গৌড় নামের ছত্র ছায়ায় বাংলার সকল জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রয়াস শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজাগণ করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থক করতে তাঁরা পারেননি। মধ্যযুগের মুসলিম স্বাধীন সুলতানগণ ঐক্যবদ্ধ বাংলার পূর্ণতাদান করলেন এবং সম্রাট আকবর এ অঞ্চল অধিকার করার পর সমগ্র বাংলা দেশের নাম রাখলেন 'সুবা বাংলা', যদিও 'সুবা বাংলা' আজকের 'বাংলাদেশ' ও 'পশ্চিমবঙ্গের' চেয়ে বড় ছিল। ইংরেজরা পর্তূগীজদের দেয়া "বাঙালা" অনুসরনে এর নাম রেখেছিলেন, "বেঙ্গল"।

সীমানা

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ মিলিয়ে যে প্রাচীন বাংলা তার উত্তর সীমায় সিকিম, হিমালয় কিরীট কাঞ্চন জঙ্ঘার তুষারময় শিখর, তার নিম্ন উপত্যকায় বাংলার উত্তর প্রান্তের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা। এই দুই জেলার পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভূটান রাজ্যসীমা। দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম, আরকানের শৈলমালা ও বঙ্গোপসাগর। পশ্চিম সীমানা প্রাচীন ও মধ্যযুগে দক্ষিণে গঙ্গার তীর বরাবর বর্তমান দ্বারভাঙ্গা (দ্বারবঙ্গ) জেলার পশ্চিম সীমা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সীমানা, রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মালভূমিধলভূম, কেওঞ্জর ও ময়ূরভঞ্জের অরন্যময় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া ও ত্রিপুরা অবস্থিত। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্ম-ভূমি।[৫]

যুগে যুগে বাঙালীজনের স্রোতধারা

পৃথিবীতে নরাকার জীবন বিবর্তন ঘটে প্লাওসিন যুগে। এর পরের যুগকে প্লাইষ্টোসিন যুগ বলা হয়। এ যুগেই মানুষের আর্বিভাব ঘটে।[৬]

যদিও প্লাইস্টোসীন যুগের মানুষের কোন নরকঙ্কাল এ অঞ্চলে পাওয়া যায়নি তবুও তার আগেকার নরাকার জীবনের কঙ্কাল এশিয়ার তিন জায়গায় পাওয়া গেছে। এগুলো হলো ভারতের উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রস্থ শিবলিক গিরিমালা, ভাজাও চীন দেশের চুংকিঙ। এই তিন বিন্দু যোগ করলে যে ত্রিভুজ হয় তার মাঝখানে পড়ে বাংলাদেশ। অতএব এ অঞ্চলে উক্ত জীবের যে বিচরণ হয়েছে তা অনুমান করা যায়। প্রাচীন কালেই যে এ অঞ্চলে মানুষের উপস্থিতি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত "আয়ুধ" সমূহ থেকে। বাঁকুড়, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানা স্থানে "আয়ুধের" অন্যান্য পাথরের তৈরী হাতিয়ার বা প্রত্ন প্রস্তর যুগের আয়ুধ

পাওয়া গেছে। এ গুলোর নির্মাণ রীতি পশ্চিম ইউরোপে প্রাপ্ত আয়ুধের মতই। এ যুগকে প্রত্ন প্রস্তর যুগ বলা হয়। যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্বে। এর পরের যুগকে নবপ্রস্তর বা নব পলীয় যুগ বলা হয়। এ যুগে মানুষ যাযাবর জীবনের পরিবর্তে কোন কোন স্থানে বসবাস শুরু করে, কৃষি ও পশু পালন করে, চাষ বাস করে। নবপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত মানুষ "আয়ুধ" ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রস্তর দ্বারাই নির্মাণ করত। এরপরে তামার ব্যবহার শূরু হয় এবং একে "তাম্রাশ্ম" যুগের সভ্যতা বলা হয়। এ যুগেই নাগরিক সভ্যতার পত্তন। মহেনযোদাঁড়ো, হরপ্পা, বাংলার পাণ্ডু রাজার ঢিবি প্রভৃতি নগরে প্রাপ্ত নিদর্শনে এ যুগের স্মৃতি চারণ করা যায়।[৭]

পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শন গুলো তাম্রযুগের সভ্যতার বাহক ছিল। এ যুগের লোকরা নগর, রাস্তাঘাট, গৃহ ও দুর্গ নির্মাণ করতে জানত। কৃষি ও বানিজ্য তাদের অর্থনীতির বাহন ছিল। তারা শষ্য উৎপাদন ছাড়া পশু পালনও করত। তারা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের সমান দক্ষতা ছিল। ক্রীট দ্বীপ ও ভুমধ্যসাগরিয় অন্যান্য দ্বীপের সংগে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ তারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, মশলা, তুলা, বস্ত্র, হস্তিদন্ত ইদ্যাদি রপ্তানী করত। একটি দেশের প্রচলিত লিপি পদ্ধতিতে লিখিত একটি চক্রাকার সীল মোহর পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া একটি মাটির লেবেলও (যাতে বাণিজ্যিক লেনদেনের হিসেব থাকত) পাওয়া গেছে। ক্রীট দেশে মনে হয় তদানীন্তন বাঙালীদের কোন উপনিবেশও ছিল। মিশরবাসী এক নাবিকের প্রনীতি "পেরিপ্লাস" গ্রন্থে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'ভেলেরিয়াস' ফ্লাকাসও তাঁর "আর গনটিকা" পুস্তকে উল্লেখ করে গেছেন যে গঙ্গা রাঢ় দেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বে কলচিয়ান ও জেশনের অনুগামীদের সংগে বিশেষ বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করেছিলেন। এর প্রতিধ্বনি করে ভাজিল তাঁর 'জর্জিকাস' নামক কাব্যে লিখে গেছেন যে গঙ্গা রাঢ়ের বাঙালী বীরদের শৌর্যবীর্যের কথা "আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব"।[৮]

প্রাগৈতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক কালের বঙ্গীয় সভ্যতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, "পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে (অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে) ক্ষুদ্র প্রস্তর যন্ত্র শিল্পে তাম্র প্রস্তর সংস্কৃতির স্তরে পাওয়া গেছে। আবার মধ্য প্রস্তর যুগীয় যন্ত্রও এখানে উপস্থিত। মনে হয় এগুলি তাম্র প্রস্তর যুগে পুনর্বার ব্যবহৃত হয়েছিল। পর্যবেক্ষণ অন্তে মনে করা যেতে পারে যে এগুলি খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের।"[৯] এসব আলোচনা হতে মনে হয় বাংলাদেশ এক সুপ্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

আমাদের সমাজ জীবনে রাষ্ট্র বড় রকমের ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র দুর্বল হলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং আর্থিক দৈন্যও ফুটে উঠে। আবার রাষ্ট্র যখন শক্তিশালী ও সংগঠিত হয় তখন সমাজের চেহারা পাল্টে যায়। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও শাসন যন্ত্র সমাজ জীবনকে দারুণ ভাবে আলোড়িত করে। রাষ্ট্র ছাড়া ধর্মীয় অনুশাসনও সমাজ জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। অষ্ট্রিক ভাষা ভাষী আদিম অধিবাসিরা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করত। মৃত ব্যক্তিকে কবর দিত, লিঙ্গ পূঁজা করত। এরা গাছ, পাথর ফলমূল, কোন বিশেষ স্থান ইত্যাদির ওপর দেবতারোপ করে তার পূঁজা করত। গন্দ, কোরক, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতীয়রা এখনো এদের মত পূঁজা অর্চনা করে।

দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের আগমনের পর যোগধর্ম ও সাধন পদ্ধতি এদের কারো কারো মধ্যে প্রচলিত ছিল। এরা আধ্যাত্ম রহস্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করত। এরা কর্মঠ, উদ্যমশীল, শিল্প নিপুণ এবং বাস্তব বাদী ছিল। এদের সমাজে শ্রেণী বিভাগ ছিল। আর্য এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে, মূর্তিপূর্জা, মন্দির, পশু বলি, অনেক দেবদেবী যেমন শিব, উমা, শিবলিঙ্গ বিষ্ণু ও শ্রী যে যায়গা জুড়ে আছে তার মূলে দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের প্রভাব রয়েছে। ভারত বর্ষে আর্যরা নিয়ে এল বৈদিক ধর্ম, দেবতাবাদও বেদের কিছু কিছু মন্ত্র ও সুক্ত। আর্য সংস্কৃতিতে বাবিল, আসুরী এবং ভূমধ্য নর গোষ্ঠির প্রভাব ছিল। বাংলাদেশে আর্যদের আগমন হয় সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে। তখন থেকে পাল বংশের উত্থান কাল পর্যন্ত প্রায় হাজারে বছরেরও বেশি সময়ে আর্য ধর্ম ও আর্য সংস্কৃতি বাংলায় শক্ত শিকড় গেঁড়ে বসে। ৮ম শতকের মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সুদীর্ঘ চারশ বছরে পাল বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে। পাহাড়পুর, ময়নামতি, মহাস্থান, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে আবিস্কৃত বৌদ্ধ মন্দির, তাম্রশাসন ও অন্যান্য নিদর্শন বিশ্লেষণ করে প্রফেসর শাহানারা হোসেন তাঁর "Everyday life in the Pala Empire" গ্রন্থে এ যুগের এক মনোজ্ঞ সমাজ চিত্র তুলে ধরেছেন।[৩]

বস্তুতঃ মুসলমানদের আগমনের পূর্বে প্রাচীন বাংলায় হিন্দু (আর্য) ও বৌদ্ধ ছাড়াও আদিবাসিদের নানা দেবদেবীর পূঁজা অর্চনা, জৈন ধর্ম এবং পরবর্তী কালে সেন আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচুর প্রভাব পড়েছিল।

বর্ণ বিন্যাস ও অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস

আদিবাসী এবং দ্রাবিড়দের মধ্যে সম্ভবতঃ বর্ণ বিন্যাসের চেয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাসের প্রচলনই বেশি ছিল। হিন্দু ধর্মের বর্ণ বিন্যাসের আবির্ভাবের পরেও কিন্তু এই অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাসটা মুছে যায়নি। সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থা অনুসারে সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণী উদ্ভব ও স্তরভেদ দেখা দেয়। প্রাচীন বাংলায় অর্থাগমের তিনটি উপায় ছিল। এগুলো কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। ক্ষেত্র কর বা কর্ষক ফসল ফলালেও সামন্তরাজা এবং রাষ্ট্র এতে ভাগ বসাত। ব্যবসা ছিল বনিকদের হাতে এবং শিল্প ছিল শিল্পীদের হাতে। শিল্পী এবং বণিকরা "কর" দিলেও বিলি ব্যবস্থাটা তাদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকত। খৃষ্টপূর্ব শতকগুলোতেই বাংলায় এই তিন শ্রেণীর আর্থিক বিন্যাসের উদ্ভব হয়। কৃষি জীবি যেমন রজক, আভীর, নট, পৌন্ড্রক, কৌয়ালী, মাংসচ্ছেদ, ইত্যাদি; শিল্পজীবি সূত্রধর,চিত্রকর, অট্টালিকাকার, কোটক ইদ্যাদি, ব্যবসায়ী যেমন, তৈলকার, শৌন্ডিক (শুঁড়ি) ধীবর-জালিক ইত্যাদি। তবে প্রত্যেক বৃত্তির লোকই কমবেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল বলে মনে হয়। এ ছাড়াও ছিল ভূমিহীন, আবর্জনা পরিষ্কারক, চণ্ডাল-বাউড়ী, পোদবাগদী প্রভৃতি বৃত্তিজীবি। জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিতছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ যতি সম্প্রদায়।

এতো গেল সাধারণ মানুষের কথা। রাজকর্মচারী ও সামন্তপ্রভূদের নিয়েও একটি শ্রেণী বিন্যাস গড়ে উঠেছিল। সকলের উপরে ছিলেন রানক, রাজনক, মহাসামন্ত, সামন্ত, মান্ডলিক ইত্যাদি। এর পরে ছিল উপরিক বা ভূক্তিপতি, বিষয়পতি, মন্ডলপতি, অমাত্য, সান্ধি বিগ্রহিক, শান্ত্যাগারিক, রাজপণ্ডিত, কুমারমাত্য, মহাপ্রতীহার, মহাসেনাপতি, রাজামাত্য, রাজস্থানীয় ইত্যাদি। এঁরা ছিলেন আমলাতন্ত্রের উপরের স্তর। মধ্যবিত্ত, মধ্যম ক্ষমতাধারী রাজকর্মচারী স্তরে

ছিলেন, অগ্রহারিক, ঔদ্রাঙ্গিক, আবস্থিক, চৌরোদ্ধরনিক, বলাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, দাণ্ডিক, দণ্ড পাশিক, দণ্ডশক্তি, দশাপরাধিক, গ্রামপতি, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, খণ্ডরক্ষ, খোল কোট্টপাল, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, প্রান্তপলি, ষষ্ঠাধিকৃত ইত্যাদি। এর নীচের স্তরে ছিল, শৌল্কিক, গৌল্মিক, হট্টপতি, বাসাগরিক, পিলুপতি, লেখক, শিরোরক্ষিক, শান্তাকিক প্রভৃতি। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল, লাট, কর্নাট, হুন, মালব, খস, চোড় ইত্যাদি বেতনভুক সৈন্য, অধস্তন কেরানী, চাটভাট প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র সেবকবৃন্দ। মহত্তর, মহামহত্তর, প্রতিবাসি, জনপদ বাসি, কুটুম্ব ইত্যাদি ভূমি সম্পদে ও শিল্প বাণিজ্য সম্পদে সমৃদ্ধ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত একটি শ্রেণী প্রতিনিধি ছিল। এই চিত্র আমাদের সামনে প্রাচীন বাংলার সুদৃঢ় সামন্ত প্রথা ও আমলাতন্ত্রের বিস্তৃত চেহারা তুলে ধরে। তার সাথে সামন্ত প্রভূদেরও আমলাতন্ত্রের দাপটের কথাও স্মরণ করায়ে দেয়।

এক সময়ে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশের বাদ বাকি আর সমস্ত বর্ণকেই সংকর শূদ্রবর্ণ হিসেবে ধরা হ'ত। এদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণেরা তাদের প্রত্যেকের স্থান ও বৃত্তি বেঁধে দিয়ে ছিলেন। গোড়ায় এদের সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং তা থেকেই বোধ হয় বাংলায় 'ছত্রিশ জাত' কথার উৎপত্তি। পরবর্তী সময়ে এ সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কয়েকটি করে নাম ও এর সাথে যোগ হয়। ব্রহদ্ধর্মপুরানে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকী তিনটি বর্ণের আওতায় উক্ত জাত গুলোকে সন্নিবেশ করা হয় নিম্নোক্ত ভাবে।

ক) উত্তম সংকর বিভাগে ২০টি উপবর্ণঃ করণ (লেখক, পুস্তক কর্মদক্ষ), অনুষ্ঠ (চিকীৎসক), উগ্র (যোদ্ধা), মগধ (চারণ), তন্তবায়, গান্ধিক, বনিক (গন্ধ বিক্রেতা), নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৈলিক, কুম্ভকার, কাংশ্যাকার, শংখকার, দাস (চাষী), বারজীবী, মোদক, মালাকার সুত, রাজপুত্র, তাম্বলী (পান বিক্রেতা)।

খ) মধ্যম সংকর বিভাগে ১২টি উপবর্ণঃ তক্ষন (খোদাইকর), রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, আভীর (গোয়ালা) তৈলকার, ধীবর, শৌন্ডিক (শুঁড়ি), নট, শাবাক, শেখরও জালিক।

গ) অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্য্যায়ে ৯টি উপবর্ণ ছিলঃ মলগ্রী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবি, ডোলাবাহী ও মল্লা। কয়েকটি কোমের নাম মিলিয়ে উপবর্ণের প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়ায় (২০+১২+৯)=৪১টিতে। বর্নাশ্রমের বাইরে পুক্কশ, পুলিন্দ, খস, ঘর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর ইত্যাদি কোমের নামও পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরানেও অনেকটা এরকম বর্ণ বিন্যাস পাওয়া যায়। সমাজে অর্থোৎপাদক শ্রেণী (স্বর্ণকার, সুবর্ণ বনিক, তৈলকার, গন্ধবনিক) বর্ণ হিঁসেবে উচুঁ কোঠায় স্থান পায়নি। তবে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থাগামের জন্যে রাষ্ট্রের কাছে এদের মর্যাদা ছিল। সমাজে যারা শ্রমিক ছিল তাদের কোন মর্যাদা ছিলনা। তাঁরা নিম্নবর্ণ বা অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত। অর্থনীতি পুরোপুরি কৃষি নির্ভর হয়ে পড়লে আস্তে আস্তে আর্য্যোৎপাদক শ্রেণীও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও করণ কায়স্থদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি ছিল। জমির মাপ-জোখ, হিসেবপত্র ও দপ্তর ইত্যাদির তদারক, পুস্তকপালের কাজকর্ম, লেখকের কাজকর্ম ইত্যাদি করার দরুনই রাষ্ট্রে করণ কায়স্থরা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আর্য সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র নিয়ে যে চতুবর্ণ সমাজ তা তখনো পর্যন্ত বাংলায় গড়ে ওঠেনি। বাংলার বর্ণ বিন্যাস ব্রাহ্মণ, শুদ্র ও অন্যুজ-ম্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। বর্ণ হিসেবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের ইঙ্গিত পাল আমলেও খুব একটা পাওয়া যায় না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের ছিটে-ফোটা দু'চারটা উল্লেখ এখানে সেখানে থাকলেও সমাজে এর ব্যাপক প্রভাব ছিলনা। যদিও হিন্দু পুরান ও ধর্মগ্রন্থ গুলোতে এবং নানা উপাখ্যানে চার বর্ণকেই এক পিতার সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করা হয়েছে। তবুও বাস্তবে সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ বিন্যাস ও জাতিভেদ প্রথার দারণ কুফল লক্ষ্য করা গেছে।[৫]

গ্রাম ও নগর বিন্যাস

গ্রামকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাংলার কৃষি নির্ভর সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। চাষের ক্ষেত্রের সন্নিকটে বসতি স্থাপন, ঘরবাড়ী তৈরী ও পোষাক পরিচ্ছদ বানানোর জন্যে যতটুকু কাঁচামাল ও শিল্পের প্রয়োজন তাই গ্রামবাসীরা তৈরী ও উৎপাদন করত। গ্রাম সাধারণতঃ বসতবাড়ী, শস্যক্ষেত্র, চারণভূমি, বধ্যভূমি, পূঁজা অর্চনার স্থান বা মন্দির ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত ছিল যা এখনো প্রায় অবিকল রয়েছে। বৃহৎ গ্রামগুলো আবার পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত ছিল। গ্রাম বা পাড়া গুলো সাধাণতঃ প্রাথমিকভাবে একই বৃত্তির লোক নিয়ে গড়ে উঠলেও পরবর্তী কালে বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে একই পাড়া বা গ্রামে বিভিন্ন বৃত্তির লোকের সন্নিবেশ ঘটে। গ্রামের পাশ দিয়ে অথবা ভেতর দিয়েই পানি নিষ্কাশনের ও সেচের জন্যে খালের ব্যবস্থা ছিল এবং এখনো আছে। কোন কোন গ্রামে বড় বড় পুকুর অথবা দীঘি খনন করা হয়েছে শুকনো মৌসুমে পানি ধরে রাখার জন্যে। এসব পুকুর বা দিঘীর পাড় গুলোতে উচুঁ বাঁধ নির্মাণ করা হত।

গ্রামে বাস করতেন সাধারণত ব্রাহ্মণেরা, ভূস্বামী, মহত্তর, কুটুম্বেরা, ক্ষেত্রকর, বারজীবি, ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিকেরা, তন্তবায় কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংস্যকার, মালাকার, চিত্রকর, তৈলকার, সূত্রধর, প্রভৃতি শিল্পীরা; তৌলিক, মোদক, তাম্বলী, শৌণ্ডিক, ধীবর, জালিক প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা; গোপ, নাপিত, রজক, আভীর, নট-নর্তক প্রভৃতি সমাজ সেবকেরা; বরুড়, চর্মকার, ঘট্টজীবি, ডোলাবাহী, ব্যাধ, হুক্কি, ডোম, জোলা, বেদিয়া মাংসচ্ছেদ, চণ্ডাল, কোল, ভীল, শবর, পুলিন্দ, মেদ, পৌণ্ডক প্রভৃতি অন্তজ ও আদিবাসি পর্যায়ের লোকজন।

গ্রাম্য বাঙালী গৃহস্তের পরম এবং চরম কামনা ছিল স্থানীয় শাসন কর্তা যেন লোভহীন হন। ধেনু দ্বারা গৃহ যেন পবিত্র হয, ক্ষেত্রে যেন চাষহয় এবং গৃহিনী যেন অতিথি সৎকারে কখনো ক্লান্ত না হন (শুভাঙ্ক সদুক্তি কর্নামৃত)।

নগরগুলো গ্রামের মত প্রকৃতিগত নয়। এগুলো বিভিন্ন প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। কতগুলো নগর গড়ে উঠেছে সামরিক ও রাজা, মহারাজাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে আবার কতগুলো বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। কতগুলো শিক্ষা কেন্দ্ররূপে এবং কতগুলো এই সবকটি প্রয়োজনের কারণেই। যেমন- পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্র নগরী (মহাস্থান) একাধারে তীর্থস্থান, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ নগর, বাণিজ্য কেন্দ্র, শিক্ষা কেন্দ্র এবং পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং বিপুল সমৃদ্ধিলাভ করেছে। তাম্রলিপ্তি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে, পাহাড়পুর শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে, কর্ণসূবর্ন সামরিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়াজনে গড়ে উঠেছে।

প্রতিটি নগরই প্রাচীর ঘেরা ও প্রাচীরের বাইরে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। নগর পরিকল্পনাও মনোরম ছিল। প্রশস্ত রাস্তা, তার দুধারে অট্টালিকা রাজি বিপনী কেন্দ্র সজ্জিত ছিল। রাম চরিতে রামাবতীর এবং পবনদুতে বিজয়পুরের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে রাজপথের দুধারে চলেছে প্রাসাদের শ্রেণী, নগরে সঞ্চিত প্রচুর মনি রত্নসম্ভার। নগরের আভিজাত সমাজে নর্তকী, সভানারী, বাররামা, দেবদাসীরা অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হত।

নগরের নাগরিকদের মধ্যে ছিল রাজপুরুষ, শাসনকর্তা, রাজকর্মচারী, শিল্পী, ব্যবসায়ী আমলা, অভিজাত শ্রেণী ও এক শ্রেণীর খেটে খাওয়া পুরুষ ও নারী। এছাড়া সৈন্য বাহিনী এবং রক্ষীরাও নগরে বাস করত। নিম্ন বিত্ত, শ্রমিক, রসদ যোগানকারীরা এবং নগর পরিষ্কারকেরা বাস করত নগরের উপকণ্ঠে।

নগরগুলো নৌ ও স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সুন্দর ভাবে সংযুক্ত ছিল। প্রতিটি নগরই কোন না কোন নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। আবার একাধিক স্থলপথ দ্বারা এগুলো সংযুক্ত ছিল। এ ধরনের নগর পরিকল্পনায় প্রাচীন বাংলার শাসক ও নাগরিকদের যে দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই প্রসংশার দাবী রাখে।৫

জীবন চিত্র

কোন দেশ কালবদ্ধ নরনারীর মননকল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা শুধু ধর্মকর্ম এবং জ্ঞান বিজ্ঞানেই আবদ্ধ থাকেনা; জীবনের প্রতিটি কর্মে, ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবন চর্চায় তা ধরা পড়ে। অতীতের জীবন্ত মানুষের স্রোতের কোন সবাক চলমান চিত্র আমাদের হাতে নেই। সে চলমান মানব প্রবাহের জীবন রূপ সমসাময়িক কোন সাহিত্যে পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি। এখানে সেখানে তাদের আহার বিহার, বসনভুষণ, খেলাধূলা, আমোদ-উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর ভিত্তিতেই আমাদের বর্তমান আলোচনা।

সাজ-সজ্জা

পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাইকরা কাপড় পরার আদৌ রেওয়াজ ছিলনা, সেলাই করা জামার আমদানী হয়েছিল অনেক পরে মধ্য ও উত্তর ভারত থেকে। পুরুষের অধোবাস ছিল ধুতি আর মেয়েদের অধোবাস ছিল শাড়ী। ধুতি ও শাড়ীই ছিল প্রাচীন বাংলার প্রধান বেশবাস। তবে অবস্থা সম্পন্ন পরিবারে ধুতির সাথে পুরুষেরা ব্যবহার করত সেলাই বিহীন উত্তরীয় আর মেয়েরা শাড়ীর সাথে ব্যবহার করত ওড়না। ওড়নাই দরকার মত উত্তরবাস ও ঘোমটা দুটোর কাজই করত। তখনকার দিনের ধুতি ছোট ছিল। সচরাচর হাঁটুর নীচে ধুতি পরার সে সময় রেওয়াজ ছিলনা। মাঝ খানটা কোমরে জড়িয়ে দুটো খুঁট টেনে পেছন দিকে দিয়ে গিয়ে কচ্ছ বা কাছা বাঁধা হ'ত। নাভীর নীচে দুস্বতিন প্যাচের একটি কটি বন্ধের সাহায্যে কাপড়টা কোমরে আটকানো থাকত। মেয়েদের শাড়ী পরার ধরনও ছিল প্রায় একই রকম। তবে শাড়ী ধুতির মত এত খাট নয়। পায়ের গোছ পর্যন্ত নামানো কাছা ছিলনা। এখনকার মত তখনও মেয়েরা কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়ে অধোবাস রচনা করত। তবে এখনকার মত মেয়েরা তখন শাড়ি দিয়ে উত্তরবাস রচনা করে আব্রুর প্রয়োজন বোধ করত না। ওপরের গা খালি রাখাই ছিল রীতি

ওপরের গা খালি রাখার এই ঐতিহ্য সমস্ত আদি অষ্ট্রেলীয়, পলিনেশিয়, মেলানেশিয় নরগোষ্ঠির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বালি দ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেক দ্বীপে এ প্রথা এখনো বিদ্যমান।

মেয়েদের শাড়ী ও উত্তরবাস এবং পুরুষের ধুতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে নানা প্রকার লতা, পাতা, ফুল ও জ্যামিতিক নক্সা আঁকা হত। আটপৌরে পরিধেয় ছাড়াও সভাসমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোষাক পরার প্রচলন ছিল। নর্তকী মেয়েরা পরত পায়ের গোছ পর্যন্ত আঁটসাট পায়জানা। দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিত লম্বা ওড়না। সন্যাসী, তপস্বী ও দরিদ্র শ্রমিকরা পরত ল্যাঙ্গোটি। সৈনিক ও কুস্তিগীররা পরত উরু পর্যন্ত খাট জাঙ্গিয়া, শিশুরা আঁটসাঁট পায়জামা, কটিদেশে জড়ানো ধুতি পরত এবং গলায় পরত সূত্রহার। এখনকার মত তখনও বাঙালীর টুপি জাতীয় কিছু ছিলনা। নানা কায়দায় কেয়ারি করা চুলই ছিল তার শিরোভুষণ। পুরুষেরা লম্বা বাবড়ির মত চুল রাখতেন এবং তা থোকা থোকা হয়ে কাধের উপর ঝুলত। কারো চুল চুড়ো করে বাঁধা থাকত। মেয়েদের লম্বা চুল ঘাড়ের উপরে খোঁপা করে বাঁধা থাকত। কারো কারো মাথার পেছনের দিকে এলানো থাকত।

মেয়েরা কপালে পরত কাজলের টিপ এবং চোখেও দিত কাজল। সিঁথিতে সিঁদুর, ঠোঁটে লাক্ষারস আর পায়ে দিত আলতা। তারা গায়ে আর মুখে মাখত চন্দনের গুঁড়ো, চন্দ্রনপনক, মৃগনাভি ও জাফরান, মাথার খোপায় ফুল গুঁজে দেয়া ছিল প্রসাধনের অঙ্গ। ডঃ শাহানারা হোসেন "Glimpses of village life of Early Medieval Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে মেয়েদের চুল লম্বা ছিল, তারা মাথায় খোঁপা করত এবং বিভিন্ন ফুল ও পাতা দিয়ে সৌন্দর্য্য চর্চা করত। জনৈক কবির বর্ণনা থেকে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে গ্রীষ্মকালে মেয়েরা কর্ণে ফুলের দুল, গলায় মল্লিকার নেকলেস ও হাতে লুটাসের বালা পরে নিজেদের সাজাত। এই সাজসজ্জা কারো না কারো মনে আনন্দ দিত। শহরের মেয়েরা সোনার ও মনি মুক্তার অলংকার পরত বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর মতে পুরুষেরা লুঙ্গি জাতীয় কিছুও মনে হয় পরত। সাধারণ গ্রাম বাসিরা মোটামুটি সুতোর ধুতি ও শাড়ী পরত।[১০]

শহরের মেয়েদের বর্ণনা দিয়েছেন এক অজ্ঞাত নামা কবি এ ভাবেঃ

"গায়ে তাদের সুক্ষ্ম বসন,
হাতে সোনার তাগা,
গন্ধ তেল ঢালা চক চকে চুল
মাথার উপর চুড়োর মত করে বাঁধা,
তাতে আবার জড়ানো ফুলের মালা
কর্ণে নবশশি কলার মত ঝকঝকে
তালপাতার বর্ণাভরণ,
বাঙালী মেয়ের এই সাজ সজ্জা
কারনা ভোলায় মন।"

এখন থেকে হাজার বছর আগে কবি রাজশেখর গৌড়দেশের মেয়েদের বেশবাসের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

"বুকে তাদের চন্দনপনক গলায় সুত্রহার
সিঁথি পর্যন্ত টানাঘোমটা, অনাবৃত বাহুমূল,
গায়ে অগুরুর প্রসাধন,
রং যেন দুর্বাদলের মত শ্যাম সুন্দর-
এই হচ্ছে গৌড় দেশের মেয়েদের বেশ।"

সেকালের পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের বর্ণনা দিয়েছেন কবি চন্দ্রচন্দঃ

"কপালে কাজলের টিপ
হাতে চাঁদের আলোর মত সাদা
পদ্ম ডাঁটার বালা,
কানে কচি রীঠা ফুলের দুল,
স্নিগ্ধ চুলের খোঁপায় তিলের পল্লব-
পল্লীবাসী বধূদের এই বেশ
পথচলিত মানুষের গতিবেগ
মন্থর করে আনে।"

কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয় কেয়ুর শঙ্খবলয়, মেঘলা-এসব অলংকার মেয়ে পুরুষ সবাই ব্যবহার করত। এছাড়া মুক্তো খচিত হার, মহানীল রক্তাক্ষমালারও উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজবাড়ির ও উচ্চবিত্তের মেয়েরা মুক্তোখচিত হার, সোনা ও হীরে খচিত অলংকার, রত্নখচিত ঘুঙুর, মুক্তা, মরকত, নীলকান্তমনি, চুনি প্রভৃতি ব্যবহার করত।

যোদ্ধাগণ, পাহারাওয়ালা ও দাড়োয়ানরা জুতা পরত। চামড়া দিয়ে জুতো এমন ভাবে তৈরি হত যাতে পায়ের গোছ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। সাধারণ লোক জুতোর পরিবর্তে কাঠের খড়ম, কাঠের সেণ্ডেল ইত্যাদি ব্যবহার করত।

উচুঁ ঘরের বিয়েতে কিভাবে সাজসজ্জা, ধুমধাম হত তার বর্ণনা পাওয়া যায় নৈষধচরিতে। প্রথমেই স্বামী পুত্রবতী মেয়েরা মঙ্গলগীত গেয়ে গেয়ে বিয়ের কনেকে স্নান করাতেন এবং শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাতেন। তারপর সখীরা কপালে পরাতেন মনঃ শিলার তিলক, সোনর টিপ, চোখে দিতেন কাজল, কানে মনি কুণ্ডল, ঠোঁটে আলতা, গলায় সাতলহর মুক্তোর মালা, হাতে শাঁখা ও সোনার বালা, পায়ে আলতা। বিয়ের স্থানে মেয়েরা নানান আলপনা আঁকত। উৎসবের প্রধান বাজনা ছিল বাঁশি, বীনা, করতাল ও মৃদঙ্গ। বর দেখার জন্যে রাস্তায় মেয়েরা সারি বেঁধে দাঁড়াত। বাসরঘরে আড়িপাতা হত। বর কনের গাঁট ছড়া বাঁধার রীতিও ছিল। বরযাত্রীদের ঠাট্টা রসিকতা আজকের দিনের মত তখনো ছিল।

মেয়েদের বহির্মুখিতা ও সমাজে নারীর মর্যাদা

প্রাচীন কালে শহর ও গাঁয়ের গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা ঘরের বাইরেও না না কাজকর্ম করত। মাঠে ঘাটে খাটনা খাটনি করত। হাট বাজারে যেত, সওদা কেনা বেচা করত। তাছাড়া স্বামী ও সন্তান সন্ততীর পরিচর্যাও করত। কর্মব্যস্ত এই মেয়েদের কাব্যময় ছবি এঁকেছেন কবি শরনঃ

"এই যে হাটের কাজ সেরে ছুটে চলেছে ঘরের মেয়েরা
অস্তগামী সূর্যের মত তাদের চোখের দৃষ্টি,
তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে বারে বারে তাদের
কাঁধের আঁচল খসে পড়ছে-
বারে বারে তা টেনে তুলতে হচ্ছে।
সেই কোন্ ভোরে ঘর ছেড়ে মাঠের কাজে
বেরিয়ে গেছে চাষী, এখনতার ঘরে ফেরার সময়-
এই কথা ভেবে মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে
পথ সংক্ষেপ করে আনছে,
আর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাটে কেনা বেছার দাম
আঙুলে গুনছে।"

একজন গুনবতী স্ত্রী লোকের গুণাগুণ সম্পর্কে দশম শতকের 'ডাক' বলে,

"মিঠ রান্ধে সরু আ কাটে,
সে গৃহিনীতে ঘরনা টুটে।
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে,
তুবু তার পূঁজায় সাজে।
রোদ্রে কাঁটাকুটায় রান্ধে,
খড় কাঠ বর্ষাকে বান্ধে।
কাঁধে কলসী পানিক যায়
হেঁট মুনতে কাকহো না চায়।
যেন যায় তেন আইসে,
বলে 'ডাক' গৃহিণী সেইসে।"[১১]

রাজিয়া সুলতানার উদ্ধৃতি থেকে নেয়া এই কাব্যে মেয়েদের দৈনন্দিন কর্মময় জীবনের এক নিঁখুত বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। এ প্রসংগে ডক্টর শাহানারা হোসেন উদ্ধৃত সুদুক্তি কর্ণামৃতের সামান্য অংশ উল্লেখযোগ্য।

"কুপ হতে রজ্জুদিয়ে পানি তুলে
বারংবার পানি সিঞ্চন করছে পাসরী-
সুত্রচ্ছেদহেতু তার শঙ্খবলয় গুলি ঝন ঝন করছে।
সুমধুর গান গেয়ে গ্রাম্য রমণীরা
শীতের চাল কাড়ছে-
তাদের গানের সুরের সাথে মিলিত হচ্ছে
তাদের হাতের আন্দোলিত চুড়ির ধ্বনি।"[১২]

'মা' হিসেবে মেয়েদের মর্যাদা খুব উচুঁতে ছিল। বিয়ে সাদি সাধারণতঃ একই বর্ণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হ'ত। তবে বর্ণের বাহিরেও বিবাহ কদাচিত অনুষ্ঠিত হত। সাধারণতঃ ৮ বছর বয়সেই মেয়ের বিয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। স্বামীর বয়সের সাথে মেয়ের বয়সের ব্যবধান বেশ থাকত। বার বছরের বেশি বয়সের অবিবাহিত মেয়ে ঘরে থাকলে ঐ পরিবারকে একঘরে করে রাখার নজিরও ছিল। এটা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। মেয়ের বাবাকে যৌতুক দিতে হ'ত। মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার ছিল বিধবা হওয়াটা। বিধবার সহমরণ (স্বামীর চিতায়) ছিল সর্বোত্তম কাজ। আর তা না হলে তাকে সিঁদুর না পরে, অলংকারাধি পরিত্যাগ করে, বিলাস ত্যাগ করে, মাছ, মাংস,ডিম ভক্ষণ না করে, কোন কোন সময়ে অর্ধাহারে থেকে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে স্বামীর মঙ্গল কামনা করেই দিন কাটাতে হ'ত। ডক্টর শাহানারা হোসেন তাঁর এক প্রবন্ধে যে যুগের মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, "..... Bengali women between the period between the 7th-12th A.D.had to depend mostly upon the natural instincts of love, affection, and the sense of duty of her male guardians under whose supervision she had to pass her life."[১৩]

এ থেকে বুঝা যায় মেয়েরা ঘরে বাইরে কাজকর্ম করলেও এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করলেও তারা পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের উপরই নির্ভরশীল ছিল। অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্র থেকে মেয়েদের স্বাধীন বৃত্তির আরো কিছু খবর পাওয়া যায়। সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন ঘরে ঘরে মেয়েদের সাধারণ কাজ ছিল। কিছু কিছু শিল্পীবর্তী স্ত্রীলোক ছিল। কিছু মেয়ে ছিল যারা ক্রয় বিক্রয় করত, পন্যের কেনাবেচা দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। এদের মধ্যেই সম্ভবতঃ স্বাধীন বিচরণ শালিনী (অটন্তী) স্ত্রীলোক দেখা যেত।

এ ছাড়া "রাজ অন্তপুরেও মহিলারা নিযুক্ত হ'ত। ..... অন্তপুরের পরিচালক ছিল কঞ্চুকী (বয়স্ক ব্রাহ্মণ) এবং পরিচালিকা ছিল মহত্তরিকা। এক কক্ষে পুনর্ভু রমনীরা থাকত। এক কক্ষে থাকত বেশ্যারা, একটি কক্ষছিল নাটকীয়া বা অভিনেত্রীদের জন্যে। দেবীর সংখ্যা ছিল একাধিক"।[১৪] এই সব নারীদের মধ্যে বাছাই করে কাউকে কাউকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গুপ্তচর বৃত্তির কাজে লাগান হস্বত। এ ছাড়াও মেয়েরা পরিচালিকা, দাইমা, রাণীমার সেবিকা, রাজকন্যা ও নাবালক রাজপুত্রদের সেবিকা হিসেবে কাজ করত। রাজঅন্তপুরের রক্ষিতা দেবীরা এবং অভিনেত্রীরা রাজ অতিথিগণের সেবা ও মনোরঞ্জনের দায়িত্বও পালন করত।

সমাজে যে নিয়ম বহির্ভূত নারী সংশ্লিষ্ট অনাচার তখনও সংগঠিত হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় মনুর বিবরণে। উচ্চ বর্ণের পুরুষ মিলিত হতে পারতেন নীচু বর্ণের নারীর সংগে। কিন্তু এর বিপরীত রীতি ছিল নিন্দিত। এই নিয়ম অনুসারে আর্যপুরুষ ও অনার্য নারীর সঙ্গম অনুমোদিত হয়েছে যদিও এদের সন্তান উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত।[১৫] আর্য সমাজে উপপত্নী প্রথারও প্রচলন ছিল। কিন্তু এর ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুমান করা যায় না।

নগর সভ্যতার তাড়নায় সহজ সরল রমনীরাও কেমন বেসামাল হয়ে উঠেছিল তার বিবরণ রয়েছে সদুক্তি কর্নামৃত গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকে। কবি শুভাঙ্করের বিবরণ এরূপঃ

"নগরে রাজ সৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে
যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্নহারের মুক্তাসমূহ

বিচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে থাকে, রাজ প্রাসাদ
শিখরে নগরাঙ্গনারা নিম্নে রাজপথে চলমান
সুদর্শন যুবকের উপর কামকটাক্ষ নিক্ষেপ
করে (সদুক্তি কর্নামৃত)।"[১৬]

কবির কল্পনায় কিছুটা অত্যুক্তি থাকতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমসাময়িক অন্যান্য বিবরণেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। নারীর কর্মব্যস্ততা এবং সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে মোটামুটি একটা বিবরণ এই অংশে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

দাস-দাসী প্রথা

প্রাচীন বাংলায় দাস-দাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালেও ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে এবং অন্যান্য বিবরণ থেকেও তা জানা যায়। সাধাণতঃ পন্যের মত দাস-দাসী হাটে বাজারে বিক্রয় হত। গৃহকর্তা এদের মালিক ছিল। দাস ও দাসীদেরকে শ্রমিক হিসেবেই সামন্তরাজ, এমনকি সাধারণ গৃহস্থরাও ব্যবহার করত। শ্রমদান ছাড়াও গৃহকর্তা কোন কোন ক্ষেত্রে দাসীদেরকে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করত। "বৈদিক আর্যদের গৃহস্থালীতে দাসী অসুরী শুদ্রা, অর্থাৎ অনার্য জাতীয়া উপপত্নী থাকত, দাসীপুত্র বা অসুরীপুত্র সবর্ণজাত পুত্রের সমান মর্যাদা পেতেন।"[১৭]

অপুত্রক পিতা কোন দাসকে পালিত পুত্র হিসেবেও গ্রহণ করত। সে ক্ষেত্রে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেত। আবার কোন দাসীকে কোন মালিক পুত্রবধু করে নিলেও উক্ত দাসী দাসত্ব থেকে মুক্তি পেত। এসব ক্ষেত্র ছাড়া তাদেরকে জীবনভর দাসত্বই করে যেতেহ'ত।

যদিও এসব দাস দাসীকে আপন পুত্র ও কন্যার দৃষ্টিতে দেখার ব্যাপারে নৈতিক দায়িত্ব বোধ কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে তবুও এ প্রথা সর্বকালে ও সর্ব সমাজেই নিন্দনীয় হওয়া উচিত।

খাদ্য ও পানীয়

আদিকাল থেকে চাষবাসই ছিল এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান পেশা এবং জীবিকা উপার্জনের উপায়। কৃষি নির্ভর এই জনগোষ্ঠির বিশেষ বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের উপর ভিত্তি করেই তাদের খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠেছে। ভেড্ডা প্রতিম অষ্ট্রিক ভাষাভাষী আদিম জনগোষ্ঠিই এদেশে ধানের চাষ শুরু করে। তখন থেকে ভাতই এ দেশের জনগণের অন্যতম প্রধান খাদ্য। জনৈক কবির বর্ণনায় ধান, যব, ইক্ষূ ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

"চাষীর ঘরে নূতন কাটা শালীধানের কি বাহার!
গাঁয়ে শেষে ক্ষেত জুড়ে প্রচুর যব,
নীলপদ্মের মত স্নিগ্ধ সবুজ তাদের শীষগুলো।
ঘরে ফিরে নূতন খড় পেয়ে গরু, বলদ,
ছাগলদের আনন্দ ধরেনা;
আখ মাড়াই কলের ঘর্ঘর শব্দে
গ্রাম গুলো দিনভর মুখর
গুড়ের গন্ধ সারা গাঁয়ে করছে ভুরভুর"।[১৮]

এ বর্ণনা থেকে কৃষি ও গৃহ পালিত পশুর প্রাচুর্য্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝা যায় "ভেতো বাঙালী" কিংবা "দুধে ভাতে বাঙালী" বলে কি কারণে বাঙালীদেরকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নৈষধচরিতে এক ভোজ সভার বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

"পাতে গরম ভাত দেওয়া হয়েছে-
তা থেকে ধোঁয়া উঠছে,
প্রত্যেকটি কনা তার অভগ্ন,
একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা যায়,
সরু সরু প্রত্যেকটি দানাতার সুসিদ্ধ,
সুস্বাদু এবং দুধের মত শাদা,
তাতে ভুরভুর করছে চমৎকার গন্ধ।"[১৮]

দুধ আর অন্নপক্ক পায়েসও উচ্চ বিত্তদের বিভিন্ন উৎসব ভোজে পরিবেশন করা হত। দুধ থেকে নানা প্রকার মিষ্টি তৈরি করার প্রচলন ছিল। দই, পায়েস ও ক্ষীর ইত্যাদি দুধ থেকেই তৈরী হত।

তরিতরকারীর মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরুল কচু প্রভৃতি তরকারীর প্রচলন ছিল। এ সবই বাংলার ভেক্কাপ্রতীম জনগোষ্ঠীর লোকদের অবদান। সম্ভবতঃ মধ্য যুগে ডালের প্রচলন হয়েছিল। গোল আলুর ব্যবহার হয় পর্তূগীজদের আগমনের পর থেকে। বাঙালীর শাকশব্জী খাওয়ার অভ্যাস অতি প্রাচীন কাল থেকেই ছিল।

নিরামিষ ভোজে বাঙালীর অনীহা ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। ভাত আর মাছই এদের প্রধান খাদ্য। তাই "মাছে ভাতে বাঙালী" বলেও এদেরকে অভিহিত করা হয়। অসংখ্য নদনদী ও খালবিল থাকার ফলে মাছ এখানে সহজলভ্য ছিল। আর্যরা মাছ, মাংস খাওয়ার ব্যাপারে ধর্মীয় বাধা নিষেধ আরোপ করলেও এ অঞ্চলে তারা কিছুটা শিথিলতা দেখিয়েছিল, তার কারণ এখানের জনগণের মাছ মাংস প্রীতি। বৃহদ্ধর্ম পুরানের বিধান মতে রুই, পুঁটি, শোল এবং শাদা আঁশ ওয়ালা অন্যান্য মাছ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণেরা খেতে পারবে। বহুকাল থেকেই ইলিশ মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। পাহাড়পুর ময়নামতির কিছু ফলকে মাছ কুটার ও ঝুড়িতে ভরে হাটে মাছ নিয়ে যাওয়া দৃশ্য খোদাই করা থেকেই এদের মৎস প্রীতি সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

হরিনের মাংস ছিল শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি শিকার জীবি এবং উচ্চবিত্তদের বিশেষ সখের খাদ্য। সমাজের সকল স্তরেই ছাগ-মাংস খাওয়ার অভ্যেস ছিল। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস-বক, হাঁস, দাত্যুহ পাখি, উট, গরু, শুয়োর প্রভৃতির মাংস ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি শাসিত সমাজে অভক্ষ্য হলেও নিম্নবিত্ত ও আদি বাসিদের মধ্যে এগুলোর খুব কদর ছিল।

প্রাচীন বাংলার উৎপাদিত ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, আমড়া, নারিকেল ইত্যাদি ফলের এবং আখেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন চর্যাগীতিতে তেঁতুলেরও উল্লেখ রয়েছে। নারিকেল থেকে তৈল ও নানাবিধ মিষ্টান্ন এখনকার মত আগেও তৈরী করা হত।

বাঙালীর আদর্শ খাদ্যের বিবরণ পাওয়া যায় একটি শ্লোক থেকে যেমন, "যে রোজ কলা পাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি মৌরালা মাছের ঝোল আর পাট শাক পরিবেশন করে তার স্বামীই পুন্যবান।" প্রাচীনকালে নিত্যকার খাদ্যের এই ছিল আদর্শ। কোন এক বিবাহ ভোজের বর্ণনা

থেকে যে সব খাদ্যের নাম পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ। "দই ও রাই সর্ষের তৈরী শাদা কিন্তু বেশ ঝাল তরকারী, হরিণ, ছাগ ও পাখির মাংস, মাছের তরকারী, অনেক রকম সুগন্ধিও মশলা দেওয়া তরকারী, নানা প্রকার মিষ্টি পিঠে এবং দই," ও কর্পূর দেওয়া সুগন্ধ জলও পরিবেশিত হয়েছিল। খাওয়া শেষে পরিবেশন করা হয় নানা প্রকার মশলাদার পান। পানীয় জল হিসেবে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল দুধ, ডাবের জল, আখের রস, তালরস এবং মদ জাতীয় নানা প্রকার পানীয়। গুড় থেকে এক প্রকার গৌড়ীয় মদ তৈরি হত এবং তা প্রসিদ্ধ ছিল সারা ভারতে। এছাড়া ভাত, গম, গুড়, মধু, আখ এবং তালের রস গেঁজিয়েও নানা প্রকার মদ তৈরী করা হত। চর্যাগীতি থেকে শুঁড়ি খানার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ থেকে মনে হয় যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা মদ খাওয়াটাকে তেমন দোষের বলে মনে করতেন না।

চিত্ত বিনোদন

আগের দিনের রাজরাজড়াদের শিকারের খুব সখ ছিল। তাছাড়া অন্তজ, ম্লেচ্ছ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কোমরা শিকারকে পেশা এবং নেশা এই দুটো রূপেই গন্য করত। পাহাড়পুর ও ময়নামতির ফলকে শিকারের কিছু কিছু দৃশ্য পাওয়া গেছে।

নিম্নবিত্তদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কুস্তি ও নানা প্রকার দুঃসাধ্য শারিরীক কসরত করা জাতীয় খেলাধূলা। প্রাচীন বাঙলায় পাশা ও দাবা খেলারও প্রচলন ছিল।

রাজপরিবারে এবং উচ্চ অভিজাত সমাজে হস্তী ও অশ্বক্রীড়ার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। দ্বাদশ শতকের দিকে কিছু কিছু লোক বাজি রেখে জুয়া খেলতে শুরু করে।

প্রাচীন বাংলায় মেয়েরা নানা প্রকার জলক্রীড়া ও বাগান করতে পছন্দ করত। তাদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানা রকমের খেলা, যেমন গুঁটি বা ঘুন্টি খেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, আড়াইঘর ইত্যাদি খেলারও প্রচলন ছিল। রাজপরিবার ও উচ্চ মহিলারা দাবাও খেলত। প্রাচীন বাংলায় চিত্তবিনোদনের অন্যতম উপাদান ছিল নাচ ও গান। সমসাময়িক সাহিত্য ও নানা লিপিতে নাচ ও গান- বাজনার উল্লেখ রয়েছে। সমাজের সর্বস্তরেই এগুলোর সমাদর ছিল যথেষ্ট। উল্লেখ আছে যে, কমলা নামের এক দেবদাসী পুণ্ড্রবর্ধন নগরের প্রখ্যাত নর্তকী ছিল। রাজা জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী এককালে কুশলী নটী ছিলেন এবং গান বাজনায় তাঁর নাম ডাক ছিল প্রচুর। পাহাড়পুর ও ময়নামতির বিভিন্ন ফলকে ও প্রস্তরচিত্রে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীনা, মৃদঙ্গ, বাঁশি, মৃতভান্ড প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ছবি অংকতি রয়েছে।

প্রাচীনকালে এদেশে নাচ ও গানের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় করা হত। নাচের মধ্য দিয়েই কোন বিশেস ঘটনাকে প্রকাশ করা হত। একটি শ্লোকে উল্লেখ আছেঃ

"সূর্য লাউয়ে চাঁদ লাগাল তন্ত্রী,
অনাহত দণ্ড সব একাকার করেদিল অবধূতি,
ওলো সখী, হেরুক বীনা বাজছে,
শোন্ কি করুন তন্ত্রীধ্বনি বাজছে,
বজ্রাচার্য নাচছে, দেবী গাইছে-
এইভাবে বুদ্ধ নাটক সুসম্পন্ন হইছে।"১৮

যানবাহন

প্রাচীনকাল হতে নৌকাই ছিল বাঙালার যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। নদী বহুল এই অঞ্চলে নৌকার ব্যাপক প্রচলন ছিল। নৌকা বা ডিঙ্গি, ডিঙ্গা, ভেলা ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি মূল অস্ট্রিক ভাষা। এতে বোঝা যায় এদেশে ডিঙ্গি এবং ভেলা কত প্রাচীন। চর্যাগীতিতে গূঢ় ধর্মতত্ত্বকে সাধারণ্যে সহজবোধ্য করতে নৌকা, গুন, দাঁড় ইত্যাদিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কম্বল পাদ বলেছেনঃ

"খুঁটি উপরে কাছি খুলে দাও, হে কামালি,
সদগুরুকে জিজ্ঞেস করে নৌকা বেয়ে চল।
মাঝ নদীতে এসে চারিদিকে চেয়ে দেখ,
দাঁড় না থাকলে কে বাইতে পারে?"[১৮]

অথবা অন্যত্রঃ

"ভবনদী গভীর গম্ভীর, বেগে বহমান,
তার দুই তীরে কাদা, মধ্যিখানে ঠাঁই নাই।"[১৮]

এগুলো রূপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্যে, মালামাল বহন করার জন্যে লোকে গরুর গাড়ি বা গো যানও ব্যবহার করত।

রাজরাজড়ারা চার-ঘোড়ায়-টানা রথে চড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতেন। উল্লেখ্য যে, পাহাড়পুরের একটি পোড়া মাটির ফলকে সুসজ্জিত ঘোড়ার ছবি রয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে অবস্থা সম্পন্ন লোকেরা চলাফেরা করত। সাধারণের চলাফেরার জন্যেও অশ্বযান ছিল। যুদ্ধের জন্যে অশ্বারোহী বাহিনী যেমনি ছিল তেমনি মালামাল ও সেনাবহনের জন্যে ছিল অশ্বযানও।

মালামাল ও লোক বহনের জন্যে ব্যবহার করা হ'ত হস্তী এবং গাধা। রাজরাজড়া, সামন্ত ও জমিদাররা হাতির পিঠে চড়ে যাতায়াত করতেন। অসংখ্যা লিপিতে হস্তীসৈন্যের উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গা রাষ্ট্রের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান ছিল হস্তী বল। তখনও খেদাপেতে হাতি ও হাতির বাচ্চা ধরা হ'ত। বুনো হাতিকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হ'ত এবং ধীরে ধীরে পোষ মানিয়ে নেয়া হ'ত।

পালকীরও ব্যবহার ছিল প্রাচীন বাংলায়। ত্রয়োদশ শতকের কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে একটু প্রচ্ছন্নভাবে হাতির দাঁতের তৈরী বহুদণ্ড যুক্ত পালকীর উল্লেখ রয়েছে। বল্লাল সেন এই ধরনের পালকীতে করে তাঁর শত্রুদের রাজলক্ষীদের নিয়ে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।[১৮]

ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র

মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতি ও নালন্দায় আবিষ্কৃত পুরাকীর্তির নিদর্শন এবং পুরাতন সাহিত্য থেকে বুঝা যায় যে উচ্চবিত্ত নগরবাসিরা ইট কাঠের তৈরী দালানে বসবাস করতেন। রাজ প্রাসাদ গুলোও ছিল ইট কাঠের তৈরী। সাধারণ গরীব নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরা মাটি খড়, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত ঘরে বসবাস করত। বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকের মত বাঁকানো অবস্থায় খড় বা পাতার ছানী দেয়া ঘর গুলো আজকের দিনমুজুরেদের ঘরের মতই দাঁড়িয়ে থাকত গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে।

ঘরের আসবাবপত্র হিসেবে ব্যবহারকৃত কিছু কিছু জিনিসের নমুনা বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থে ও ফলক চিত্রে পাওয়া গেছে। অবস্থাশালী লোকেরা প্রাচীনকালে সোনারূপার তৈরী থালাবাসন ব্যবহার করতেন। গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্তেরা কাঁসার তৈরী এবং গরীব লোকেরা সাধারণতঃ মাটির তৈরী থালাবাটি ব্যবহার করতেন। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এ ধরনের কিছু কিছু ভাঙ্গাচোরা মাটির পাত্র পাওয়া গেছে। মাটির খেলনা, মাটির পুতুল, ফুলদানী, কলস, বাটি থালাবাসন, পানপাত্র, মাটির জালা, ঘটি, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া ইত্যাদির কিছু কিছু চিহ্ন ও ছবি বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া ঘটি জলচকি, বই রাখার আসবাবপত্র ইত্যাদিরও ছবি এবং চিহ্ন উদঘাটিত হয়েছে। নানা সুদৃশ্য আলপনা আঁকা ও সোনার তৈরী বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত্রের বর্ণনা থেকে জানা যায়। এ সব তৈজষপত্র অবশ্য অবস্থাশালীদের বাড়িতেই পাওয়া যেত। ত্রোয়োদশ শতকের একটি লিপিতে লোহার জলপাত্রেরও উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণ সেনের রাজপ্রাসাদে অবশ্য সোনারূপার পাত্রেই খাওয়া দাওয়া করা হত।

নদনদী ও খাল নালার দেশে বাঁশ ও কাঠের শাঁকোর সাথে বাঙালীর পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই। ছোট-খাট খাল-নদী পারাপারের জন্য দুই তীরের স্থল পথকে যোগ করে দিত বাঁশের সাঁকো অথবা কাঠের পুল।[১৮]

অর্থনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রাচীন বাংলার একেবারে গোড়ার দিকের অর্থনীতি ছিল শিকার, কৌম-কৃষি এবং ছোট খাট গৃহ-শিল্প নির্ভর। দ্বিতীয় পর্বে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে কিছুটা উন্নত ধরনের চাষবাসের প্রচলন হলেও প্রায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল অর্থনীতির প্রধান বাহন। কিন্তু ৮ম শতক থেকে আদি পর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন ছিল বিশেষ ভাবে ভূমি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন বাংলায় রুজি রোজগারের উপায় ছিল মোটামুটি তিনটিঃ কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য।

সেকালের বিভিন্ন শিলালিপি ও সাহিত্যকর্মে উল্লেখিত ক্ষেত্রকর, কর্ষক বা 'কৃষক' ইত্যাদি থেকে সমাজে যে কৃষকের মর্যাদা ছিল তা অনুমান করা যায়। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমাজে কৃষকের বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং কৃষিই ছিল উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র। কৃষির প্রাচুর্য্যের কথা বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ-এ উল্লেখ করা হয়েছে। যুয়ান চোয়াঙের বিবরণে প্রাচীন বাংলার শষ্য সম্ভাবের বিবরণ পাওয়া যায়। কজঙলে ফসলের প্রাচুর্য ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে শষ্যসম্ভাব ও ফুল ফলের প্রাচুর্য ছিল। তাম্রলিপ্তির কৃষিকর্ম ছিল সমৃদ্ধ এবং সেখানে ফল, ফুলও যথেষ্ট পাওয়া যেত। কর্ণ সুবর্ণের অধিবাসীরা ছিল খুব ধনী। সেখানে কৃষি কর্ম ছিল নিয়মিত ঋতু অনুযায়ী এবং ফুল-ফলও প্রচুর পাওয়া যেত। এই বিবরণ থেকে বাংলার বিভিন্ন জনপদে কৃষির সমৃদ্ধি সম্পর্কে জানা যায়।[১৮]

বগুড়া শহর থেকে মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থিত মহাস্থানে পাওয়া এক শিলালিপিতে কর্জ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত লিপিতে এক রাজা পুণ্ড্রনগর ও তার আশে পাশের দুঃস্থ সংবর্গীয় বা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের কিছু অর্থ ও ধান কর্জ দেয়ার জন্যে মাহামাত্রকে (প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে) আদেশ দেন। খ্রীষ্টের জন্মের দুই/তিন শত বৎসর আগে ঘটনাটি ঘটেছিল। উক্ত শিলালিপিতে

আরও নির্দেশ ছিল যে এই ঋণের সাহায্যে ভিক্ষুদের বিপদ কেটে যাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে আবার সুখ ফিরে আসবে। সুদিনে তারা গণ্ডক মুদ্রা দিয়ে রাজকোষ এবং ধান দিয়ে রাজ কোষাগার ভরে দেবে।[১৮] আদিকাল থেকেই ধান উৎপাদনের প্রচলন ছিল এবং এখনো আছে। ধান উৎপাদনের জন্যে বৃষ্টির প্রয়োজন । আর তাই গ্রামবাসিরা আজও প্রার্থনা করে "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে"।

এদেশে ধান ছাড়া ইক্ষুও উৎপন্ন হত প্রচুর পরিমাণে। সন্ধ্যাকরনন্দী রামচরিতে উল্লেখ করেন যে আখের ক্ষেত বরেন্দ্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। বরেন্দ্র 'পুণ্ড্র' নামেও পরিচিত যার অর্থ হচ্ছে "গুড়" পুণ্ড্রদেশে যে আখের চাষ করত তাকে বলা হত পৌণ্ড্রক। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তিও বর্ণসূবর্ণে সর্ষের চাষ হত বলেও উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও আম, কাঁঠাল, খেজুর, কলা, মহুয়া ইত্যাদির উৎপাদন হত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। বরেন্দ্রে এলাচের চাষ হত। এছাড়া লঙ্কা, লবঙ্গ, তেজপাতা ও লাক্ষার চাষ হত বাংলার বিভিন্ন এলাকায়। বাঁশ এবং কাঠেরও চাষ হ্বত। এগুলো থেকে তৈরি আসবাবপত্রের ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রচুর অর্থাগাম হত। এগুলো দিয়ে ঘরবাড়িও তৈরী হত।

বঙ্গ দেশের গৃহ পালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব গৃহপালিত পশুর দুধ থেকে প্রচুর দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপন্ন হ'ত। "ঘি" তার মধ্যে অন্যতম ছিল। এ 'ঘি' (আজ্য) এর দেশকে বিদ্যাপতি আখ্যা দিয়েছিলেন "আজ্যসার গৌড়" বলে।

খৃষ্টীয় ১ম শতকে রচিত পেরিগ্লাস গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি বন্দরের কাছাকাছি কোথাও স্বর্ণখনি ছিল বলে উল্লেখ আছে। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে পৌণ্ড্রদেশে হীরার খনি ছিল বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পৌণ্ড্রক ও ত্রিপুর বা ত্রিপুরায় হীরক পাওয়া যেত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গড় মন্দারনে একটি হীরক খনি ছিল বলেও উল্লেখ আছে আইনই আকবরী গ্রন্থে।[১৮]

আসাম আর উত্তর বঙ্গের নদী বেয়ে কিছু কিছু সোনা ত্রিপুরা জেলার মধ্য দিয়ে বাংলায় আসত। এই সোনার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল। যদিও এগুলো খুব উচুঁ দরের স্বর্ণ ছিলনা। সুবর্ণ রেখা নদী, সোনারঙ, সোনারগাঁ সুবর্ণবীথি, সোনাপুর ইত্যাদি নামের সাথে হয়ত এইসব স্বর্ণের ইতিহাস জড়িত ছিল। ত্রিপুরার বনিকেরা ঢাকা থেকে টুকরো টুকরো সোনার বিনিময়ে নিয়ে যেত, প্রবাল, অয়স্কান্তমনি, সামুদ্রিক শঙ্খের মালা ইত্যাদি। গৌড়দেশে গৌড়িক নামে এক খনিজরূপা পাওয়া যেত বলেও কোটিল্য উল্লেখ করেছেন। একটি পুঁথিতে রাঢ় দেশের জঙ্গল খণ্ডে লৌহ খনির উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮]

খৃষ্টের জন্মের বহুকাল পূর্বেই বাংলার বস্ত্র শিল্পের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্পাসের চাষ, গুঁটি পোকার চাষ ছিল বাংলার অতি প্রাচীন কৃষির ঐতিহ্য। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে বড় শিল্প এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান আকর্ষণ। বঙ্গেও পুণ্ড্রে চার প্রকারের উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপন্ন হত। এগুলো হলোঃ দুকুল, পত্রোর্ন, ক্ষৌমও কার্পাসিক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বর্ণনা মতে বঙ্গের দুকুল ছিল নরম ও শাদা, পুণ্ড্রের দুকুল শ্যামবর্ণ, দেখতে মণির মত পেলব, কামরূপের দুকুল ছিল ভোরের সূর্যের মত। পেরিপ্লাস গ্রন্থে মসলিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কোপোলোর বিবরণে বাংলার তুলাবস্ত্র ও এর সমৃদ্ধ বাণিজ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পাটের কাপড় বা পট্টবস্ত্রের উল্লেখও পাওয়া যায় কোন কোন ভ্রমণ বৃত্তান্তে।

চিনি ছিল বাংলার আর একটি প্রাচীন উৎপন্য দ্রব্য। এ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও সিংহল, আরব ও পারস্যে এবং রোমে এদেশের চিনির কদর ছিল।

কারু শিল্পেও এখানের শিল্পিরা খুব দক্ষ ছিল। সেকালে সোনারূপার ও মনিমুক্তার গহনার খুব কদর ছিল। এগুলো বিদেশেও রপ্তানী হত। লৌহ থেকে উৎপন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি এবং যুদ্ধাস্ত্র যেমন দু'মুখী তরবারি ইত্যাদিও বিদেশে যেত।

প্রাচীন বাংলার মৃৎ শিল্পের বেশ সমৃদ্ধি ছিল। মাটির বড় বড় জালা, থালাবাটি, ঘটি, জলের পাত্র, রান্নার পাত্র, দোয়াত, প্রদীপ ইত্যাদি এদেশে ব্যবহৃত হত এবং বাহিরেও রপ্তানী হ'ত। এছাড়া হাতীর দাঁত থেকেও নানা জিনিস তৈরী হত বলে বিভিন্ন ভ্রমণ বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেকালে সুত্রধর বলতে স্থপতি, তক্ষনকার, খোদাইকার, কাঠ মিস্ত্রি সবাইকেই বুঝান হ'ত। গৃহস্থালীর ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, মন্দির, পাল্কি, রথ, গোযান, অশ্বযান, নৌকা, জাহাজ (বড় নৌকা) ইত্যাদি তৈরির জন্য এদের প্রচুর কদর ও সুখ্যাতি ছিল।

প্রাচীন বাংলায় গুবাক বা গুয়া বা সুপারি ও পানের উৎপাদন যেমন ব্যাপকছিল তেমনি এগুলোর বাণিজ্যিক প্রসারও ছিল। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে বঙ্গদেশের বনিকরা দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটে যেত এবং সুপারির বদলে মাণিক্য, পানের বদলে মরকত ও নারিকেলের বদলে শঙ্খ নিয়ে আসত।

বাংলাদেশের লবনও বিদেশে রপ্তানী হত প্রচুর পরিমাণে। এদেশের তেজপাতা, পিপুল এবং বস্ত্রের ব্যবসায়ে বণিকদের মোটা লাভ হত। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের এক গ্রন্থ থেকে জানা যায রোম সাম্রাজ্যে আধসের পিপুলের দাম ছিল ১৫ দিনার বা ১৫টি স্বর্ণমুদ্রা। এই সময়ে পশ্চিমের বনিকরা ভারত বর্ষ থেকে গড়ে বছরে প্রায় ১ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার রেশম ও কার্পাসের কাপড় নিয়ে যেত। এ বিপুল বাণিজ্যিক আয়ের একটা বিরাট অংশ আসত বাংলাদেশে।[১৮]

অর্থণেতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গোড়ার দিকে মুদ্রার প্রচলন ছিলনা। জিনিসের বদলে জিনিসের বিনিময় করারই রীতি ছিল। উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে লেনদেনের সুবিধের জন্যে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। খ্রীষ্টের জন্মের অনেক পূর্বেই বাংলায় মুদ্রার প্রচলন হয়। খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকে বাংলাদেশে "গণ্ডক" নামে এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। 'কাকনিক' নামেও আর এক রকমের মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। এ দুটো মুদ্রাই সোনার না রূপার তা জানা যায়নি। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গা-রাষ্ট্রের গঙ্গা-বন্দরে "ক্যালটিস" নামক মুদ্রার প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'কলিত' শব্দ থেকেই গ্রীকরা "ক্যালটিস" এ রূপান্তর করেছেন। এদেশে গুপ্ত আমলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। ৫ম থেকে ৭ম শতকে দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা ব্যবহার হত। মুদ্রার নিম্নতম মান ছিল 'কড়ি'। লক্ষণ সেনের নিম্নতম দান ছিল ১ লক্ষ কড়ি। উনবিংশ শতক পর্যন্ত এই কড়ি ব্যবহার হত। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির সাথে সাথে ৮শ শতক থেকে স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। পাল আমলে এদেশের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। কিন্তু সেন আমলে তাও উধাও হল। সেন আমলে কড়িই প্রধান মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত ছিল। এভাবে প্রাচীন বাংলায় দীর্ঘদিন থেকে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতির উপস্থিতি থাকলেও শেষের দিকে এসে তার দৈন্য দশা দেখা দেয়।

জ্ঞান চর্চাঃ শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

এই অঞ্চলে আর্য ভাষা আমদানী হবার বহু- আগেই খ্রীষ্টের জন্মের শত শত বছর পূর্বে থেকেই নানা নর গোষ্ঠিকে কেন্দ্র করে নানা ভাষার জটিল সংমিশ্রন শুরু হয়েছিল। কিন্তু

আদিবাসিরা গৃহবদ্ধ, পরিবার বদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করলেও তাদের লিপিবদ্ধ কোন ভাষা ছিলনা। এক যুগ অন্য এক অনাগত যুগের কাছে তার বিচিত্র খবরাখবর পৌছে দেয় যে লিপিবদ্ধ ভাষার মাধ্যমে সে লিখিত ভাষা লিপি আর্যপূর্ব অধিবাসীদের ছিলনা। ফলে আদিবাসিদের জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা আর শিল্প সাহিত্যের পরিসর সম্পর্কে আমাদের জানার উপায়ও খুব সীমিত। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগ এবং তার পরবর্তী কালের নিদর্শন সমূহ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে সে কালের আদিবাসিরা লিপিবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী না হলেও ব্যবহারিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উত্তম ধারক ও বাহক ছিল। তারা কৃষি কাজ, শিকার, ঘরবাড়ি তৈরী, সমাজবদ্ধ জীবন যাপন প্রনালী, পূঁজা, অর্চনা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল।

বরেন্দ্রভূমি বা পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য সম্রাজ্যের অনুর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে প্রথম দিকে বাংলার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে এবং পরে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলেও প্রাচ্য প্রাকৃত এবং উত্তর ও মধ্য ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোতধারা বয়ে যেতে লাগল। মধ্যভারতীয় নানা ধর্ম, বর্ণ পেশা ও কওমের জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলের জনস্রোতের সাথে মিশে যায়। আর্য পূর্ব ও অনার্য-অধিবাসিরা ক্রমশঃ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষা নেয়। ফলে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে আর্যপূর্ব ও অনার্য ভাষাগুলোকে নিঃশব্দে নিজের কুক্ষিগত করে ফেলে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত আমলের যে কটি লিপি পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। তখনও বাঙালী পণ্ডিতেরা হয়ত পুরোপুরি সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করে নিতে পারেননি কারণ সমসাময়িক আরও কিছু লিপি দৃষ্টে মনে হয় ওগুলো নেহাৎ কাঠখোট্টাগদ্যে লেখা। বস্তুত সপ্তম শতকের লিপিতে এসে দেখা গেল যে রীতিমত অলংকারময় কাব্যরীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। য়ুয়ান চোয়াঙ তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে সপ্তম শতকের পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞান চর্চার অনেক প্রশংসা করেছেন। সেকালে নালান্দার মহাবিহারের সংগে বাংলার জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিহারের মহাচার্য শীলভদ্র ছিলেন একজন বাঙালী। তিব্বতী ভাষায় অনুদিত তাঁর একটি গ্রন্থের নাম 'আর্য-বুদ্ধ-ভূমি ব্যাখ্যান।" সমকালের অন্য একজন বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত হলেন বরেন্দ্র ভূমির চন্দ্রগোমী। তিনি চান্দ্র ব্যাকরণ ও তার বৃত্তি বা টীকা রচনা করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এ সময়ের একজন বাঙালী দার্শনিক গৌড়ের গৌড়পদ রচিত "গৌড়পাদকারিকা" একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ সময়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বাঙালীরা বেশ উন্নতি করেছিল এবং এটা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও সমাদৃত ছিল। সপ্তম শতকের গৌড়রীতি নামে পরিচিত কাব্যরীতি সারা ভারত বর্ষে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। বানভট্টের হর্ষ চরিতে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। গৌড় রীতির পেছনে গৌড়জনের স্বাতন্ত্র্য বোধ, নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কারেরই প্রেরণা ছিল।

পাল আমলে বাঙালার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প, কলা ও জ্ঞান চর্চার বিপুল প্রসার ঘটে। বাংলার ইতিহাসে এ সময়টা ছিল এক সোনালী যুগ। এ সময়ে বেদ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরান, কাব্য প্রভৃতির ব্যাপক চর্চা ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। মন্ত্রী, আমলা এবং সেনানায়করাও এসব অনুশীলন করতেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধচার্যরা দেশী ও বিদেশী ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান করতেন। নবম ও দশম শতকে বাংলাদেশে সংস্কৃত, নানা রকমের প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ-এই তিন ভাষারই কম বে

প্রচলন ছিল। কিন্তু পণ্ডিতেরা তখনও শিল্পে, সাহিত্যে জ্ঞান বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায়, দর্শন বিচারে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন এবং প্রাকৃত জনের ভাষাকে ব্যাকরণ সম্মত, শুদ্ধ ও সংস্কৃত করে তাঁরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করতেন। এ সময়ে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপ। এ রূপই পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা ভাষা রূপে ধীরে ধীরে আত্ম প্রকাশ করে। ধর্মের তত্ত্বকথা সাধারণ লোকদের মনে সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সিদ্ধাচার্যেরা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মাগধী অপভ্রংশ ও শৌরসেনী অপভ্রংশ এই দুই ভাষাই ব্যবহার করতেন। প্রাচীন চর্যাগীতিগুলো আজও বাংলা ভাষার সেই অস্পষ্ট ঊষাকালের চিহ্নগুলো বহন করছে। এ পর্বে বেদ চর্চা সম্ভবতঃ সমাজের উচ্চ স্তরে ও পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ন্যায় শাস্ত্র ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত গৌড়ের অভিনন্দন এ সময়ে যোগবাশিষ্টের সংক্ষিপ্ত-সার রচনা করেন। এ যুগের দু'জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বৈয়াকরণিকের নাম হ'ল মৈত্রেয় রক্ষিত ও জিনেন্দ্র বুদ্ধি এবং একজন চিকীৎসা শাস্ত্র বিদের নাম হ'ল চক্রপানি দত্ত। শেষোক্ত জনের রচিত 'চিকীৎসা সংগ্রহ' ভারতীয় চিকীৎসা শাস্ত্রের একটি মৌলিক গ্রন্থ বলে পরিচিত।

এ সময়ের প্রশস্তি লিপিগুলোতে বাংলার কাব্য চর্চার রূপ ধরা পড়ে। ভট্টগুরমিশ্রের প্রশস্তি, ভোজ বর্মার বেলাব প্রশস্তি, কবি মনোরথের লেখা কমৌলিপিতে রক্ষিত নৌ-যুদ্ধের বর্ণনা ইত্যাদি কাব্য চর্চার বিশিষ্ট নিদর্শন। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" রচনা এ যুগের একটি উল্লেখযোগ্যকীর্তি। এর ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। "চণ্ডকৌশিক" নাটকের লেখক ক্ষেমীশ্বর এবং "কীচকবধ" কাব্যের লেখক নীতিবর্মার কর্মক্ষেত্রও বাংলাদেশে ছিল বলেই অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

একাদশ-দ্বাদশ শতকের আদি বাংলা হরফে লেখা "কবীন্দবচন সমুচ্চয়" নামে একটি কবিতা সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি নেপালে পাওয়া গেছে। মোট ১১১ জন কবির কবিতা এতে সংযোজিত হয়েছে যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী। গৌড় অভিনন্দ, ধর্মকর, বিনয়দেব, রতিপাল, শ্রীধরনন্দী, শুভংকর, বৈদ্যধন্য ও অপরাজিত-রক্ষিত এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের অগণিত গ্রন্থ (যার অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত) বৌদ্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির নিদর্শন। মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও বজ্রযান এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধযুগে বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বড় বড় ঘাঁটি ছিল জগদ্দল, সোমপুরি, (পাহাড়পুর), পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থান), বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, ত্রৈকুটক, পট্টিকেরক ইত্যাদি বিহার। প্রাচীনতম বৌদ্ধ বজ্রযানীদের মধ্যে শান্তিরক্ষিত নালান্দা মহাবিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। ইনি তিনটি পুঁথি ছাড়াও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সময়ের দু'একজন মহিলা কবির নাম, যেমন ভাবক বা ভাবদেবী ও নারায়নলক্ষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এসময়ের অরোরূহ বজ্র, কমলশীল, পদ্মসম্ভব ও শবরীপাদ বা শবরপাদ প্রভৃতি লেখকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে" লেখা শবরীপাদের দু'টি গান রয়েছে। রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন পুণ্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু নিয়ে গবেষণা করছিলেন তখন বরেন্দ্রের নাগবোধি তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন। নাগবোধি ১৩টি তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাল দেশের বিক্রমমনিপুরে বাঙ্গালী বৌদ্ধ মহাচার্য-দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয় গৌড় রাজপরিবারে। যৌবনে তিনি ছিলেন দুই জেতারী বৌদ্ধাচার্যের মধ্যে

জেষ্ঠ জেতারীর শিষ্য। দীপঙ্কর ধর্মপালের সময়ে বিক্রমশীল মহাবিহারের মহাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন তিব্বতের বৌদ্ধ রাজ পরিবার থেকে বার বার তিব্বত যাওয়ার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অবশেষে মাহাবিহারের অধিনায়ক আচার্য রত্নাকর থেকে অনুমতিনিয়ে দীপঙ্কর তিব্বত গমন করেন এবং থোলিং বিহার থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। আনুমানিক ১০৫৩ খ্রষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। বিক্রম শীল বিহারের অন্য একজন বিখ্যাত আচার্য ছিলেন গৌড়ের জ্ঞানশ্রীমিত্র।

উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহারের দু'জন স্বনামধন্য পণ্ডিত ছিলেন দানশীল ও বিভূতি চন্দ্র। দুজনই অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। অনেকের মতে লুইপাদ ও মাননাথ একই ব্যক্তি। সমস্ত পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের হঠযোগ, যোগিনী কৌলধর্ম ও নাথধর্মাবলম্বীদের কাছে লুই পাদ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথ হলেন আদি গুরু। এসব সাধক পুরুষগণের সাধন-কেন্দ্র ছিল বাংলার বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার গুলো। প্রত্যেক বৌদ্ধ বিহারে নিজস্ব গ্রন্থাগারও ছিল।

প্রাচীন বাংলা ভাষা

নবম-দশক শতক নাগাদ বাংলাদেশে সংস্কৃত ছাড়াও অন্য দু'টো ভাষা প্রচলিত ছিল। এগুলো হল শৌরসেনী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়-বঙ্গীয় রূপ। এ যাবৎ জানা তথ্যানুসারে ইহাই প্রাচীনতম বাংলা ভাষা। কিন্তু এই প্রাচীন ভাষার নজীর আমাদের হাতে খুববেশি নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চারটি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলো হ'ল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' 'সরহপাদের দোঁহা,' 'কাহ্নপাদের দোঁহা' ও 'ডাকাণব'। প্রথমটি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নমুনা, শেষের তিনটি শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা। "চর্যাচর্যবিণিশ্চয়" বা চর্যাগীতির গানগুলোতে যে বাগভঙ্গি ও ব্যাকরণ-রীতি ব্যবহার করা হয় তা পুরোপুরি বাংলা। এরমধ্যে এমন অনেক শ্লোক আছে যা আজও প্রবাদ হিসেবে লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়। নিম্নের উদাহারণ চর্যাগীতির ভাষা ও ভাবের নিদর্শন বহন করে।

"তিন নাচ্ছুপই হরিনা ন পানী।
হরিনা হরিনীর নিলয় ন জানী।
হরিনী বেলে তঅ সুন হরিনা তো
এ বনচ্ছাড়ি হোহু ভান্তো।"[১৮]

অর্থাৎ ভয়ে হরিণ তৃণ ছোঁয়না। জলও খায়না। হরিণ জানে না হরিণীর কোথায় আস্তানা। হরিণী বলেঃ শোনো হরিণ, এ বন ছেড়ে ভ্রান্ত হয়ে চলে যাও।

দ্বাদশ শতকে সেন বর্মণ পর্বে সংস্কৃত চর্চার নূতন ঢেউ ওঠে। হরিবর্মা, বল্লালসেন, লক্ষনসেন এই তিন রাজার আমলেই প্রচুর গ্রন্থ রচনা করা হয়। ধর্ম শাস্ত্র ও মীমাংশার প্রচুর চর্চা হয় এ যুগে। ভবদেব ভট্ট ছিলেন ধর্মশাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। রাজা বল্লাল সেন রচনা করেন- আচার সাগর, প্রতিষ্ঠা সাগর, দানসাগর ও অদ্ভুদ সাগর এই চারটি গ্রন্থ। লক্ষনসেন শেষোক্ত অসম্পূর্ণ গ্রন্থের রচনা শেষ করেন সর্বানন্দের টীকা সর্বস্ব গ্রন্থটি বাংলার বিশেষ গৌরব। এতে প্রচুর বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়।

দ্বাদশশতকের শেষ দিকের ও ত্রয়োদশ শতকের কিছু কাব্য এবং নাট্য কাব্য ও নাটক প্রাচীন বাংলার শেষ পর্বের উল্লেখ যোগ্য অবদান। সেকালের বাঙালী কবিমনের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত সদুক্তি কর্ণামৃতে কাব্য গ্রন্থটিতে। এর সংকলয়িতা সম্পাদক হলেন লক্ষন সেনের অন্যতম মহাসামন্ত শ্রীবুটদাসের পুত্র শ্রীধরদাস। এতে ৪৮৫ জন কবির রচনা স্থান পেয়েছে যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী। বাঙালী কবিদের মধ্যে শরন, ধোয়া, গোবর্ধন, উমাপতিধর ও জয়দেব ছিলেন সেন রাজসভার পঞ্চরত্ন-কবি। সম্ভবতঃ সভাকবি উমাপতিধরই ছিলেন দেওপাড়া প্রশস্তির ও সাধাইনগর লিপির রচয়িতা।

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতকের দিকে বাংলায় কাব্য নাট্য জাতীয় লেখা এবং নাটক লেখার প্রচলন ছিল। এই সময়ের নাটকের কয়েকটি নাম যেমন, কীচকভীম, প্রতিজ্ঞাভীম, শর্মিষ্ঠা পরিণয়, সত্যভামা, কেলি-রৈবর্তক উষাহরণ, দেবী মহাদেব, উর্বশী-মর্দন, নলবিজয়, মায়া মদালসা, উন্নত চন্দ্রগুপ্ত, মায়া কাপালিক, মায়া শকুন্ত, জানকী রাঘব, রামানন্দ, কেকয়ী ভারত, অযোধ্যা ভারত, কলিবধ, রামবিক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নাচ-গান-ছবি

চর্যাগীতিতে উল্লেখিত বিভিন্ন রাগের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় প্রাচীন বাংলায় উন্নত ধরনের সঙ্গীত চর্চার প্রচলন ছিল। বিভিন্ন রাগের নাম গুলোর মধ্যে পটমঞ্জরী, গবড়াগউড়া, অরু, গুর্জরী-কাহ্ন গুজরী, দেবক্রী, দেশাখ, কামোদ, ধনসী-ধানশ্রী, রামক্রী, বলাক্রী-বরাড়ী, শবরী, মল্লারী, মালসী, গবুড়া, বঙ্গাল, ভৈরব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লোচন পণ্ডিতের "রাগ তরঙ্গিনী" ও শাঙ্গদেবের "সঙ্গীত রত্নাকর" সঙ্গীত শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ।

বুদ্ধ নাটক ও তুম্বরু নাটকের উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু কিছু প্রাচীন পুঁথিতে। এর সাথে যে নাচ, গান এবং বাজনাও থাকত তারও উল্লেখ রয়েছে। নাচের নানা লোকায়ত রুপের আভাস পাওয়া যায় পাহাড়পুর আর ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকে। সমাজের ওপরতলার লোকদের নাচ সম্পর্কে জানা যায় বিভিন্ন পাথর ফলকে খোদাই করা দেবদেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব-নারী ও মন্দীর নর্তকীর নাচের ভঙ্গিমা থেকে।

চতুর্থ শতকে তাম্রলিপ্তিতে যে ছবি আঁকার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফাহিয়েনের লেখায়। এছাড়া আঁকা ছবির যে সব নমুনা পাওয়া গেছে তার সবই একাদশ-দ্বাদশ শতকের। প্রায় প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপি চিত্র-তালপাতায় কিংবা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি সাজাবার জন্যে আঁকা হয়েছিল। ছোট হলেও এ গুলোর ভাব, পরিকল্পনা, রঙ, রেখা সব কিছুই সুবৃহৎ প্রাচীর চিত্রের মত। এ যাবৎ এরূপ ২০/২২ খানা পুঁথি চিত্র পাওয়া গেছে। পুঁথি চিত্রে যে সব রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে হরিতালের হলুদ, খড়িমাটির সাদা, গাঢ়, নীল, প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুরের লাল এবং সবুজ। কোথায়ও গাঢ় কোথায়ও পাতলা রঙ রয়েছে। চিত্র বিন্যাসের রীতিতে আছে ভাস্কর রীতির অনুসরণ। মূল প্রতিমা পার্শ্ব প্রতিমা গুলোর চেয়ে বড় এবং তার পেছনে রয়েছে অলংকৃত পটভূমি।

প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য নিদর্শনের অবশেষ এখন খুব অল্পই বিদ্যমান রয়েছে। সংরক্ষণের অভাবে অনেক গুলোই নষ্ট হয়ে গেছে। স্তুপ, বিহার ও মন্দিরই এসব স্থাপত্যের নিদর্শন। পাথরের

দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে ইট, মাটি, কাঠ দিয়ে তৈরী এসব নিদর্শন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। তবুও ময়নামতি, মহাস্থান ও পাহাড়পুরে এখনো অনেক নিদর্শন প্রাচীর বাংলার স্মৃতি বহন করছে।[১৯]

উপসংহার

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের রূপরেখা বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন সময় ছাড়া অধিকাংশ সময়েই রাষ্ট্র নায়কগণ ছিলেন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। সম্ভবতঃ কৃষি নির্ভর সমাজে বৃহৎ জনগোষ্ঠী যাঁরা নগর সভ্যতার বাহিরে বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত তাদের সমাজ ছিল অনেকটা স্বনির্ভর, জীবন ছিল মাটির টানে বাঁধা, তাই রাজনীতির খবর হয়ত তারা ততটা রাখতনা। অন্যপক্ষে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সুদীর্ঘ লেজুড়যুক্ত আমলাতন্ত্র ও নগর সভ্যতার জালে এমনভাবে আবদ্ধ ছিলেন যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার সময়ও হয়ত তাঁরা পেতেন না। এছাড়া তাঁদের ভোগ ও বিলাস বহুল জীবনযাপন পদ্ধতিও হয়ত এজন্যে অনেকটা দায়ী। এহেন পরিস্থিতিতে এক রাজা যায় আর অন্য রাজা আসে এবং মধ্যখানে জনগণ শুধু দর্শকের ভূমিকাই পালন করে। এর ফলে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ বৈদেশিক আক্রমণ, শাসন ও শোষণের শিকার হয়েছে। প্রচীন যুগ মধ্যযুগের জন্যে যে দুর্বল রাষ্ট্রীয় ভিত্তি রেখ গেল তা পরবর্তীকালে মধ্য যুগের শেষ পর্যায়ে এসে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কলহের কারণে আরও দুর্বল হয়ে পড়ল এবং এর ফলে সুদীর্ঘ সময়ের জন্যে বাংলাকে পরাধীনতার গ্লানি বহন করতে হ'ল।

নির্দেশনাপঞ্জী

১। এফ, আর,খান, *সমাজ ইতিহাস*। শিরিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা- ১, ১৯৭৪ ইং, পৃঃ- ১৩।

২। এফ, আর, খান, -ঐ- পৃঃ- ১৯।

৩। শাহানারা হোসেন *Everyday life in the Pala Empire*. Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1968, p. p. 43-69.

৪। নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*। লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা-১২, অগ্রহায়ন, ১৩৮২, পৃঃ- ৭২।

৫। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালীর ইতিহাস*। মুক্তধারা, ১৯৮৩, পৃঃ- ২২-২৪।
ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এর *বাঙালীর ইতিহাস* সংক্ষেপিতাকারে। নবতর তথ্য ও সংযোজিত হয়েছে এ বইটিতে।

৬। অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা- ৯, ১৯৭৬, পৃঃ- ২৩।

৭। অতুল সুর, -ঐ- পৃঃ- ২৪।

৮। অতুল সুর- -ঐ- পৃঃ- ২৫।

৯। বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় "প্রাগৈতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক কালের বঙ্গীয় সভ্যতা" *ইতিহাস*। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, পৃঃ- ১১৮।

১০। Shahnara Husain, "Glimpses of village life of Early Medieval Bengal," *The Rajshahi University studies*. Rajshahi University, January, 1970 p. p. 89-100.

১১। Razia Sultana, "Bengali women in the Medieval Socio cultural Milieu", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol-V. Institute of Bangladesh studies, Rajshahi, 1981, p. 4.

১২। শাহানারা হোসেন, "সদুক্তি কর্নামৃতের বাংলার গ্রাম," *ইতিহাস*। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবন, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ৩৪-৪১)

১৩। Shahanara Husain "The position of Women in Pre-Muslim Society (700-1200 A.D.)." *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*. Vol-1, No- 1, Institute of Bangladesh studies, Rajshahi, 1976, p. 155.

১৪। নৃপেন্দ্র গোস্বামী, *ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ*। নিউএজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ- ১৩৩।

১৫। নৃপেন্দ্র গোস্বামী, *বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি*। নিউএজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ- ১৩৭।

১৬। নীহার রঞ্জন রায়,-ঐ-, পৃঃ- ১৯৭।

১৭। নৃপেন্দ্র গোস্বামী, *ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ*। পৃঃ- ৫৩।

১৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, -ঐ-, পৃঃ- ৩৬।

১৯। এই আলোচনায় ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের *বাঙালীর ইতিহাস* আদি পর্ব, সুভাস মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস, এবং ডঃ অতুল সুরের বাঙলার সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থ তিনটির বিশেষ সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া স্থান বিশেষে তাঁদের বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

বই

১। নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* আদিপর্ব। লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা-১২, অগ্রহায়ন, ১৩৮২।

২। অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা- ৯, ১৯৭৬ ইং।

৩। শাহানারা হোসেন, *Everyday life in the pala Empire*. Asiatic society of Pakistan, Dhaka, 1968.

৪। এফ, আর, খান, *সমাজ ইতিহাস*। শিরীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১, ১৯৭৪ ইং।

৫। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালীর ইতিহাস*। (ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব অনুসরনে সংক্ষেপিত), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩ (দ্বিতীয় সংস্করন)

৬। ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহীম, ডঃ আব্দুল মমিন চৌধূরী, ডঃ এ, বি, এম, মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮১ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৭। নৃপেন্দ্র গোস্বামী, *বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি*। নিউএজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, জৈষ্ঠ, ১৩৭৫।

৮। ... ., *ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ*। -ঐ-, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

৯। শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রের, *গোড়লেখমালা*। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।
১০। ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ, *বাংলার ইতিহাস*। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
১১। অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী। খান ব্রাদার্স এণ্ড কোঃ, প্যারীদাস রোড, ঢাকা- ১, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
১২। Promode Lal Paul. *The Early History of Bengal.* The Indian Research Institute, Calcutta. 1346 B. S.
১৩। T. W. Thys-Davids. *Buddhist India.* Susil Gupta (India) Ltd. 1957.
১৪। রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী, *সমুদ্র গুপ্তের শাসনাবলী*। সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৮১, বঙ্গাব্দ।
১৫। Hugh Tinker, *South Asia A Short History*. Frederick A. Praeger publishers, New york, 1966.
১৬। *Cambridge History of India,* Vol. V and VI.
১৭। Prof. Promatha Nath Dutta, *Glimpses into the History of Assam.* Vidyodaya Library Private Ltd. Calcutta, 1964.
১৮। নারায়ন চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *মৌর্য্যযুগে ভারতীয় সমাজ*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫।
১৯। শ্রী সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন*। এ, মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
২০। R. C. Majumdar (ed), *The History of Bengal.* Vol-1, Hindu Period, The University of Dhaka, 1976.
২১। খান সাহেব আবিদ আলী খান, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ ইং, (চৌধূরী শামছুর রহমান অনুদিত)।

সাময়িকী/জার্নাল

২২। শাহানারা হোসেন, "সদুক্তি কর্নামৃতের বাংলার গ্রাম" *ইতিহাস*। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
২৩। ..... "Glimpses of village life of Early Medieval Bengal," *The Rajshahi University studies.* Jan. 1970.
২৪। ..... "বরেন্দ্রীর বৌদ্ধকীর্তি", *বরেন্দ্র একাডেমী পত্রিকা*। **১ম বর্ষ**, দ্বিতীয় ও ৩য় সম্মেলন সংখ্যা, ১৩৮৫।
২৫। ..... "The position of women in pre Muslim society (700-1200 A.D.)," *The Journal of the Institute of Bangladesh studies.* Vol- 1 No-1. 1976.
২৬। Razia Sultana, "Bengali women in the medieval socio cultural milieu" *The Journal of the Institute of Bangladesh studies.* Vol- V 1981.
২৭। বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "প্রাগৈতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক কালের বঙ্গীয় সভ্যতা," *ইতিহাস*। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

২৮। সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, "কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র", *ইতিহাস*। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

২৯। ডঃ আব্দুল মমিন চৌধুরী, "দেব পর্বত", *ইতিহাস*। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৩০। ওয়াকিল আহম্মদ, "বাংলা সাহিত্যের গৌড় যুগ", *ইতিহাস*। ইতিহাসা পরিষদ পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৩১। আব্দুল আজিজ, "বরেন্দ্রভূমির প্রত্মতাত্ত্বিক সম্পদ", *ইতিহাস*। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

৩২। A. F. Salah Uddin Ahmed, "Aspects of Bengali society and social thoughts: Tradition and Transformation," *The Dhaka University Studies*, Vol-XXXVII, part-A, Dec. 1982.

৩৩। Abdul Momin Chowdhury, "Aspects of Ancient Bengal Society and Socio-Religious Attitudes: Tradition And Continuty," *The Dhaka University Studies*, Vol-XXXVII, part-A, Dec. 1982.

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক সংকট ও উত্তরণের পন্থা

মুঃ সোলায়মান মণ্ডল

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক সংকট ও উত্তরণের পন্থা

১.০ সূচনা ও সারাংশ

সমষ্টিগত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় আয়-ব্যয় ও আমদানী-রপ্তানীর ক্রমবর্ধমান ব্যবধান প্রবণতা দেশটির সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক সংকটের একটি অতি সংকীর্ণ রূপরেখা মাত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজটিত কারণে ভোগ, বিনিয়োগ ও আমদানী চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিবিধ কারণে ভোগ্যপণ্য, মূলধনী ও মাধ্যমিক দ্রব্য এবং রপ্তানীযোগ্য পণ্য ও সেবা সামগ্রী সমুহের যোগান প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘ-মেয়াদী সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। মূলতঃ অতীতের ত্রুটিবিচ্যুতি ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা বর্তমান সংকটের মূল কারণ। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া একদিকে উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে জনসংখ্যা ও চাহিদা বৃদ্ধির মধ্যে একটি দীর্ঘকালীন প্রতিযোগিতা। প্রথমটির ত্বরণ এবং দ্বিতীয়টির স্তিমিত করণ-দেশটির উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মৌল কৌশল। এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিছুটা স্তিমিত করা গেলেও, পণ্য ও সেবা সামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ক্রমাগতভাবে ক্ষুন্ন হয়ে চলেছে। এমটা কেন হচ্ছে তার উপলব্ধি, কার্যকরী নীতিমালা নির্ধারণ এবং সার্থক বাস্তবায়নের মধ্যেই বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক সংকট উত্তরণের পন্থা সমূহ নিহিত রয়েছে।

২.০ জনসংখ্যা কার্যক্রমের সীমিত সফলতা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্তিমিত করণ বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হলেও দেশটির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা উক্ত লক্ষ্য দ্রুত অর্জনের জন্য সহায়ক নয়। উল্লেখ্য, দেশটির প্রায় তিন চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র ও নিরক্ষরতায় নিমজ্জিত। স্বাধীনতা উত্তরকালে বিগত দু'দশকে জনজীবনের নিরাপত্তা চরম হুমকির সম্মুখীন। সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বরাবরই ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধির সংগে সংগে ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানী, হত্যাকাণ্ড লুটতরাজ ইত্যাদি ঘটনার অপঘাত সামপ্রতিকালে বেড়েই চলেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের তৎপরতা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি। চরম দারিদ্র, ব্যাপক নিরক্ষরতা এবং জানমালের নিরাপত্তাহীনতা ছোট পরিবার গঠনের মনমানসিকতা লালন পালনের জন্য অনুকূল নয়। সংগত কারণেই বিগত দু'দশকে পরিবার পরিকল্পনাখাতে বিরাট

অংকের অর্থব্যয় সত্ত্বেও জনসংখ্যা হ্রাস কার্যক্রম যথেষ্ট সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে, ব্যাপক নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত জনসংখ্যা কার্যক্রম সফলতা অর্জন করতে অপারগ।

৩.০ উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি

এবার উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংকোচনের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। জনসংখ্যা হ্রাস কার্যক্রমের সীমিত সফলতার প্রেক্ষাপটে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১ কৃষিখাত অনুৎপাদনশীল প্রযুক্তি এবং অনুন্নত বাজার ব্যবস্থার আন্তঃক্রিয়া

প্রথমেই আমরা কৃষিখাতের দিকে নজর দেই। কৃষি বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত; কেননা এদেশের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ লোক কৃষির ওপর সরাসরি নির্ভরশীল, শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ জাতীয় আয় কৃষি থেকে উদ্ভুত এবং দেশটির শিল্প ও রপ্তানী অনেকাংশে কৃষি নির্ভর অথবা কৃষি সহায়ক। অথচ বাংলাদেশের আবাদ যোগ্য জমির গড়পড়তা উৎপাদন এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারী চাষীরা বড়চাষীদের চেয়ে অধিকতর দক্ষ; কিন্তু সে দক্ষতার মানদণ্ড সনাতনী উৎপাদন পদ্ধতি ও কৌশল। এমন দক্ষতা উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশক নয়, কেননা বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য সেটা সহায়ক নয়। একর প্রতি এবং মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিজীবিদের আয় বৃদ্ধি কৃষি উন্নয়নের প্রধান মানদণ্ড। উচ্চফলনশীল বীজ ও সার, পানি, বিদ্যুৎ জ্বালানী, তেল (পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদি), সেচ যন্ত্র, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিঋণ প্রভৃতি উপকরণের সুষ্ঠু সরবরাহ এবং বাজার প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে কৃষিজীবি তথা গ্রামীন জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব। কিন্তু আর্থ-সামাজিক প্রশাসন কাঠামো, বিশেষ করে, সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চক্র, কৃষিউন্নয়নের জন্য বস্তুনিষ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের সদিচ্ছা কার্যকরী করেননি।

৩.২ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ও অনুন্নয়ন

বাংলাদেশের কৃষিযোগ্য স্থলভাগ জনসংখ্যার তুলনায় অতি সীমিত। অন্যদিকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীনালা, খালবিল, এমনকি সমুদ্রের উপকূলভাগ বালি ও পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাবার ফলে দেশটির আবাদ যোগ্য জলভূমির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে সীমিত হয়ে আসছে। এমন অবস্থায় জল ও স্থলভাগের সংরক্ষণ এবং উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি বাংলাদেশের দারিদ্র্য মোচন, তথা অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণের মৌলিক উপায়। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, জল, স্থল, আলো, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের রুজী রোজগারের মৌলিক উপকরণ। বাংলাদেশের জন্য বক্তব্যটি আরো বেশী প্রযোজ্য। বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা অত্যন্ত সদয় অন্তরে এবং অকৃপন-হস্তে এদেশের উল্লেখিত উপকরণগুলো দিয়েছেন। তবু দেশটি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। কিন্তু কেন? প্রশ্নটির অত্যন্ত সহজ সরল ও সংগত উত্তর হলোঃ বাংলাদেশের সরকার, সমাজ

তথা জনগণ প্রাকৃতিক উপকরণ গুলো সংরক্ষণ, আহরণ এবং রূপান্তর ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেনি। কেন পারেনি?

পারেনি এই জন্য যে, বাংলাদেশের বস্তুগত ও মানবীয় মূলধন সংগঠনে কোন সার্থক প্রচেষ্টা নেই। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বস্তুগত মূলধন, উন্নয়নকারী শ্রমিক ও উদ্যোক্তার বিকাশ এখনো অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে বিরাজ করছে। মানবসম্পদ বাংলাদেশের সবচেয়ে পর্যাপ্ত সম্পদ; অথচ মানবসম্পদ উন্নয়নে দেশটির ব্যর্থতার তুলনা সাম্প্রতিক বিশ্বে অত্যন্ত বিরল।

৪.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন কঠিনতম সমস্যা

উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিরাট জনসংখ্যা দেশটির জন্য একটা দায়ভার,একটা অভিসম্পাৎ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং সকল সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে গণ্য করে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা হলো মানবীয় মূলধন সংগঠন ও কার্যকরীকরণ। মানবীয় মূলধন সংগঠনের বস্তুগত মূলধনের গুরুত্ব অবশ্যই বর্ণনার অপেক্ষা করে না। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়নে অর্থযোগানদাতা সকল দেশই শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করবেন, বস্তুগত মূলধন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক নয়; প্রধান নিয়ামক মানব সম্পদ, যার দৃষ্টান্ত সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, কোরিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশ। মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যতীত পরিবেশগত ভারসাম্য উন্নত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব নয়; কেননা সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মত এর একটা উৎপাদন অপেক্ষক রয়েছে, যার মূলে রয়েছে মানবীয় ও বস্তুগত মূলধন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীভূত এবং উচ্চতর শিক্ষায় ও প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক বিষয়ের সংগে ব্যবহারিক বিষয়ে সমান গুরুত্ব আরোপ, উন্নয়ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি মূখ্য দিক। এটি অবহেলা করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

৪.১ বাংলাদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পরিবেশ ও গুণগতমান

দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অঙ্গনে মানব সম্পদ উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, লক্ষ্য ও আদর্শ প্রকটভাবে অনুপস্থিত। অফিস, শ্রেণী কক্ষ এবং আবাসের জন্য ব্যয় বহুল অট্টালিকা বাংলাদেশের প্রতিটি উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান ও ব্যবহারিক মূল্য অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক, পরিবেশ অসহনীয়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উন্নয়ন বিমুখ এবং লক্ষ্য ও আদর্শ বিভ্রান্ত। এগার কোটি মানুষের দেশে শতকরা ২৫ ভাগ লোকের বেশীর ভাগই নামমাত্র শিক্ষিত; কিছু অংশ অপশিক্ষিত। নিরক্ষরতা ও নামমাত্র শিক্ষার চেয়ে অপশিক্ষাই বোধ হয় আরো বেশী নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। নৈরাজ্য, বিভ্রান্তি এবং অকল্যাণকর শিক্ষাই অপশিক্ষা। সমাজ জীবনে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন বাদ', অর্থনীতিতে প্রকৃতিবাদ' অথবা 'সামাজিক সাম্যবাদ', রাষ্ট্রীয়জীবনের প্রতারণামূলক চাতুর্যবাদ (Machiavellism), বিজ্ঞান জগতে জড়বাদী নৈরাজ্যবাদ (Materialistic anarchism), মহাজগতের সৃষ্টি ও পরিচালনায় একক অদৃশ্যশক্তির নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নাস্তিকতাবাদ, মূল্যবোধহীন অনুসন্ধান ও পরীক্ষণবাদ (Non-normative research and experimentalism) এবং

সর্বোপরি বর্নাশ্রয়ী আধিপত্যবাদ অথবা যে কোন প্রকার মানবতা বিরোধী মতবাদ অপশিক্ষার প্রধান উৎস। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোর অঙ্গন সমুহে অপশিক্ষার বিষবৃক্ষ অরণ্যের আয়তন লাভ করছে। করবেনা কেন? বাংলাদেশের সংবিধানের সবগুলো মৌল নীতি অপশিক্ষাজনিত অপব্যাখ্যায় করুণ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। গণতন্ত্রের অন্তরালে ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী স্বৈরতন্ত্র কাজ করছে; মার্কসবাদী লেলিনবাদী সমাজতন্ত্রের সমাধি রচিত হওয়ায় তৃতীয় বিশ্বের সকলদেশে অদৃশ্যহস্তের শক্তিতে পরিচালিত বাজার অর্থনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। এখন সেখানে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' নীতি এবং প্রকৃতিবাদের আদলে রচিত বাজার অর্থনীতি নির্মমভাবে কার্যকরী করা হবে। বাংলাদেশী 'জাতীয়তাবাদ' 'দ্বিজাতি' তত্ত্বের প্রেতাত্মা বলে সনাক্ত করার প্রয়াস অব্যাহতভাবে চলছে; 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ধর্মবিমুখতা অথবা ঔদাসীন্যের সমার্থক মনে হয় এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরই নিকট। তার ফলেই আবির্ভাব ঘটেছে ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দ্বন্দ্ব। ধর্মনিরপেক্ষ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দল ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অবসান চায়। অন্যদিকে ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে জাতীয়তাবাদের মূল উপাদান বলে মনে করে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সংবিধানের চার মৌলনীতি পরস্পর বিরোধী চিন্তা ধারার আবর্তে আটকা পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে সংবিধানে সর্বসম্মত মৌলনীতি সন্নিবিষ্ট করতে সচেষ্ট হতে হবে এবং সেগুলোর প্রতি অনড় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৪.২ উন্নয়ন সংস্কৃতির উপাদান ও নির্মাণ কৌশল

সংবিধানের মৌলনীতির সঠিক প্রয়োগ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নৈরাজ্য নিরসনের উত্তম পন্থা। গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকারের উত্থান-পতন, মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুষ্ঠু নীতিমালা অনুসরণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা ভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন, বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট নিরসনের এবং সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তীতা ও স্থিতিশীলতা অর্জনের এবং সংরক্ষণের একমাত্র পথ। সে পথ বন্ধুর হতে পারে; কিন্তু সেটা সংঘাত, ঘাতপ্রতিঘাত পূর্ণ হোক, রক্তরঞ্জিত হোক এমনটা আদৌ কাম্যনয়। সংবিধান সংরক্ষণ, বস্তুগত ও মানবীয় মূলধন সংগঠন এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী খাতে অপচয় ও ব্যয় সংকোচন, উৎপাদন ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতাবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট নিরসন, পরিবেশগত ভারসাম্য অর্জন ও সংরক্ষণ, বর্ষা মৌসুমের উদ্বৃত্ত পানি সম্পদ সংরক্ষণ এবং শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকট নিরসনের জ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্বেষণ, সমাজের ধনী ও স্বচ্ছল পরিবার সমূহ কর্তৃক পারিবারিক জীবনে ভোগবিলাসে সংযম অবলম্বন এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ, ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে সামাজিক স্বার্থ সংস্থাপন, জবাবদিহিমূলক সরকার, প্রশাসন, সামাজিক আচার আচরনের উন্মেষ ও বিকাশ ইত্যাদি বিষয় উন্নয়ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। উন্নয়ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংগঠনে সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

সমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ উন্নয়ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নয়ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সৃষ্টিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলশ্রুতি হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়; বরং দুটো বিষয়কে একই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৫.০ সরকারী-বেসরকারী খাতের সমন্বয়

সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী খাতে আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরত্বপূর্ণ দিক। ১৯৭০ দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের বেসরকারী শিল্প খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পদযাত্রা শুরু হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারীখাত সংকট মুক্ত নয়। ইতিপূর্বে কৃষি, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প বেসরকারী খাতের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে মধ্য আয়তন এবং বৃহদায়তন শিল্প খাতও বেসরকারী উদ্যোগের আওতায় আনা হয় এবং কিছু কিছু রাষ্ট্রায়াত্ত্ব শিল্পকারখানা বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষিখাতই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎখাত আগেও ছিল, এখনো রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে এবং সরকারী ও আধাসরকারী চাকুরীর সুযোগ অত্যন্ত মন্থরগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং পরিবহন বেসরকারী উদ্যোগের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

১৯৮৬ সালের সংশোধিত শিল্পনীতিতে সরকারী, বেসরকারী ও যৌথ উদ্যোগে স্থাপনযোগ্য শিল্পসমূহ চিহ্নিত করা হয়। সরকারী খাতে সংরক্ষিত শিল্পঃ

১) অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অনুভূতিশীল (Sensitive) প্রতিরক্ষা যন্ত্রাদি;
২) বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণ;
৩) সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সীমারেখার অভ্যন্তরে উদ্ভিদ রোপন ও যান্ত্রিক আহরণ;
৪) দূরযোগাযোগ (বন্টন ও মেরামত ব্যতীত);
৫। বিমান পরিবহন (মালামাল ব্যতীত) এবং রেলপথ;
৬) আনবিক শক্তি এবং
৭। নিরাপত্তামুদ্রণ ও মুদ্রাপ্রস্তুত।

সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত শিল্প ব্যতীত সকল শিল্প বেসরকারী খাতের আওতাধীন করা হয়। তবে যে সমস্ত খাতে বিনিয়োগ আবশ্যক অথচ বেসরকারী খাত বিনিয়োগে উৎসাহী নয় সেগুলো সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হতে পারে এবং পরবর্তীকালে যথাসময়ে বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করা যেতে পারে। নিরুৎসাহ সৃষ্টির জন্য শিল্পনীতির সংযোজনী 'বি'তে একটি নিরুৎসাহিত শিল্প তালিকা এবং উৎসাহ সৃষ্টির জন্য সংযোজনী 'এ'তে একটি অগ্রাধিকার তালিকা দেয়া হয়।

৫.১ রুগ্ন ও জ্বরাগ্রস্ত শিল্প সমস্যা

বেসরকারী খাতে ব্যাপক শিল্পোদ্যোগের অবকাশ এবং অনুপ্রেরণামূলক বস্তুগত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, বেসরকারীখাতে স্থাপিত বেশীরভাগ শিল্প রুগ্ন ও জরাগ্রস্ত; নামসর্বস্ব

অস্তিত্ববিহীন শিল্পের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। রুগ্ন, জরাগ্রস্ত, নামসর্বস্ব ও অস্তিত্ববিহীন অধিকাংশ শিল্প রাষ্ট্রায়াত্ত্ব ব্যাংক ও অর্থযোগদানদাতা সংস্থা থেকে প্রকল্প ঋণ (অনেক ক্ষেত্রে চলতি ঋণ) সংগ্রহ করে। ১৯৮২ সালের শিল্পনীতিতে চলতি ঋণের ব্যবস্থা ছিলনা; ১৯৮৬ সালের শিল্পনীতিতে প্রকল্প ও চলতি ঋণ প্রদান সমন্বিত করা হয় এবং তৎপূর্বে স্থাপিত শিল্পকারখানা সমূহকে ঋণ লাভের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু তৎসত্বেও ফলাফল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। মেয়াদ উত্তীর্ণ ও আদায়যোগ্য শিল্পঋণের পরিমাণ হাজার কোটি টাকা।

৫.২ শিল্পখাতের রুগ্নতা ও জরাগস্ততার কারণ

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, শিল্প ও ব্যাংকিং খাতে এমন নৈরাজ্যের কারণ কি? বিষয়টি একটি জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পূর্বে রাষ্ট্রায়াত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন সেক্টর করপোরেশনের লোকসানজনিত কারণে উদ্ভুত বাজেট ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে বিরাট অংকের ঋণ মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থ যোগানের জন্য নির্ধারিত সুদের হার ব্যাংকগুলোর আমানতের ওপরে প্রদেয় সুদের হারের চেয়ে কম হওয়ায় রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পুনঃ অর্থযোগান অধিক সুবিধেজনক বিবেচনা করেন। এমতাবস্থায় উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেক্টর করপোরেশন সমুহের লোকসানের পরিমাণ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকায়, তাদের নিকট ব্যাংক ঋণের পরিমাণও বাড়তে থাকে।

১৯৭৫ সালের পর কৃষি ও শিল্পখাতে বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি হেতু বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্ত তহবিল বিভিন্নখাতে বিনিয়োগের জন্য সরকারী চাপ প্রয়োগ করা হয়। কিছুটা অনভিজ্ঞতা, প্রকল্প মূল্যায়নে ত্রুটিবিচ্যুতি, প্রকল্পঋণের শর্তাবলী, উদ্যোক্তাতার আচার আচরণ, শিল্পখাতে তুলনামূলক সুবিধার সংকোচন প্রভৃতি বিষয় প্রধানত শিল্পখাতে সংকটের সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতা উত্তর কালের প্রথমদিকে বেসরকারী খাতে পুঁজি বিনিয়োগে সর্বোচ্চ সীমা বিদ্যমান থাকায় এবং শিল্পকারখানা জাতীয়করণের আশংকা অনুভূত হওয়ায় শিল্পঋণের চাহিদা তেমন ছিলনা। ফলে শিল্পে অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব ছিল। সর্বোপরি প্রকল্প মঞ্জুরী প্রক্রিয়ায় এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক অংশ গ্রহণকারী মূলধন যোগান প্রক্রিয়ায় ব্যাংকে দূর্নীতি অনুপ্রবেশ করায় প্রকল্প মূল্যায়ন প্রহসনে পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তা নির্বাচন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আর্থিক লেন-দেনের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হতো। ফলে প্রকৃত প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তা নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে উদ্যোক্তা কর্তৃক শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতি ওভার ইনভয়েসিং এবং বন্ধকী সম্পত্তির অধিমূল্যবান (Overvaluation) করার ফলে প্রকল্প ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্পঋণ 'কিস্তি' মোতাবেক পরিশোধ করার ক্ষমতা ও মনমানসিকতা অধিকাংশ উদ্যোক্তা হারিয়ে ফেলেনা। প্রকল্পঋণ বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধ করার শর্ত বিদ্যমান থাকায় ঋণের আসল ও সুদ মুদ্রার অবমূল্যায়ন জনিত কারণে ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে এবং ঋণের দায়ভার সকল উদ্যোক্তার নিকট অসহনীয়

প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু যুক্তিসংগত কারণে কোন প্রকল্প সত্যিকার লোকসানের সম্মুখীন হলে সাধারণ সুদ ও দণ্ডসুদ মওকুফের শর্ত শিল্পনীতিতে উল্লেখ থাকায় সকল উদ্যোক্তাই কমবেশী লোকসানের ভাবমূর্তি সৃষ্টিকরার জন্য প্রকল্প ঋণ পরিশোধ করতে অনীহা প্রকাশ করতে থাকেন।

অন্যদিকে নানাবিধ কারণে শিল্পখাত কালক্রমে তুলনামূলক ব্যয়সুবিধে (Comparative Advantage) ক্রমাগতভাবে হারাতে থাকে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশী মুদ্রার বিরাট অবমূল্যায়ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রপ্তানী বাণিজ্যের ভর্তূকি ও আমদানী বিকল্পশিল্পের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার সমার্থক ছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশের আমদানী-রপ্তানী শিল্প সে সমস্ত সুবিধে কাজে লাগাতে পারেনি; বরং আমদানী ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে পরিণত হয়। ১৯৭৩ সালে তেলের মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি হেতু আমদানী ব্যয় ও উৎপাদন খরচ অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় রপ্তানী এবং আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন নীতি অনুসরণ এবং সেই সংগে অনুন্নয়ন, ভোগবিলাস দ্রব্যাদি আমদানী নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক হয়।

দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার শুরু থেকেই আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি উন্নয়ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দ্রুত অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ ছিল। কারণ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালে অর্জিত টাকা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো এবং রপ্তানী বাণিজ্যের চেয়ে আমদানী বাণিজ্য অধিকতর লাভজনক হওয়ায় সে টাকা বিধিসম্মত এবং বিধি বহির্ভূত আমদানী বাণিজ্যে নিয়োজিত করা হলো। ফলে আমদানী রপ্তানীর ব্যবধান ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর যখন বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা রহিত করা হলো এবং বৈদেশিক সাহায্যের আওতায় বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলো, তখন শিল্পায়নে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলো অনেক দূর এগিয়ে গেছে বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে। এই দৌড় প্রতিযোগিতায় সুবিধাজনক যাত্রা শুরু যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত প্রবেশ এবং সুনাম অর্জন ও হারজিৎ নির্ধারণের একটি প্রধান নিয়ামক।

৫.৩ শিল্পখাতের রুগ্নতা ও জরাগ্রস্ততা দূরীকরণ একটি কঠিন কার্যক্রম

রপ্তানী-আমদানীর ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ বারবার টাকার অবমূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু উৎপাদন কাঠামোর বিভিন্নখাতের উৎপাদন অপেক্ষকের অনমনীয়তা (Rigidity) এবং অস্থিতিস্থাপকতার (Inelasticity) দরুণ মুদ্রার অবমূল্যায়ন শিল্পখাতে তুলনামূলক সুবিধা সৃষ্টি করার পরিবর্তে তুলনামূলক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পখাতের তুলনামূলক অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে চোরাকারবার স্বাভাবিকভাবেই একটি

লাভজনক কারবারে পরিণত হয়। সমাজের সবচেয়ে স্বচ্ছল বেশীর ভাগ পরিবার ব্যাংকিং ও শিল্পখাতকে সাদা ও কালো বাজারে মূলধন যোগানের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। এখন চোরাকারবার বন্ধের মাধ্যমে আমদানী বিকল্প শিল্পখাতে পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার কৌশল কার্যকরী করতে হলে দীর্ঘ মেয়াদী সফল নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক আইনের গতিরোধ সম্ভব নয়; অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চোরাকারবার প্রতিরোধ করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন বস্তুগত ও মানবীয় মূলধন সংগঠন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয় সংকোচন, উপকরণের অব্যাহত যোগান, উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ (যেমন সিমেন্ট, ইস্পাত, জ্বালানী তেল, বিদ্যুৎ, পানি, কাঁচামাল, মাধ্যমিক দ্রব্য ইত্যাদি)। উৎপাদন, যোগান ও বন্টনে অনিয়ম, দূর্নীতি, অব্যবস্থাপনা সাফল্যজনকভাবে দূরকরা প্রয়োজন। বলতে দ্বিধা নেই, বিষয়গুলো বলার চেয়ে করা অনেক কঠিন। কিন্তু সেই কঠিন বিষয়গুলোকে সহজতর করে তোলা দেশ ও জাতির জন্য একটি জীবন-মরণ সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সে সংগ্রামে জয়লাভ অত্যাবশ্যক।

৬.০ পুঁজি সংগঠনের গুরুত্ব, প্রক্রিয়া ও কৌশল

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সংকট নিরসনে বস্তুগত ও মানবীয় মূলধনের গুরুত্ব ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার মূলধন সংগঠন প্রক্রিয়ার জটিলতা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত অত্যাবশ্যক।

উন্নয়ন অর্থনীতিতে মূলধনের সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। আর্থিক মূলধন, বস্তুগত মূলধন, পরিবেশগত মূলধন ছাড়াও মানবীয় মূলধন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান। ভোগ ও বিনিয়োগ সম্পদের চাহিদার সৃষ্টি করে। কিন্তু ভবিষ্যতের ভোগ বর্তমান সময়ের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে চাহিদা সৃষ্টির জন্য নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য দূরীকরণ অত্যাবশ্যক। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী খয়রাতি সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশী পছন্দনীয় পন্থা, কারণ পন্থাটি বেকার মানবগোষ্ঠীকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে নিরুৎসাহিত করে। কিন্তু কর্মসূচীটিকে বস্তুগত মূলধন সংগঠনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় কর্মসূচীটি নিছক ভোগবৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। কর্মসূচীটিকে যেমন দুর্নীতিমুক্ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে পুঁজি সংগঠনের নীল নকসার। ভূমি ও পানি সম্পদের সংরক্ষণ কল্পে নদী-নালা, খাল-বিল খনন, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ; পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনাঞ্চল সৃষ্টি ও উদ্ভিদ রোপণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড নীল নকসার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফলে ভোগ ও পুঁজি সংগঠন একই সঙ্গে সম্ভব।

কোন কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুঁজি সংগঠন শুধুমাত্র শ্রমদ্বারা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ যেখানেই পুঁজি সংগঠনে শ্রম, মূলধন, উদ্যোগ ও প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে (এবং সকল অর্থনৈতিক পুঁজি সংগঠনে এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে) সেখানেই ভোগ বৃদ্ধি ও পুঁজি সংগঠন একই সঙ্গে সম্ভব নয়। আর্থিক ও বস্তুগত সঞ্চয় উৎপাদন ও বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদক দ্রব্যে রূপান্তর করা হয় এবং সে জন্য ভোগ বিলাস সংকোচন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

৬.১ সরকারী খাতে পুঁজি সংগঠন

একটা মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারী খাতে পুঁজি সংগঠনের জন্য সরকারের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচন অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ। একই কথা সেরকারী খাতে পুঁজি সংগঠন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যেখানে সরকারী খাত লাভজনকভাবে চালানো হয়, সেখানে সরকারী আয় বেসরকারী আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেহেতু বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেইহেতু সরকারী আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় (রুদ্ধ অর্থব্যস্থায়) সরকারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মুনাফা এবং বেসরকারী খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারী ভোগ ব্যয়ের সংগে সম্পৃক্ত। বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়, বাংলাদেশে ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর অধিকাংশ আয়ের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশী করে থাকেন। একটি উন্নয়নশীল দেশের সরকার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশটি প্রকৃত জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ২/৩ ভাগ সঞ্চয় করবে এটা শুধু জাতীয় কলঙ্ক নয়, জাতীয় পাপ। যে দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক নিরঙ্কুশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, সে দেশের মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত এমনকি বিত্তবান শ্রেণী জাতীয় পুঁজি সংগঠনে নগণ্য অংশগহণ করবেন এবং অসহায় সরকার পরিকল্পনার দলিল দস্তাবেজ নিয়ে সাহায্য দাতা দেশগুলোর দরবারে কাকুতি মিনতি জানাবেন, সে দেশের সরকার ও জনগণের আন্তর্জাতিক ফোরামে কোন মান মর্যাদা থাকে না, থাকতে পারে না। বাংলামাতার এমন লজ্জা নিবারণের জন্য তার সন্তানদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকার ও জনগণ সচেষ্ট হলে, বাইরের সাহায্য ও সহযোগিতা অবশ্যই মিলবে। সরকার ও জনগণকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। উন্নয়ন আদর্শ এবং সংস্কৃতিবিহীন একটি জাতিকে উন্নত করা সরকারের একক দায়িত্ব নয়। কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী খাতে পুঁজি সংগঠনের দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ (শতকরা ৭/৮ ভাগ) সরকারের রাজস্ব খাতে যায় এবং তার সিংহভাগ আসে পরোক্ষ কর থেকে। প্রত্যক্ষ করের অংশ বৃদ্ধি ও পরোক্ষ করের অংশ হ্রাস জনকল্যাণমুখী কর কাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষ করের প্রশাসন কাঠামো দুর্নীতিপূর্ণ, কাজেই উহা যে অনুৎপাদনশীল খাত সে কথা কারো অজানা নয়। দুর্নীতিপরায়ণতা আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের একচেটিয়া কারবার নয়, সরকারের অন্যান্য রাজস্ব প্রশাসন সম্বন্ধে একই মন্তব্য প্রযোজ্য। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, শুধুমাত্র আয়কর ও শুল্ক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় দ্বিগুণ হওয়া সম্ভব। সরকারী আয়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে এবং ভোগ বিলাসে ব্যয়িত হওয়ার প্রবণতা সম্বন্ধে করদাতাগণ অত্যন্ত সজাগ; মূলতঃ সেইজন্যই জনগণ কর প্রদানে কারচুপির আশ্রয় নিয়ে থাকে। রাজস্ব আদায়ে এবং রাজস্ব ব্যয়ে শৃংখলা রোধের এবং উন্নয়নকামীতার পরিচয় দিলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রবণতা অবশ্যই দেখা দেবে।

৬.২ বেসরকারী খাতে পুঁজি সংগঠন ও ব্যাংকিং ব্যবসায়

বেসরকারী খাতে পুঁজি সংগঠনের জন্য মুদ্রা ও মূলধন বাজারের সুবিন্যস্ত সংগঠন এবং নীতিমালা নির্ধারণ একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতা পূর্বকালে শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যতীত বাদবাকী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বেসরকারী মালিকানায় ছিল। চাহিদা অনুযায়ী ঋণনীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক আমানত সংগ্রহ নীতি তখনকার দিনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯৭১-৮১ দশকের প্রথম ভাগে চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংকিং নীতি প্রচলিত ছিল, যদিও সবগুলো ব্যাংকিং এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যায়। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান সমূহের শাখা প্রশাখা শহর-নগরের গণ্ডী ছাড়িয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার নীতি গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে যোগান অগ্রগামী ঋণনীতির সংযোজন করা হয়। পদক্ষেপটি সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থেই গ্রহন করা হয়; এবং প্রাথমিকভাবে ব্যাংক ঋণ ও আমানত উভয়ই দ্রুত বৃদ্দি পায়। কিন্তু মাত্র অর্ধ দশকের ব্যবধানে ব্যাংকগুলো অনাদায়ী ঋণ সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত হয় এবং ঋণদান প্রক্রিয়ায় জামানত গ্রহণ নীতি কড়াকড়ি ভাবে আরোপ করা হয়। ফলে ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে অর্থ স্থানান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। ১৯৮০-৯০ দশকে মুদ্রা বাজারে বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার হয় এবং মূলতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সমূহের বাস্তব মুনাফা অর্জনের ব্যর্থতাই বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবী কার্যকর করতে উৎসাহ যোগায়। মুদ্রা বাজারে বেসরকারী ব্যাংকের পদচারণা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটুকু অবদান রেখেছে এবং জাতীয় কল্যাণ সমুন্নত করতে কতটুকু সাহায্য করেছে তা একটা গবেষণার বিষয়। তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে অনুমান করা যায় একমাত্র গ্রামীন ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য বেসরকারী ব্যাংক গ্রামীন উন্নয়নে নেতীবাচক অবদান রেখেছে; কেন না বেসরকারী ব্যাংকগুলোর কর্মকাণ্ড মূলতঃ নগর ও শহর ভিত্তিক এবং বাণিজ্যকেন্দ্রিক। প্রতিষ্ঠালগ্নে বেসরকারী ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পদযাত্রা শুরু করে; এখন শহর, নগর এবং প্রধান কারবারী কেন্দ্রগুলোতে তারা রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যাপারটি আসলে প্রভাবশালী পারিবারিক স্বার্থ অন্বেষী মহল বিশেষের কারসাজি ছিল। এখন বেসরকারী ব্যাংকগুলোকে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোর সংগে একযোগে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করানো উচিত। জনগণের অর্থে পারিবারিক স্বার্থ সমুন্নয়ন প্রক্রিয়া সরকার আর কতদিন বরদাশত করবেন সেটাই প্রশ্ন।

৬.৩ মুদ্রা বাজারে বিরাজমান অবস্থা

মূলধনী বাজারে বিরাজমান সংকট সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পূর্বে মুদ্রানীতি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য প্রয়োজন। বাংলাদেশে মুদ্রা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেনা। "টাকায় টাকা আনে" যেমন সত্য কথা 'টাকাওয়ালা ব্যাংক ঋণ পায়' তেমনি একটি সত্য কথা। কিন্তু সরকারী বেসরকারী ঋণগ্রহীতা টাকা দিয়ে কোন কাজ করবেন এবং সে কাজ করছেন কিনা সেটা যাচাই করার দায়দায়িত্ব অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'কাগুজে' মুনাফার ভিত্তিতে 'বোনাস' বিতরণের নীতি বাংলাদেশে বহুদিন প্রচলিত ছিল। সাম্প্রতিককালে বিশ্ব ব্যাংকের চাপের মুখে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোকে বাধ্য করেছে তাদের সম্পদ 'ভাল', 'মন্দ' ও 'সন্দেহজনক' শ্রেণীতে

সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করতে। পদক্ষেপটি অর্থব্যবস্থায় শৃংখলা এবং দায়িত্বপূর্ণ মুদ্রা সম্প্রসারণে অবদান রাখবে সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীতে লক্ষ্য করা গেছে সরকার নিজেই অযৌক্তিক অর্থব্যবস্থার সাধ্যাতীত সংস্কার, পুনর্নির্মাণ, সম্প্রসারণ অথবা সে কার্যসাধনে অঢেল অর্থ ব্যয় করেছেন এবং ফলশ্রুতিতে মুদ্রা সরবরাহ সম্প্রসারণের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমনটা হওয়া দুঃখজনক।

বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। গ্রামাঞ্চলের শতকরা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পরিবার ভূমিহীন। কাজেই উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ থেকে বঞ্চিত। গ্রামাঞ্চলে অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ গ্রামীণ দারিদ্র্যরোধে এবং দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের শহর-নগরের দিকে নিরর্থক আগমনের প্রবণতা রোধ করবে। কিন্তু সেজন্য ঋণদান ও বাজার প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। গ্রামীণ অকৃষিখাতে নিয়োজিত পরিবার গুলো গ্রাম ও শহরের মহাজনদের হাতে জিম্মী। সরকার অল্পসুদে এবং বিনাজামানতে ঋণদানের ব্যবস্থা করলেও, ঋণের অর্থে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল ও মাধ্যমিক দ্রব্য সংগ্রহের জন্য তারা মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং শুধুমাত্র ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর এবং অল্পসুদে ঋণদানের পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। হয়তো সেই জন্যই রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলো গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এমনকি গ্রামীণ ব্যাংক যে হারে ঋণদান করে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তার চেয়ে অনেক কম সুদে রপ্তানী বাণিজ্যে ঋণ দিতে হয়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন থেকে যায়, ব্যাংকগুলো কাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, "তেলা মাথায় তেল" দেয়ার নীতি চিরন্তন। কিন্তু কল্যাণমূখী অর্থ ব্যবস্থায় এমনটি হবার কথা নয়।

৬.৪ মূলধন বাজারের বিদ্যমান অবস্থা

এবার মূলধন বাজারের সংকটের দিকে নজর দেয়া যাক। প্রকৃতপক্ষে, পণ্য বাজার, উপকরণ বাজার, অর্থ বাজার এবং মূলধনবাজার একই সূত্রে বাঁধা, অন্যান্য বাজারের সংকট মূলধন বাজারকে প্রভাবিত করবে সেটাই নিয়ম। মূলতঃ পণ্য ও উপকরণ বাজারের সংকট অর্থ বাজার এবং মুল বাজারের সংকট গভীরতর করে তুলেছিল। মূলধন বাজার অত্যন্ত সংবেদনশীল, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সকল পদক্ষেপ কমবেশী মূলধন বাজারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ও উন্নয়নে অর্থযোগাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো মূলধনবাজারের প্রধান অঙ্গ। মোটা অংকের অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হলোঃ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি-ইনভেষ্টমেন্ট করপোরেশন অফ বাংলাদেশ) সবগুলো ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনাদায়ী ঋণের সমস্যায় জর্জরিত। সংঘবদ্ধ ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্তমান সরকার খেলাপী ঋণগ্রস্থদের নাম প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে পুরস্কার মূলক ব্যবস্থা-শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত সাধারণ সুদ এবং ১০০ ভাগ পর্যন্ত দণ্ডসুদ মওকুফের ব্যবস্থা-গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তবু শতকরা ২৫ ভাগ সুদ এবং ১০০ ভাগ মূলধন একযোগে আদায় সম্ভব হলে উন্নয়নে অর্থযোগানে সাশ্রয় হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সম্ভাবনা আদৌ প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হয়নি।

মূলধন বাজারের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ হলো শেয়ার ও ঋণপত্র বাজার (Share and Bond market)। ঢাকা স্টক একচেঞ্জ চালু হওয়ার পর শেয়ার বাজারে লক্ষ্য করা যায় অস্বাভাবিক তেজীভাব। মূলতঃ কৃত্রিম উপায় অর্থাৎ হিসাব ধারী (Account Holder) দের নিজস্ব বিনিয়োগের তিনগুণ পর্যন্ত ঋণ দানের ব্যবস্থার মাধ্যমে শেযার বাজারে চাহিদার সৃষ্টি করা হয়। সেই অস্বাভাবিক দরে শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে অনেকে অনেক মুলধনের মালিক হয়েছেন। অন্যদিকে "অতি অগ্রগামী" ষাঁড়ের দল (Bulls) দ্বিতীয়তম বাজার (Secondary Market) থেকে চড়া দামে শেয়ার কিনে মূলধন লাভের অপেক্ষায় ছিলেন। পরবর্তীকালে ঋণসৃষ্টির মাধ্যমে চাহিদা সৃষ্টি শেয়ার বাজারে সমস্যা ও সংকট সৃষ্টির কারণ হওয়ায় ঋণ কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হয়। ফলে চাহিদা সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং শেয়ার বাজারে মন্দার কালো মেঘ জমতে থাকে। এখন শেয়ার ও ঋণ পত্র অনেকটা সঙ্কটমুক্ত। তবু শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত অনেক কোম্পানীর শেয়ার এখনো পানির দামে বিক্রয় হচ্ছে। কিনে নিচ্ছেন সুচতুর ডিলারগণ ও কোম্পানী মালিকের নিজের লোকজন। নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করেন না; ঘোষণা করলেও লভ্যাংশ পত্র পাঠাতে অনেক দেরী করেন। অনেক কোম্পানী মুনাফার অর্থ রাইট শেয়ার (Right Share) বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানীর কাজে লাগাচ্ছেন।

সরকারের কতিপয় পদক্ষেপ শেয়ার বাজারকে অনেকটা তেজী করেছে। বিগত অর্থ বছরে আই,সি,বি শেয়ার মিউচুয়াল ফাণ্ড ইউনিট সার্টিফিকেট এবং কোম্পানী সমূহের শেয়ারের লভ্যাংশের ওপর কতকগুলো কর ও লেভী আরোপ করা হয়েছিল যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ শতাংশ। অন্য দিকে মেযাদী আমানতের সুদ আয়ের ওপরও অন্যরূপ কর ও লেভী আরোপ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় সরকারী সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য একক ও যুগ্ম নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সর্বোচ্চ সীমাও বর্ধিত করা হয়েছে। এমন অবস্থায় অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই মুদ্রাবাজার এবং শেয়ার বাজার থেকে বিপুল অংকের মূলধন সরকারী সঞ্চয়পত্রে স্থানান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। বিগত অর্থবছরের আই,সি,বি ইউনিট সার্টিফিকেট ও মিউচুয়াল ফাণ্ড খাতে আশানুরূপ লভ্যাংশের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় প্রত্যাহার নিরুৎসাহিত হয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ টাকা রূপান্তরযোগ্য করায় বিদেশী পুঁজির শেয়ার বাজারে অংশগ্রহণ সহজতর হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের শেয়ার ও ঋণপত্র বাজারে অভূতপূর্ব তেজী ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো উৎসাহব্যঞ্জক লভ্যাংশ ঘোষণা করতে ব্যর্থ হলে মূলধন বাজারে আবার হতাশার কালো ছায়া নেমে আসতে পারে।

৭.০ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেন খাতের সংকট নিরসন

উল্লেখিত দুটোখাতই দীর্ঘমেয়াদী সংকটে নিমজ্জমান। সঙ্কটের মূলকারণ আর্থিক এবং অনার্থিক। আর্থিক কারণ হলোঃ সঞ্চয়ের চেয়ে বেশী বিনিযোগ; সরকারী-বেসরকারী উভয়খাতেই ব্যাপারটি বাস্তবসত্য। একমাত্র বৈদেশিক অনুদান এবং ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমেই আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের ব্যবধান দূর করা হয় প্রতি বছর। একটি অদ্ভুত লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলোঃ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৈদেশিক অনুদান ও সাহায্য

প্রাপ্তির সংগে বিপরীত সম্পর্ক। ব্যাপারটি ইংগিত দেয় যে, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি।

৭.১ রপ্তানী বানিজ্য

বাংলাদেশের আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপক ব্যবধানের প্রকৃত কারণ হলোঃ উৎপাদন ও রপ্তানী কাঠামোর অনমনীয়তা এবং অস্থিতিস্থাপকতা। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের রপ্তানীর প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কৃষি অথবা, কৃষিনির্ভর পণ্য। পাট, পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, চামড়া প্রভৃতি সনাতনী পণ্য। পরবর্তীকালে কাগজ, মৎস (চিংড়ি সহ), চামড়াজাত দ্রব্য, তৈরী পোষাক, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, রাসায়নিক সার, শাকসব্জী, মসলাদি রপ্তানী পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭০ সালের প্রথমভাগে এবং শেষের দিকে জ্বালানী তেলের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বিদেশী দক্ষ, আধাদক্ষ মানব সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দেরীতে হলেও বাংলাদেশ বিশ্ববাজারের মানব সম্পদের চাহিদার একটি ক্ষুদ্র অংশের যোগান দিতে সমর্থ হয়; ফলে বৈদেশিক অর্থ প্রেরণ দেশটির রপ্তানী আয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে আবির্ভুত হয়।

রপ্তানী বাণিজ্যের উৎস প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের রপ্তানী উৎপাদন কাঠামো মূলতঃ স্থলভূমি, জলভূমি এবং মানব সম্পদ নিবিড়। তার অর্থ এই নয় যে, উৎপাদিত উপকরণের কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই। মৌলিক উপাদান ও উপকরণগুলো চিহ্নিতকরণ সংরক্ষণ এবং আহরণের জন্য সরকারী বেসরকারী উদ্যোগ, লাগসই প্রযুক্তি এবং বস্তুগত মূলধন (উৎপাদক পণ্য) অত্যাবশ্যক। স্থলভূমি ও জলভূমি অবিনশ্বর সম্পদ নয়, যেমন নয় মানব সম্পদ। ভূমি, জল ও স্থল সম্পদের পরিবেশগত গুণগত সংরক্ষণ, উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন চাহিদামূখীকরণ, অনুৎপাদনীয় সম্পদের অপচয়রোধ, উৎপাদনীয় সম্পদের যোগান বৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি উদ্যোগ, শ্রম, পুঁজি ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মধ্যে রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় নিহিত রয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যতীত প্রাকৃতিক সম্পদ সনাক্তকরণ ও আহরণ সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতির দক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ। রপ্তানী বাণিজ্য উৎপাদন এবং বিপনন প্রক্রিয়ার একটি অংশ বিশেষ। বিষয় দুটি পরস্পর নির্ভরশীল; উভয় ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিপনন অধিকতর দক্ষ শ্রম, উদ্ভাবনশীল উদ্যোগ, লাগসই প্রযুক্তি এবং আর্থিক ও বস্তুগত মূলধনের উপর নির্ভরশীল। পোষাক শিল্প, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্সশিল্প, বৈচিত্রময় কুটির শিল্প, চারুকারু শিল্প বাংলাদেশের মানব সম্পদ নিবিড় রপ্তানীমূখী প্রতিশ্রুতিশীল রপ্তানী খাত। কিন্তু শিল্পগুলো অনেকাংশে আমদানী নির্ভর,অথচ আমদানী উপকরণের সংগে সংযোজিত মূল্যের অনুপাত তেমন উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের জন্য আমদানীকৃত উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য সহজেই দেশীয় বাজারে প্রতিযোগিতয় অবতীর্ণ হয় এবং দেশীয় শিল্পকে পঙ্গু করে ফেলে। মুদ্রাস্ফীতি এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি জনিত কারণে রপ্তানীর লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বেশী প্রতিযোগিতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। এমন প্রবণতা প্রতিরোধ অত্যন্ত জরুরী।

তুলনামূলক ব্যয় সুবিধার ক্রমাগত সংকোচন রপ্তানী বৃদ্ধির একটি প্রধান অন্তরায়। অযৌক্তিক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা সংহারের মোক্ষম হাতিযার। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক।

৭.২ আমদানী বাণিজ্য

আমদানী-রপ্তানী আয়ের দীর্ঘকালীন ব্যাপক ব্যবধান আমদানী-ব্যয় সংকোচনের নীতি বলবৎ করার শক্তিশালী সংকেত দেয়। কিভাবে আমদানী ব্যয় সংকোচন করা যায় সেটাই বড় প্রশ্ন। বাজার অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, স্বদেশী পণ্যের তুলনামূলক দাম কমানো এবং বিদেশী পণ্যের তুলনামূলক দাম বাড়ানো আমদানী সংকোচনের মূখ্য পন্থা। বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমদানী হ্রাস এবং রপ্তানী বৃদ্ধির সনাতনী পন্থা। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পন্থাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য? খানিকটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় এ দেশের জন্য পন্থাটি যথেষ্ট গ্রহণ যোগ্য নয়। বাংলাদেশের উৎপাদন ও রপ্তানী অনেকাংশে আমদানী নির্ভর। খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানী তেল, পেট্রোল ও পেট্রোল-জাতদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার ভোগ্য পণ্য, মাধ্যমিক দ্রব্য এবং চূড়ান্ত উৎপাদক পণ্য এ দেশের আমদানীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মুদ্রার অবমূল্যাযন উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখে।

উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নাজুক পরিস্থিতিরি সম্মুখীন। শুল্ক এবং পরিমাণগত বাধা নিষেধ এমতাবস্থায় অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় আমদানী ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে। মুদ্রার অবমূল্যায়ন সফল করে তুলতে হলে রপ্তানী চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং বাণিজ্য শর্ত বিদেশী ক্রেতাদের অনুকূলে আনা প্রয়োজন। কিন্তু বাণিজ্য শর্তের প্রতিকূলতার মুখে রপ্তানী আয় অক্ষুন্ন রাখতে হলে রপ্তানী যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শুধু একের চেয়ে বেশী নয়, তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী হওয়া দরকার। অন্যদিকে রপ্তানী ব্যয় কমাতে গেলে আমদানী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে বেশী হওয়া যেমন দরকার, তেমনি দরকার আমদানী বিকল্প শিল্পে উৎপাদন অপেক্ষকের নমনীয়তা এবং অনুকূল স্থিতিস্থাপকতা সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের আমদানী চাহিদা যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক নয় অর্থাৎ একের চেয়ে বেশী নয়। এমতাবস্থায় পরিকল্পিতভাবে আমদানী বিকল্প শিল্প নির্বাচন এবং দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, মনুষ্যসম্পদ এবং উৎপাদিত ও উৎপাদন যোগ্য উপকরণের যোগান বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

৮.০ উপসংহার

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির যথার্থতা স্পষ্টই প্রতীয়মান। জাতীয় আয়ের চেয়ে জাতীয় ব্যয়ের বাড়তি এবং তার ফলশ্রুতিতে আমদানী ব্যয়ের বাড়তি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সংকটের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মাত্র। এদের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপাদান অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণ অত্যাবশ্যক, সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি হিংসা প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থপতার পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত। এখানে উন্নয়ন

সংস্কৃতি বিকাশের কোন সর্বজন সম্মত মতাদর্শ নেই। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি বাংলাদেশের সংস্কৃতির কোন পরিচয় খুঁজে পান না। সেই জন্য তাঁরা সারাবিশ্বে সেটা অনুসন্ধান করে বেড়ান। বলা বাহুল্য, অনুসন্ধানটি নিরর্থক। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ কোন সংস্কৃতি-সংকটের আবর্তে নেই। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল এবং কোন কোন গোষ্ঠির বুদ্ধিজীবি সংকটটি সৃষ্টি এবং লালন পালন করেন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী দলগুলো এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন যন্ত্র বাংলাদেশী জাতীয়তার আদর্শে যথেষ্ট আস্থাবান হওয়া সত্বেও এদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে সক্ষম হননি। "তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে" বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের নিকট একটি শ্বাশ্বতবাণী। কিন্তু ধর্মবিমুখতা একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবির নিকট সংস্কৃতির মুখ্য উপাদান মনে হয়। তাঁদের নিকট আইনস্টাইন পরবর্তী বিজ্ঞানের আলো এখনো পৌছায়নি, তাঁরা এখনো নিউটনের বিজ্ঞান যুগেই বাস করছেন এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজগঠনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন। অন্যদিকে ধর্মান্ধতা আর এক শ্রেণীর লোকের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক সংকট নিরসনের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে নৈরাজ্য কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন। অন্যথায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত সরকার কোন অবদান রাখতে পারবেনা। কাজেই সরকার ও জনগণ সাবধান হবেন, সচেতন হবেন এবং উন্নয়ন কৃষ্টি সৃজনে সচেষ্ট হবেন, এটাই কাম্য।

তথ্য ও বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ও সাময়িকী

1. Bangaldesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh, Statistical Year Book, 1992, Dhaka, 1993.
2. Bangladesh Economic Association, *Political Economy*, Vo. 8, No. 2, August 1988 and Vol. 10, No. 3, September 1990 Department of Economics, Dhaka University, Dhaka, Bangaldesh.
3. The Ministry of Law, Government of Bangladesh, *The Constitution of the People's Republic of Bangaldesh*, Dhaka, February 28, 1979.
4. The Ministry of Planning Government of Bangladesh, *The Fourth Five-Year Plan, 1990-95* (Draft), Dhaka, 1990.
5. UNDP, United Nations, Human Develompment Report, 1992, Oxford University Press, New York, 1992.
6. United Nations World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford University Press, New York, 1987.
7. World Bank, United Nations, *World Development Report, 1992*, Oxford University Press, New York, 1992.

বাংলাদেশের দুঃস্থ মহিলাদের আয়বর্ধক প্রকল্পঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইসরাত জাহান রূপা

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধটির নাম নির্দেশনা দেয় যে বিষয়বস্তুতে দুঃস্থ মহিলা এবং আয়বর্ধক প্রকল্প বিষয়টি প্রাধান্যশীল। এক্ষেত্রে দুঃস্থ মহিলা বলতে জীবনধারণের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম দরিদ্র মহিলাদের (যেমন-বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, পরিত্যাক্তা) চিহ্নিত করা হয়েছে। আর সঙ্গত কারণেই এ সমস্ত দুঃস্থ মহিলারা জীবনধারণের জন্য কায়িকশ্রমসহ বেঁচে থাকার অন্যান্য পন্থা বের করে নিতে বাধ্য হয়। আবার কেউ কেউ বিপথগামী হয়। তবে স্বাভাবিক, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য এদের প্রয়োজন বিকল্প কিছু পন্থার মাধ্যমে উৎপাদনমূখী হওয়া। আর এই উৎপাদনমূখী হওয়ার ক্ষেত্রে বিকল্প পন্থা গ্রহণে সহযোগিতা করতে পারে সরকারী বিভিন্ন কল্যাণমূখী বিভাগ, এনজিও সমূহ সর্বোপরি ব্যাপক বেসরকারী উদ্যোগ। এছাড়াও দুঃস্থ মহিলারা যার যা অভিজ্ঞতা আছে, ন্যূনতম মূলধন আছে তাঁর ভিত্তিতে এলাকাভিত্তিক কাঁচামালের উপর নির্ভর করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ এ সমস্ত দুঃস্থ মহিলারা যদি উপার্জনে বা সঞ্চয়ে স্বনির্ভর না হয়, তবে দেশজ পণ্য একদিকে যেমন বাজার পাবে না অন্যদিকে আমাদের অর্থনীতিও স্থবিরতা থেকে মুক্তি পাবে না। আর এ বাস্তবতার আলোকে আলোচ্য নিবন্ধে আয় বৃদ্ধিমূলক কিছু বিকল্প পথের দিক নির্দেশনা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে ক্রমানুসারে ভূমিকা, শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের মহিলাদের অবস্থান, বাংলাদেশের দুঃস্থ মহিলা, আয়বর্ধক প্রকল্প কি, এই প্রকল্প গ্রহণের নির্ধারকসমূহ এবং সর্বশেষে কিছু প্রস্তাবনা আলোচনা করা হয়েছে।

১.০ ভূমিকা ঃ

ব্যাপক জনবহুল অথচ আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্র এই দেশের অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্ব। শ্রমশক্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ এখন বেকার। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, সার্বিক গ্রামীণ বাংলাদেশের অবস্থা ও সমস্যার গভীর অনুধাবন ছাড়া মহিলাদের অবস্থান ও সমস্যা অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। আর এ পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা তথা ব্যাপক দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা, বেকারত্বসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নবিত্ত, দুঃস্থ মহিলাদের জীবনধারনের উপর প্রভাব ফেলে।

২.০ শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের মহিলাদের অবস্থান ঃ

কৃষিতে নারীশ্রমের প্রচলনের ইতিহাস অনেক পুরনো। তবে ষাটের দশকে শিল্প শ্রমিক হিসেবে নারীর পদচারণা ছিল খুবই ধীর। আশির দশকের এই হার অত্যন্ত দ্রুত ও তীব্র হয়েছে। এখন আর শিল্পে নারীশ্রমিকের অবস্থান এবং ভূমিকা অস্বীকার করার জো নেই। পাশাপাশি শহর ও শহরতলীতে নির্মাণ কাজ, ক্ষুদ্রশিল্পে নারীশ্রমিকের বর্ধিষ্ণু অংশগ্রহণ, গ্রামীণ কুটির শিল্পে নারীশ্রমিকের ঐতিহ্যগত অবস্থান, বিভিন্ন শ্রমঘন কাজে নারীদের অংশগ্রহণ, সব মিলিয়ে দেশের সমকালীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ সমাজবিন্যাসের চরিত্রে এক পরিবর্তন এনেছে।[১] কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ইতিবাচক এই পরিবর্তন নারীসমাজের অবস্থান ও মর্যাদার বাস্তবিকই কি কোন পরিবর্তন ঘটিয়েছে? অথবা বলা যায় এই পরিবর্তন সমাজকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে?

বাংলাদেশের সংবিধানে মেয়েদের সাধারণ অধিকার সম্পর্কে অনেকগুলো ধারা সংযোজন করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে লিঙ্গভিত্তিতে মেয়েদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা চলবে না এবং সকল নাগরিক যাতে সমান সুযোগ পায় সেজন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। সংবিধানের ভাষায়, "The state shall endeavour to ensure equality of opportunity to all citizens."[২] কিন্তু কোনভাবেই এটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না যে শিক্ষা, পুষ্টিতে, বিত্তে, আইন, সামাজিক ও সংস্কৃতিগতভাবে দেশের মহিলা জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে। পাশাপাশি, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যথাযথ নীতির অনুপস্থিতিতে, শ্রমনীতিতে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির অভাবে, মেয়েদের জন্য পরিকল্পনার অভাবে এদেশের মেয়েরা অবহেলিত ও অনগ্রসর। ১৯৯০ সালের বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, প্রতি ১০০ জন পুরুষ শ্রমশক্তির বিপরীতে নারী শ্রমশক্তি ১৫-২০ বছর পূর্বে যেখানে শহরে ছিল ৮৭ জন, সেখানে অতি সাম্প্রতিক তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে নেমেছে ৭২ জনে এবং গ্রামে এই সংখ্যা ৯৫ জনে। একইভাবে আরও দেখান যায় সর্বসমেত অংশগ্রহণে শ্রমশক্তির শতকরা হার অতি সাম্প্রতিক পরিমাপ অনুযায়ী যেখানে ২৮.৯ ভাগ সেখানে মহিলা শ্রমশক্তির শতকরা হার মাত্র ৪.৩ ভাগ। বিষয়টি সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলঃ

সারণি-১

১৯৯০ বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, শ্রমশক্তির শতকরা হার

	পরিমাপের একক	২৫-৩০ বৎসর পূর্বে	১৫-২০ বৎসর পূর্বে	অতি সাম্প্রতিক পরিমাপ অনুযায়ী
মোট শ্রমশক্তি	মিলিয়ন	১৯	২৩	৩২
কৃষি	শ্রমশক্তির শতকরা হার	৮৩.৭	৭৮.১	-
শিল্প	,,	৪.৮	৫.৪	-
মহিলা	,,	৫.০	৫.৮	৭.২

প্রতি ১০০ জন পুরুষ শ্রমশক্তির বিপরীতে মহিলা শ্রমশক্তিঃ				
শহরে	সংখ্যা	-	৮৭	৭২
গ্রামে	,,	-	৯৫	৯৫
সর্বসমেত অংশগ্রহণের হারঃ	শ্রমশক্তির শতকরা হার	৩২.৩	২৯.৪	২৮.৯
মহিলা	,,	৩.৩	৩.৫	৪.৩

উৎসঃ Social Indicators of Development 1990, World Bank, The John Hopkins University Press, Baltimore and London.

সাম্প্রতিক কর্মসংস্থানে মেয়েরা এগিয়ে এলেও দেখা যাচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগের দুর্বল পরিস্থিতিতে পুরুষ শ্রমশক্তি অব্যাহতভাবে কর্মসংস্থানের বাজার দখল করে রেখেছে। ফলে একদিকে মহিলাদের কাজের চাহিদা অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাব- এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতার কারণে তারা কর্মক্ষেত্রে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

৩.০ বাংলাদেশের দুঃস্থ মহিলা ঃ

সাধারণ অর্থে জীবনধারণের উপযোগী ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম যে জনগোষ্ঠী তাদেরকেই দুঃস্থ জনগোষ্ঠী বলা যায়। এদিক থেকে মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রয়োজন ও তার ব্যয়ভার বহন করার অক্ষমতাকে যেমন দারিদ্র্য বলা যায় তেমনি যারা এই দরিদ্র্যতার শিকার তারাই মূলতঃ দুঃস্থ জনগোষ্ঠী। যদিও নারী ও পুরুষ উভয়ই দারিদ্র্যের শিকার, গ্রামীণ মহিলারা সমাজের সর্বস্তরে পুরুষদের তুলনায় অধিক বঞ্চিত। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা দ্বৈত শোষণের শিকার।[৩] একদিকে তারা স্বামী-সন্তানসহ গ্রামের ক্ষমতাবান মোড়ল মধ্যস্বত্বভোগীদের শ্রেণী শোষণের শিকার অন্যদিকে জন্মের সাথে সাথে নারী হিসেবে পুরুষের শোষণের শিকার।[৪] যদিও এদের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই তথাপি একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এরা মূলতঃ তাদের নিজেদের ও আশেপাশের এলাকায় প্রথমে কাজ করে। তবে কর্মসংস্থানের জন্য তারা নিজেদের এলাকা ছেড়ে বহুদূর যেতেও প্রস্তুত এবং জীবিকা ও কর্মসংস্থানের জন্য তারা বেরিয়ে পড়ে। এবং যখন যেভাবে সম্ভব সর্বনিম্ন মজুরীতেও তারা তাদের শ্রম দিয়ে থাকে।

যেহেতু বাংলাদেশ গ্রামভিত্তিক দেশ সেহেতু সামগ্রিক অর্থনীতির এ প্রভাব গ্রামীণ অর্থনীতির উপর পড়ে সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি ডঃ মাহবুব হোসেন পরিচালিত এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, ১৯৮৯-৯০ সালে ৫ বছরের কম বয়েসী শিশুদের প্রায় অর্ধেক অপুষ্টির শিকার, ছেলেদের মধ্যে এই হার ৪৩ শতাংশ আর মেয়েদের মধ্যে ৫৯ শতাংশ। প্রায় ১০ শতাংশ পরিবার ঝুপড়িতে এবং ৩২ শতাংশ পরিবার এক কক্ষের ঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামীণ পরিবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত সংকটের সম্মুখীন এবং প্রায় অর্ধেক পরিবার এক বা একাধিক মারাত্মক অসুস্থতাজনিত সংকটের

সম্মুখীন হয়।[৫] ফলে এদের এক বড় অংশ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শহরাভিমুখী হয়। শহরে আমরা যাদেরকে বস্তিবাসী বলি এরা মূলতঃ গ্রাম থেকে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আসা বেকার, নিম্ন আয়ের সর্বহারা দুঃস্থ মানুষ। এদের অবস্থান সমাজকাঠামোর নিচু তলায়। ফলে পরিকল্পনাবিদ বা নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণে এরা বার বার ব্যর্থ হয়।

৪.০ আয়বর্ধক প্রকল্প কি?

আয়বর্ধক প্রকল্প বা ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্ট হল এমন একটি প্রকল্প যেখানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলারা তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে (নগদ অর্থে কিংবা পণ্যে)। এক্ষেত্রে জমি, শ্রম, পুঁজি বা মূলধন, প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তিগত সহায়তা সর্বোপরি কর্মসংস্থানের সুযোগ-আয়বর্ধক প্রকল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইউনুস বলেন, "গরিব মানুষ হাজারো কাজ জানেন। নিজের দৈনন্দিন জীবনে, উপার্জন উপলক্ষ্যে কিংবা জীবনধারণের লক্ষ্যে এ দক্ষতার কিছু অংশ তিনি কাজে লাগান। তিনি তার সমগ্র দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেন না, কারণ তার কাছে কোন পুঁজির ভিত নেই। তবে সুকৌশলে এ সকল দুঃস্থ জনগোষ্ঠী শ্রমের সানাই বাজিয়ে আর পরিশ্রমের ঘাম ঢেলে কিছু কিছু আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দুই উপায়ে তারা সাধারণতঃ কাজ করে।

(১) স্ব-নিয়োজিত কর্মের মাধ্যমে

(২) স্ব-উপার্জিত মূলধন নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেয়ে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে।"[৬]

আজ একথা স্বীকার করতেই হয় যে অনেক পরিবারেই আজ বিকল্প বা সাহায্যকারী আয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ফলে গ্রামীণ মহিলাদের কাজে যোগ দেয়ার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আর্থিক সংকটই এ পরিবর্তনের প্রধান কারণ। সরকারের গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প, বিভিন্ন এনজিও সমূহ, গ্রামীণ ব্যাংক এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীণ মহিলাদের গৃহের অভ্যন্তরে ও বাইরে আয় উপার্জনে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং আয়বর্ধক প্রকল্প হল আয়-উন্নতির সাথে সম্পর্কিত এমন একটি উদ্যোগ যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের শ্রমবিনিয়োগ করে আয়বৃদ্ধির পথ নিশ্চিত করতে পারে।

৪.১ আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের নির্ধারক বা শর্তাদি ঃ

(ক) দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর যার যা অভিজ্ঞতা আছে তাই নিয়ে কর্মসূচী বাস্তবায়নঃ অর্থাৎ এদের শারীরিক মানসিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মসূচী তৈরি বা প্রকল্প গ্রহণ,

(খ ন্যুনতম মূলধনের ভিত্তিতে কর্মসূচী বা প্রকল্প গ্রহণ,

(গ) এলাকাভিত্তিক কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরবরাহকরণঃ অর্থাৎ এলাকাভিত্তিক কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ,

(ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বা কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা পুরণের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং

(ঙ) চাহিদানুযায়ী উৎপাদন করে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করার মত মানসিকতা ও স্পৃহা থাকে।

৫.০ আয়বর্ধক প্রকল্পসমূহ ও কিছু প্রস্তাবনা ঃ

এখন উক্ত শর্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশের দুঃস্থ মহিলাদের জন্য আমরা কি কি প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারি তা নির্ধারণ করবো। এখানে মোট ১৭টি আয়বর্ধক প্রকল্প উল্লেখ করা হল যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুঃস্থ মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল ও উৎপাদনমূখী তথা আয়ের পথ নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।

৫.১ সব্জী বাগান প্রকল্প ঃ

এই প্রকল্পটি মূলতঃ কৃষি প্রকল্পের মধ্যে পড়ে। তবে এটি কৃষি প্রকল্পের মত বড় নয়। কারণ বড় প্রকল্পে দুঃস্থ মহিলা জনগোষ্ঠী তাদের মূলধন ও সম্পদ নিয়োজিত করতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাই এক্ষেত্রে তাদের জন্য লাভজনক একটি প্রকল্প হল- সব্জী বাগান প্রকল্প। এই প্রকল্পে তেমন জমির প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর আশেপাশে পড়ে থাকা অব্যবহৃত ছোটখাট জমিতেই এ প্রকল্প নেয়া যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে জমিচাষ, বীজ ও সারের জন্য কিছু মূলধন প্রয়োজন পড়ে। তবে সেটা কোনক্রমেই দুস্বহাজার টাকার উপরে নয়। জমির পরিমাণ বেশি হলে বেশি টাকা লাগতে পারে। এ প্রকল্পে প্রতিটি মৌসুমে বিভিন্ন সব্জী উৎপাদন করা সম্ভব। এবং খুব অল্প মূলধন খাটিয়ে অনেক টাকা আয় করা সম্ভব। এছাড়া সব্জি বাজারজাত করতেও তেমন অসুবিধা নেই। কেননা এটা মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার একটি অংশ। দেখা যায় মাত্র দুস্বহাজার টাকা খাটিয়ে প্রতি মৌসুমে কমপক্ষে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব এই প্রকল্পে। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ ব্যাংক মহিলাদের শাক-সব্জী ব্যবসার ক্ষেত্রে শুরু থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত ৮.২৫ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে।[৭] যার ফলে মহিলারা তাদের বাড়তি আয়ের সুযোগ করে নিয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন।

৫.২ মৎস্য চাষ প্রকল্প ঃ

দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য এ প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। তবে এখানে মূলধন বা পুঁজি দুস্বভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। দেখা যায় অধিকাংশ দুঃস্থ মানুষের পুকুর বা ডোবা নেই। এক্ষেত্রে তাদের পুকুর বা ডোবা লীজ নিতে হবে। তাছাড়া গভীরতা ২ ফুট ও দৈর্ঘ্য প্রস্থে ২/৩ ফুট বিশিষ্ট হাউস তৈরি করে শিং-মাগুর মাছের চাষ করা সম্ভব। এ প্রকল্পে ব্যাংক ও এনজিও থেকে ঋণ নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া একটি হাউস তৈরিতে এক থেকে দেড় হাজার টাকা খরচ হতে পারে। ফিস মিল হিসাবে পচাপাতা, কীটপতঙ্গ, বাদামের খোসার গুড়ো, চালের গুঁড়ো, সরিষার খৈল-যা প্রত্যেক গৃহেই পাওয়া যায় প্রভৃতি দেয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সমবায় ভিত্তিতে এ প্রকল্প গ্রহণ করা বাস্তবসম্মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কারিতাসের ১৯৯২ জুন অর্থবছরের প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায় মাছ চাষ কর্মসূচীর মাধ্যমে দলীয় সদস্য/ সদস্যা প্রতি বাৎসরিক প্রকৃত লাভ ছিল প্রায় ৮১৯.০০ টাকা। পুরুষ ও মহিলাদলের অনুপাত ছিল ৮ঃ১। শতকরা ৪৫ ভাগ দল আংশিক মাছ বিক্রয় ও মজুদ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। ২৩২টি (২৭%) দল নিজেদের তহবিলের মাধ্যমে মাছ চাষ প্রকল্প বাস্তবায়নে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করেছে, শতকরা ৪২ ভাগ দল নিজস্ব প্রকল্পের মাছ নিজেরাই বাজারজাত করেছে।

উল্লেখ্য এ পর্যন্ত (১৯৮২-১৯৯২ জুন) এডিপি সর্বমোট ১০,৭০৭,৯৯৫ টাকা মাছ চাষে ঋণ হিসেবে দলের মধ্যে বিতরণ করেছে। ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৮৪ ভাগ।[৮]

৫.৩ হাঁস-মুরগীর খামার ঃ

এ প্রকল্পটিও অত্যন্ত লাভজনক। এতে বিভিন্ন পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ করা যায়। তবে ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ছোটখাট একটি খামার করা যেতে পারে। খামার করতে ব্যাংক ও এনজিও থেকে ঋণ পাওয়া যেতে পারে। এ খামার প্রকল্প একক ভাবে আবার সমবায় ভিত্তিতেও করা যেতে পারে। তবে সমবায় ভিত্তিতে করলে খামার বড় হবে এবং অধিক আয় হবে। এই প্রকল্পও সহজে বাজারজাত করা সম্ভব এবং এ থেকে বৎসরে মোটা অংকের আয় সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ ব্যাংক শুরু থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত হাঁস-মুরগী পালনে দরিদ্র মহিলাদের ২৫.৮৪ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করেছে।[৯]

৫.৪ পশু সম্পদ প্রকল্প ঃ

এটিও একটি অন্যতম আয়বর্ধক প্রকল্প। এ প্রকল্পের মধ্যে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি প্রজনন, মোটাতাজাকরণ, গাভীর দুধ উৎপাদনসহ প্রাসঙ্গিক কাজ আওতাভুক্ত। বর্তমানে এ প্রকল্পে ছাগলের মোটাতাজাকরণ ও প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধিকরণ খুবই লাভজনক। কেননা ছাগলের লালন-পালন ব্যয় কম। এ প্রকল্পের অনেক টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন। তবে যথাযথভাবে প্রকল্প করলে বৎসরে মোটা অংকের লাভ থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রেও গ্রামীণ ব্যাংক শুরু থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মহিলাদের গাভীপালন ক্ষেত্রে ২৬৭.০৭ কোটি টাকা, গরু মোটাতাজাকরণে ১৫৫.২৭ কোটি টাকা, ছাগল ও ভেড়াপালনে যথাক্রমে ৩১.৮২ ও ৫.২২ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে।[১০] যার ফলে দুঃস্থ মহিলারা একটি আকর্ষণীয় আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

সাধারণতঃ উপরোক্ত এ প্রকল্পগুলিতে তেমন কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এ প্রকল্পগুলি চালানো যায়। তবে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে অধিক আয় ও সার্থকভাবে প্রকল্প পরিচালনার জন্য সাময়িক প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

এবারে আমরা ঐতিহ্যগতভাবে ও বংশগতভাবে প্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দক্ষতা সমৃদ্ধ কি কি আয়বর্ধক প্রকল্প দুঃস্থ মহিলা জনগোষ্ঠীর জন্য আয়ের পথ সুগম করতে পারে তা আলোচনা করব।

৫.৫ তাঁত শিল্প ঃ

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়বর্ধক প্রকল্প। যেসব দুঃস্থ জনগণ পুঁজির অভাবে ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত এ পেশা ছেড়ে দিয়েছে তাদেরকে যথাযথ পুঁজি সরবরাহ করে এ প্রকল্প নেয়া যেতে পারে। এছাড়া এ প্রকল্পের সাথে আর একটি বিষয় জুড়ে দেয়া যেতে পারে সেটা হল ব্লক প্রিন্ট করা। থান কাপড়ের ব্লক প্রিন্ট করে বাজারে ছাড়লে তার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাঁত শিল্পকে লাভজনক করতে হলে সূতা, রং প্রভৃতির সুষ্ঠু সরবরাহ প্রয়োজন। প্রয়োজনমত ও ন্যায্যমূল্যে এ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করলে এটি খুবই লাভজনক হবে।

৫.৬ তামাক ও বিড়ি শিল্প ঃ

তামাক একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। তামাক পাতা চেনার জন্যে দক্ষতার প্রয়োজন। ভালো তামাক পাতার পরিত্যাক্ত অংশ দিয়েই মূলতঃ বিড়ি তৈরি হয়। তাই তামাকের মৌসুমে কমমূল্যে এ কাঁচামাল সংগ্রহ করে রাখতে পারলে এ প্রকল্প সার্থকভাবে পরিচালিত হবে। অনেক স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলারা তামাক ও বিড়ি ফ্যাক্টরীতে কমমূল্যে শ্রম দিয়ে থাকে। কিছু ব্যাংক ঋণ নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগেও প্রকল্পটি করা যেতে পারে।

৫.৭ বাঁশ ও বেত শিল্প ঃ

এ প্রকল্পে নানা রকম নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি সম্ভব। নিজস্ব কিছু মূলধন দিয়ে এ প্রকল্প করা যায়। মোট চার/পাঁচ হাজার টাকা পূঁজি বিনিয়োগ করে প্রকল্পটি শুরু করা যায়। বাঁশ ও বেতের সামগ্রী বাজারজাতকরণেরও তেমন সমস্যা নেই। কেননা এতে তৈরি বাস্কেট, ধামা, কাঠা, কুলা, ঝুড়ি, ঝাকা, সরপস্, মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জামাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিস। তাই এটা উপার্জনের জন্য একটি ভাল প্রকল্প।

৫.৮ কাঠ শিল্প প্রকল্প ঃ

আজকাল কাঠের তৈরি নানারকম সৌখিন জিনিস ও আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে বিশেষ করে শহরের কাঠ ব্যবসায়ীদের দ্বারা। এখানে কাঠমিস্ত্রিরা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। কিন্তু এদেরকে কিছু মূলধন ও প্রশিক্ষণ দিতে পারলে এরা আয়ের একটা নিশ্চিত উৎস পেত। তাই দুঃস্থ মহিলা যারা শিল্পে কাজ করতে উৎসাহী তাদেরকে সাময়িক প্রশিক্ষণ দিয়ে,কাঠ সামগ্রীর যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে পারলে তারা নিজেরাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠত। এক্ষেত্রে তারা তাদের বসতবাটীর আশেপাশে কিছু বৃক্ষরোপণ করে আয়ের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

৫.৯ মৃৎশিল্প ঃ

মৃৎশিল্প এদেশের একটি ঐতিহ্য সমৃদ্ধ গ্রামীণ শিল্প। কিন্তু এ শিল্পের মন্দা অবস্থা থাকায় এ পেশা ছেড়ে অনেকেই চলে যাচ্ছে। তবে এখনো মাটির তৈরি হাঁড়ি, সানকি, কলসী, চাড়ী, পিঠা তৈরির সাজ, খাদ্যশস্য রাখার বড় বড় পাত্র, ফুলদানি, খেলনা ও মূর্তিসহ বিভিন্ন মাটির সামগ্রী এখনও আমাদের চাহিদা মেটাচ্ছে। সুতরাং এ শিল্পের চাহিদা এখনও রয়েছে। অতএব এ শিল্পের তৈরি সামগ্রীকে নূতনতরভাবে ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে সর্বোপরি এ শিল্পের উন্নয়ন হলে দুঃস্থ মহিলারা তাদের আয়ের সংস্থান করতে পারত বা আর্থিক দূর্গতি ঘুচতো। এ প্রকল্পের মূলধনের পরিমাণ খুবই কম। মূলতঃ জ্বালানী খরচই বেশি প্রয়োজন। তাই ব্যাংক ঋণ বা আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ প্রকল্পকে অধিক আকর্ষণীয় ও লাভজনক প্রকল্পে পরিণত করা যায় এবং দুঃস্থ জনগণের উপার্জনের পথ হয়।

৫.১০ ঘানি শিল্প ঃ

এদেশে গরু দ্বারা ঘানি চালনা একটি উপার্জনমূখী শিল্প। এ শিল্পের মাধ্যমে বহু কলু তাদের জীবন নির্বাহ করত। কিন্তু মোটা পূঁজি বিনিয়োগকৃত যান্ত্রিক তেলের কল স্থাপন ও কাঁচামাল

অর্থাৎ তৈলবীজের দাম বেড়ে যাওয়ায় কলুরা এ শিল্প ত্যাগ করছে। তবে এ শিল্পে এখনও ১৫ হাজার পরিবার এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার সদস্য নিয়োজিত রয়েছে, এর মধ্যে ৫৭.৮৮ ভাগ পুরুষ ও ৪১.১২ ভাগ মহিলা।[১১] এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল সরিষা, তিল, তিষি। ১ মণ সরিষায় সাধারণতঃ ১০ সের তেল হয়। নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হলে ঘানি শিল্প দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অন্যতম আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প হিসাবে গণ্য হবে-

(ক) অধিক তৈল বীজ উৎপাদন
(খ) সরকারিভাবে তৈলবীজের সংরক্ষণ
(গ) মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ
(ঘ) চলতি মূলধনের জন্য ঋণ প্রদান
(ঙ) উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের সামঞ্জস্যবিধান
(চ) বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে সহজশর্তে ঋণ এর ব্যবস্থা করা।

৫.১১ দর্জির কাজ বা টেইলারিংশপ প্রকল্পঃ

এটি অত্যন্ত উপার্জনমূখী প্রকল্প। এ প্রকল্পটি খুবই কম মূলধন দিয়ে শুরু করা যায়। এমনকি ঘরোয়াভাবেও শুরু করা যায়। প্রাথমিকভাবে সাময়িক প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিনসহ প্রাসঙ্গিক কিছু জিনিষ প্রয়োজন পড়ে। এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল একজন দুঃস্থ মহিলা সহজেই উপার্জনক্ষম হতে পারে। এক্ষেত্রে সেলাই মেশিন সংগ্রহের ব্যাপারে দুঃস্থ মহিলারা এনজিও থেকে অথবা ব্যাংক ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন সেলাই মেশিন বিক্রেতা সংস্থাও (যেমন- সিঙ্গার) কিস্তিতে সেলাই মেশিন বিক্রি করে থাকে। এছাড়া এলাকার টেইলারিং শপের সাথে যোগাযোগ করেও চুক্তিভিত্তিক কাজ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, শুরু থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সেলাই মেশিন ক্রয়ে গ্রামীণ ব্যাংক মহিলাদের ৮.৮১ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।[১২]

৫.১২ বই ও খাতা বাঁধাই প্রকল্পঃ

এ প্রকল্পটি দুঃস্থ মহিলাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এটি ঘরোয়াভাবে করা সম্ভব। এ প্রকল্পের আওতায় বই ও খাতা বাঁধাই ছাড়াও দুঃস্থ মহিলারা খাম, ঠোঙা এবং বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট চুক্তিভিত্তিক সরবরাহের মাধ্যমে আয়ের একটি পথ করতে পারে। এর জন্য তেমন কোন বড় জায়গা কিংবা বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। নিজ বাড়ীতে ঘরের এক কোণে বসেই করা যায়।

৫.১৩ লণ্ড্রি স্থাপন ও পরিচালনা প্রকল্পঃ

সাধারণভাবে প্রচলিত যে, ছেলেরাই লণ্ড্রির কাজ পরিচালনা করে। তবে মেয়েরাও যে এ কাজটি সুন্দর ও সাবলীলভাবে পরিচালনা করতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। কেননা কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা সে সঙ্গে রিপুর মত সূক্ষ্ম কাজগুলিও মেয়েরা দক্ষতার সাথে করতে পারে। এতে তেমন কোন বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। কিছুদিনের চর্চা ও অভ্যাস করে নিলেই তা করা যায়। পাশাপাশি মূলধনের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং পুরনো ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য এবং নারীশ্রমের সঠিক ব্যবহার ও উৎপাদনমূখী করার জন্য প্রকল্পটি অত্যন্ত যুগোপযোগী।

৫.১৪ মিষ্টি, সেমাই, কেক প্রভৃতি তৈরি প্রকল্পঃ

এটিও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য উপার্জনমূখী প্রকল্প। এটি ঘরোয়াভাবেই করা যায়। এতে মূলধনের পরিমাণও খুব বেশি লাগে না। তবে ঠিকমত বাজারজাত করতে পারলে এ প্রকল্পে অধিক লাভ আশা করা যায়। তবে এক্ষেত্রে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, দুঃস্থ মহিলাদেরকে এ উদ্যোগ নিতে হলে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্পটি হাতে নিলে লাভবান হওয়া সম্ভব।

৫.১৫ জুতা ও চামড়ার তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর কারখানা প্রকল্পঃ

এ প্রকল্পটি অত্যন্ত লাভজনক। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাদেরকে উৎপাদমূখী তথা আয়মূখী করা সম্ভব। তবে সমবায়ের মাধ্যমে বেশি মূলধন বিনিয়োগ করে এ প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা যায়। প্রয়োজনবোধে সমবায়ের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে চামড়ার তৈরি সামগ্রী ও জুতা বাজারে ব্যাপক চাহিদা আছে। এছাড়া কাঁচামালও (চামড়া) স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যাবে। পাশিপাশি আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, জুতা ও চামড়াজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরির জন্য দুঃস্থ মহিলাদেরকে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক নারীসমাজের একাংশকে উৎপাদনমূখী করা যেতে পারে। সে সাথে দুঃস্থ মহিলারা এ দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে বা অন্যান্য কারখানায় তাদের শ্রম দিয়ে আয়ের পথ নিশ্চিত করতে পারে।

৫.১৬ সাঁটলিপি ও টাইপিং প্রকল্পঃ

এ প্রকল্পটি অল্পশিক্ষিত দুঃস্থ মহিলাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এ প্রকল্পতে সাময়িক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। সাময়িকভাবে এ প্রকল্পে কিছু টাকা পূঁজি বিনিয়োগ করে মেশিন কিনে দুঃস্থ মহিলারা উপার্জনক্ষম হতে পারে।

৫.১৭ সমবায়ের মাধ্যমে ধান, চাল, চিড়া, মসলা ও তৈল ভাঙ্গানো কল প্রকল্পঃ

এ কলগুলি এদেশে অত্যধিক প্রচলিত এবং লাভজনক। দুঃস্থ মহিলারা সমবায়ের মাধ্যমে এ প্রকল্পটি চালু করতে পারে। তাছাড়া, তারা সমবায় সমিতি করে বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমেও এ প্রকল্পটি চালু করতে পারে। এসব কলে প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়েও অনেক লাভ করা যায়। তাই দুঃস্থদের জন্য এ প্রকল্পটি সমবায়ের মাধ্যমে নেয়া বেশি উপযোগী বলে মনে হয়।

৬.০ শেষ কথাঃ

উপরে উল্লিখিত প্রকল্পগুলি ছাড়াও স্বল্প পূঁজি ও সাময়িক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাদেরকে উপার্জনমূখী করে তোলা সম্ভব। যেমন- ফলফলারীসহ বিভিন্ন দ্রব্যের চলতি ব্যবসা অল্প পূঁজি বিনিয়োগ করে করা যেতে পারে। অর্থাৎ একে স্বল্প পূঁজির ব্যবসা প্রকল্প বলা যায়। যা বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিও সহজশর্তে ঋণদানের মাধ্যমে এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে পূঁজি দিয়ে এ প্রকল্প চালানো সম্ভব। আবার সাময়িক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাদেরকে আত্মনির্ভরশীল তথা উপার্জনমূখী করা যেতে পারে। এটাকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও সংস্থাপন প্রকল্প বলা যায়।

তবে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুঃস্থ মহিলাদের আয়মূখী তথা উৎপাদনমূখী করতে যৌথ উদ্যোগ বা সমবায় সমিতি সর্বোপরি সাংগঠনিক কাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক, কুমিল্লা সমবায় মডেল, ব্র্যাক, প্রশিকা, কিংবা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে এসব প্রকল্পে সুযোগ-সুবিধাদিতে মধ্যস্বত্বভোগীরা যেন সুবিধা না নিতে পারে। অর্থাৎ প্রকল্পে মহিলাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্র থেকেই নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন সর্বোপরি উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন আছে। আর এ উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে। তাছাড়াও গৃহিত বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রকল্প বা উদ্যোগের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। কেননা সঠিক মূল্যায়ন ব্যতীত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণে সন্দিহান থাকতে হয়।

সুতরাং দেশের এই বিশালসংখ্যক মহিলা শ্রমশক্তিকে উৎপাদনমূখী কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ নারীশ্রমের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ নিবন্ধটি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং পরিকল্পনাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে রচিত হয়েছে।

তথ্য নির্দেশঃ

১। ইশতিয়াক সাইদ (সম্পা), "শ্রমজীবী নারীদের চালচিত্র", *প্রজন্ম*, ৯ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৮৯।

২। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, (১৯৯১ সালের ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত সংশোধিত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, পৃঃ- ১৩।

৩। Jenneke, Arens and Jos van Beurdan, *Jagrapur: Poor Peasants and Women in a village in Bangladesh*, Calcutta: Orient Longman, 1980.

৪। নাজমির নূর বেগম, উপার্জন ও সামাজিক অবস্থানঃ নীলগঞ্জের মহিলা, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯২।

৫। ডঃ মাহবুব হোসেন, "গ্রামীণ অর্থনীতি ও দারিদ্র্যমোচনঃ একটি পর্যালোচনা," *দৈনিক আজকের কাগজ*, ১৩ই মার্চ, ১৯৯২।

৬। ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস, "গ্রামীণ ব্যাংক কেন"? *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকাঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ইং।

৭। *Bank parikrama*, Vol. XVII. 1992

৮। *বিনিময়-কারিতাস* উন্নয়ন শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বিমাসিক মুখপত্র, ১৩শ বর্ষ, ৪০তম সংখ্যা, মে, ১৯৯৩

৯। *Bank parikrama*. Op. Cit.

১০। *Ibid.*

১১। এডাব সংবাদ, ফাল্গুন, ১৩৯৫

১২। *Bank parikrama*. Op. Cit.

বাংলাদেশে স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় মুসলমানদের অবদানঃ ১৭৯৯-১৯৮৩

মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী

মুসলমানেরা ইতিহাস-সচেতন জাতি। ভারত উপমহাদেশেও তারা ইতিহাস লিখে এই সচেতনতার পরিচয় দেয়। উপমহাদেশের সুলতানী ও মোগল আমলের সমসাময়িক ইতিহাসের অভাব নাই। কিন্তু বাংলাদেশে সুলতানী আমলের কোন সমসাময়িক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তারা যে ইতিহাস-সচেতনতা হারিয়ে ফেলে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কিছু কিছু অধূনালুপ্ত পাণ্ডুলিপির উল্লেখে তা প্রমাণিত হয়[১] তাছাড়া সুফী-সাধকের জীবনী সম্বলিত কিছু গ্রন্থও পাওয়া যায়।[২] মোগল আমলের অবস্থা অনেক সন্তোষজনক, এই সময়ে লিখিত বেশ কিছু ফার্সী ইতিহাসের অস্তিত্ব রয়েছে। বাংলায় মুসলমান আমলের একমাত্র ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হচ্ছে গোলাম হোসেন সলীমের *রিয়াজ-উস্-সলাতীন*।[৩] বইখানি লেখক তাঁর মনিব ইংরেজ অফিসার জর্জ উডনীর আদেশে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন।

উনিশ শতকে ফার্সী ভাষায় মাত্র একখানি বাংলার ইতিহাস রচিত হয়। ইহা সৈয়দ এলাহী বখশের *খুরশীদ জাহান নুমা*।[৪] বইখানি প্রকাশিত হয়নি, শুধু গৌড়-পাণ্ডুয়া অংশ ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হয়।[৫] ইংরেজ আমলে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত না হলেও, মুসলমানেরা স্থানীয় ইতিহাসে[৬] বেশ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। বাঙলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ হলো- ১৭৯৯ সনে নবাব নসরত জঙ্গ প্রণীত *তারীখ-ই-নসরতজঙ্গী*।[৭] *তারীখ-ই-নসরতজঙ্গীর* রচনাকাল থেকে মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুল লতিফ কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলা *গেজেটিয়ার্স* প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জেলা *গেজেটিয়ার্সের* সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৯৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলিম আমলা, পণ্ডিত, গবেষক ও সাধারণ লেখকেরা বাঙলা, ইংরেজী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় যত স্থানীয় ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে তার ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনামূলক নিরীক্ষা চালানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

২. মুসলিম আমলাদের অবদান

১৭৬৯ সনে বৃটিশ সরকার ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে জেলায় নিয়োগপ্রাপ্ত সুপারভাইজারগণকে স্থানীয় ইতিহাস সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করে। ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, ভাষাগত অজ্ঞতা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে এ সকল সুপারভাইজারগণ স্থানীয় ইতিহাস রচনায় ব্যর্থতার পরিচয় দেন।[৮] তারপরও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে স্থানীয় ইতিহাস রচনায় কোম্পানীর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।[৯] ফলে বৃটিশ আমলারা এ কাজে প্রচুর সফলতা অর্জন করেন এবং প্রতিটি জেলায় অন্ততঃ একটি করে প্রাথমিক *রিপোর্ট*,

ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল একাউন্টস, গেজেটিয়ার্স ও সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্টে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বৃটিশ আমলে এ দেশে মুসলমান আমলার সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তাই এক্ষেত্রে তিনটি *Final Report on the Survey and Settlement Operations*- ছাড়া অন্য কোন ধরনের স্থানীয় ইতিহাস বৃটিশ মুসলিম আমলাদের দ্বারা রচিত হয়নি।[১০]

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্বের জেলা *গেজেটিয়ার্স* গুলো পুনঃলিখনের জন্য একজন বৃটিশ ভারতীয় আমলাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[১১] কিন্তু সে নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৬১ সনের ডিসেম্বর মাসে রাজস্ব বোর্ডের সিনিয়র সদস্য এস. এম. হাসানকে সভাপতি করে জেলা গেজেটিয়ার্স পুনঃলিখন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১২] উক্ত কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৬৩ সনের জুলাই মাসে প্রতিটি জেলার গেজেটিয়ার্স পুনঃলিখনের জন্য পৃথক পৃথক কমিটি করা হয়- যেখানে একজন সাধারণ সম্পাদক, একাধিক সহকারী সম্পাদক এবং কয়েকজন গবেষণা-কর্মকর্তা থাকবেন।[১৩] ১৯৭১ সনের আগে কেবলমাত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার গেজেটিয়ার্স প্রকাশিত হয় এবং বাকীগুলো স্বাধীনতা উত্তর প্রকাশিত হয়। এ সকল জেলা গেজেটিয়ার্সের সম্পাদকগণ মুসলিম আমলা ছিলেন।[১৪]

জেলা গেজেটিয়ার্স ছাড়া মুসলিম আমলারা আরও তিনটি কাজ করেছেন যা স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তার মধ্যে এ. রশিদ ও এইচ. এ. নোমানীর সম্পাদিত পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলার জন্য ১৭ ভল্যুম *Census Report* প্রকাশিত হয়েছে।[১৫] দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার পর এ.কে.এম.জি. রাব্বানীর তত্ত্বাবধানে এবং সম্পাদনায় ১৯৭৪ সনের *Census Report* প্রকাশিত হয়।[১৬] তৃতীয়তঃ মুসলিম আমলারা ১৯৫৬-৬০, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২, এবং ১৯৬৩-৬৪ সনে সম্পাদিত জরীপের চূড়ান্ত রিপোর্টগুলো প্রকাশ করে স্থানীয় ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রেখেছেন। মুসলিম আমলাদের দ্বারা সম্পাদিত এ সকল কাজই সরকারী সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন মাত্র। তবুও এ সকল প্রকাশিত ভল্যুমগুলোতে স্থানীয় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এতবেশী তথ্য প্রদান করা হয়েছে যা স্থানীয় ইতিহাস রচনার অতিমূল্যবান প্রাথমিক উৎস হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

৩ মুসলিম পণ্ডিত ও গবেষকদের অবদান

বাঙলাদেশে স্থানীয় ইতিহাস গবেষণায় মুসলিম পণ্ডিত ও গবেষকদের অবদান মূলতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক। স্থানীয় ইতিহাস রচনার ধারায় সর্বপ্রথম গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের প্রফেসর আহমদ হাসান দানী। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ *Dacca, records of it's changing fortune* ১৯৫৬ সনে এস এস. দানী কর্তৃক প্রথম সংস্করণ এবং ১৯৬২ সনে দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকার ঢাকা শহরের স্থাপত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পুনঃলিখন সম্পাদিত হয়। ফলে ঢাকা শহরের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন, ভৌগোলিক গঠন, সূচনা থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ইতিহাস, মোগল জীবন,

অভিজাত শ্রেণী ও স্থাপত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় ভরপুর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।[১৭]

ঢাকা শহরের উপর দ্বিতীয় গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি রচনা করেন ডঃ আব্দুল করিম। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ *Dacca: The Mughal Capital*, ১৯৬৪ সনে ঢাকাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে ঢাকার বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে ঢাকার গুরুত্ব এবং ঢাকার জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ইত্যাদির একটি ইতিহাসতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৮] তাছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত দলিল-দস্তাবেজরে তেরটি পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে যাতে অষ্টাদশ শতকের ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজস্ব, সামাজিক প্রথা ও জমিদার সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য রয়েছে।[১৯]

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় ইতিহাস গবেষণার সূচনা হয়েছিল এ শতাব্দীর ষাটের দশকে যুক্তরাজ্যের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অধীন School of Oriental and African Studies এ উক্ত প্রতিষ্ঠানে কমন্‌ওয়েলথ বৃত্তি কমিশনের অধীনে তিনজন বাঙলাদেশী মুসলিম গবেষক প্রফেসর মেজর জে. বি. হেরিসনের তত্ত্বাবধানে পি-এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভ হিসাবে স্থানীয় ইতিহাস গবেষণায় সফলতা অর্জন করেন। তাদের গবেষণাকর্ম পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় এবং তার উপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ-

এ.বি.এম. মাহমুদ প্রণীত *The Revenue Administration of the Northern Bengal, 1765-1793*, গ্রন্থটি ১৯৭০ সনে ঢাকাস্থ National Institute of Public Administration কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এখানে গ্রন্থকার রাজশাহী জমিদারীর উত্থান-পতনের ইতিহাস সমালোচনা সহকারে লিপিবদ্ধ করেন, বাঙলার দিওয়ানী লাভের পর বৃটিশ রাজস্ব প্রশাসনের সংশয় ও দোদুল্যমান রাজস্বনীতি পরীক্ষা করে উত্তর বঙ্গের খামার পদ্ধতির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং সব কিছু মিলে বাঙলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনের একটি মজবুত ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস পান।[২০]

আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন রচিত *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong, 1765-1785* শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি ১৯৭১ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার চট্টগ্রামের প্রাথমিক বৃটিশ রাজস্ব প্রশাসন বর্ণনা করেন, স্থানীয় রাজস্ব প্রথা বিশ্লেষণ করেন এবং সরকারী নতুন রাজস্ব পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রক্রিয়া নিরীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছেন যে স্থানীয় চাহিদা ও পারিপার্সিক অবস্থার কারণে সরকারী পদক্ষেপের পরিবর্তন কতটুকু হয়। তাছাড়া, তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, পল্লীর জনপ্রশাসন ও বৃটিশ রাজস্ব প্রথা মূলতঃ মোগলদের বিলুপ্ত প্রায় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সর্বোপরি তিনি রাজস্বের সাথে সরাসরি সংযুক্ত বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থবাদী দল ও উপ-দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২১]

কে. এম. মহসীন লিখিত *A Bengal District in Transition: Murshidabad. 1765-1793*, ১৯৭৩ সনে ঢাকাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে বাঙলার রাজধানী ও জেলা মুরশিদাবাদের মোগল শাসন থেকে বৃটিশ শাসনে উত্তোরণের ইতিহাসসহ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর ব্যবস্থা, ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশদ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, গ্রন্থকার মহাদুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং মুরশিদাবাদ থেকে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তরের মারাত্মক ফলাফল সমূহ উল্লেখ করেছেন।[২২]

বাঙলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্থানীয় ইতিহাস গবেষণা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে অধিকতর সফলতা অর্জন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয়-অধীন Institute of Bangladesh Studies। উক্ত প্রতিষ্টানে ডঃ সফর আলী আকন্দের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ইতিহাসের উপর তিনটি গবেষণা-কার্য সম্পাদন হয়েছে যা পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর অভিসন্দর্ভ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।[২৩]

উল্লেখিত প্রতিটি গবেষণাকর্ম ইতিহাস গবেষণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত হযেছে- যেখানে বিষয় এবং সময় ছিল সীমাবদ্ধ, বিশ্লেষণ ছিল গভীর, প্রামান্য দলিল-দস্তারেজ ছিল গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশের মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত এ পদক্ষেপ স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

৪. মুসলিম সাধারণ লেখকদের অবদান

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই স্থানীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান লেখকদের অবদান পণ্ডিতবর্গ, আমলাগোষ্ঠী এবং সাধারণ পাঠক সমাজের দ্বারা উচ্ছসিত প্রশংসা অর্জন করেছে। তবে অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম লেখক হচ্ছেন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অবসর প্রাপ্ত সরকারী আমলা অথবা উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোক। এ ধরনের কাজে হাত দেওয়ার পেছনে তাদের প্রেরণা যুগিয়েছেন কোন স্থানের প্রতি তাদের ভালবাসা, বা কোন শাসকের প্রতি তাদের দুর্বলতা অথবা কোন প্রভাবশালী মুরুব্বী বা শিক্ষকের উৎসাহ। সে যাই হোক সাধারণ মুসলমান লেখকগণ বাঙলা, ইংরেজী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় বহু স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। আল-কুরআনের ভাষা হিসাবে বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রচুর পঠন-পাঠন মুসলিম বিজয় থেকে আজপর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও আরবী ভাষায় কোন স্থানীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে এমন তথ্য আমাদের হাতে পৌছেনি। নিম্নে ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় মুসলমানদের রচিত স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থসমূহের উপর অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৪. ক. ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী-

মুসলমানেরাই বাঙলাকে একক কেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং তাদের শাসনামলের সূচনা থেকে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফারসী বাঙলার রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল। এ পর্যন্ত আমরা ফারসী ভাষায় বাঙলাদেশী মুসলমানদের দ্বারা প্রণীত তিনটি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। প্রথম গ্রন্থটি ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নবাব নসরত জঙ্গ কর্তৃক ১৭৯৯ সনে লিখিত।[২৪]

গ্রন্থটি মূলতঃ মোগল সম্রাট আকবরের আমল (১৫৫৬-১৬০৫) থেকে শুরু করে ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম হাসমত জঙ্গের আমল (১৭৮৪-১৭৯৬) পর্যন্ত ঢাকার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্থাপত্যের ইতিহাস।[২৫] *তারীখ-ই-জাহাঙ্গীর নগর ওরফে ঢাকা* শিরোনামের এ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার ও কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দীর অধিককাল অপ্রকাশিত থাকার পর ১৯১১ সনে হরিনাথ দের সম্পাদনায় *তারীখ-ই-জাহাঙ্গীরনগর ওরফে ঢাকা*গ্রন্থটি *তারীখ-ই-নসরতজঙ্গী* শিরোনামে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[২৬]

এদেশীয় প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ফারসী কবি খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান *আখাদিসুল-খাওয়ানীন* বা *তারীখ-ই-হামীদী* নামক একটি স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ ১৮৫৫ সনে প্রণয়ন করেন। আজকের দিনে প্রথম সংস্করণটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ার কারণে সে সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।[২৭] ১৮৭১ সনে কলিকাতাস্থ মাযহারুল আরব প্রেস থেকে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় এবং তার প্রকাশক ছিলেন কবিরউদ্দিন আহমেদ। এ গ্রন্থে চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের সূচনার ইতিহাস, তার ভৌগোলিক বিবরণ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, বুজর্গ উমেদ খান কর্তৃক শাহী জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা, তার পতন এবং গ্রন্থকার কর্তৃক শাহী জামে মসজিদের পুনঃরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[২৮] আলোচ্য গ্রন্থটি হচ্ছে চট্টগ্রামের প্রথম লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ যার সম্পর্কে ডঃ মতিউর রহমান বলেন- "ফারসী ভাষায় প্রণীত এ গ্রন্থটি হচ্ছে চট্টগ্রামের ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ইতিহাস"।[২৯] ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত আগা আহমদ আলী কর্তৃক লিখিত তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা হচ্ছে বাঙলাদেশী মুসলমান কর্তৃক ফারসী ভাষায় প্রণীত তৃতীয় স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে এ গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য।[৩০]

দীর্ঘ ছয়শত বছর ফারসী এদেশে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, অথচ সে ভাষায় প্রণীত স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সংখ্যার এ অপ্রতুলতার পেছনে খুব সম্ভবতঃ কারণ হচ্ছে- আজকের দিনের মতো তখনকার দিনে স্থানীয় ইতিহাস জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস চর্চার গতি ও প্রকৃতি আবর্তিত হতো মোগল দরবার ও আভিজাত্য শ্রেণীকে কেন্দ্র করে। তৃতীয়তঃ হিন্দুরা যদিও ফারসী ভাষা চর্চায় পটু ছিল তবুও কিন্তু তারা এ ভাষায় কোন স্থানীয় ইতিহাস প্রণয়ন করেনি।

৪.খ. উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী

উনিশ শতকে বাঙলাদেশে শরীফ মুসলিম উচ্চ-বিত্তের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দূ। শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরাও মাঝে মাঝে উর্দূতে কথাবার্তা বলাকে আভিজাতের প্রতীক বলে মনে করতো। যে কোন বিত্তের মুসলমানেরা আরবী-ফারসীর পর উর্দূ ভাষাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। বাঙলাদেশী মুসলমান দ্বারা উর্দূ ভাষায় রচিত তিনটি স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

মুন্সী রহমান আলী ত্বায়েশ (১৮২৩-১৯০৮) কর্তৃক প্রণীত *তওয়ারীখ-ই-ঢাকা* নামক গ্রন্থখানা ১৯১০ সনে গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ঢাকাস্থ স্টার অব ইণ্ডিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত

হয়।[৩১] আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তার সমকালীন ঢাকাবাসীর পেশাগত, বংশগত ও ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি ঢাকা নগরীর পত্তন ও ক্রমবিকাশের প্রায় তিনশত বছরের ধারাবাহিক প্রাচীন ইতিহাস, ঢাকা শহরের অদুরে বিক্রমপুর, সোনারগাঁ, ভাওয়াল, তালোবাবাদ ও সাভারের অষ্টম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় কালের বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর আলোকে ঢাকার একটি পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন।[৩২]

প্রখ্যাত হাকীম হাবিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত *আসুদ-গানে-ঢাকা* নামক একটি গ্রন্থ হাকীম সাহেবের জীবৎকালে (১৮৮০-১৯৪৭) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে পুরানো ঢাকার স্মৃতিসৌধ, ঐতিহাসিক স্থাপত্যসমূহ এবং ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৩৩] হাকীম সাহেব প্রণীত দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম হলো *ঢাকা পঁচিশ বারাস পহলে*। এ গ্রন্থটি মূলতঃ ঢাকা রেডিও সেন্টার থেকে প্রকাশিত বেতার কথিকার সংকলন যা ১৯৫০ সনে রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্ণিত হযেছে। কিন্তু বেতার কথিকার সংকলন হওয়ার কারণে উক্ত গ্রন্থে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।[৩৪]

বাঙলাদেশে উর্দূ ভাষায় ঢাকা ছাড়া অন্য স্থানের ইতিহাস প্রণীত হয়নি। ইহার কারণ সম্ভবতঃ মোগল রাজধানী ঢাকায় কিছু সংখ্যক উর্দু ভাষাভাষী মুসলিম বাসকরতেন যারা স্বীয় ভাষা হিসাবে উর্দূ চর্চা করতেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ভাষা উর্দু হলেও এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে তার কোন আবেদন ছিল না। তাছাড়া ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে এদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে উর্দূ ভাষা ক্রমে ক্রমে বিদায় নিতে থাকে।

৪. গ. ইংরেজী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ১৮৩৭ সনে ফরাসীর বদলে ইংরেজী ভাষাকে এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু রাজ্যহারা মুসলমানেরা এ আদেশ মনে প্রাণে মানতে পারেনি। তাই তারা ঘৃণাভরে ইংরেজী বর্জন করে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফারসী ভাষা চর্চা করতে থাকে। ফলে ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত প্রশাসন ও বাণিজ্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাই পাশ্চাৎপদ ও দরিদ্র সম্প্রদায় হিসেবে স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে তারা অপরাগ ছিল। অন্যদিকে ১৯৪৮ সনে ভাষা বিষয়ক জটিলতা ও ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের ফলে দিন দিন এদেশে ইংরেজী চর্চা লোপ পায়। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে ইংরেজী ভাষায় মুসলমানদের দ্বারা প্রণীত স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে পাঁচ-তৎমধ্যে দুটো ঢাকার উপর[৩৫], দুটো চট্টগ্রামের উপর[৩৬] এবং একটি কুষ্টিয়ার উপর[৩৭] লেখা।

উল্লেখিত পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে চারটি গ্রন্থের লেখক হলেন 'সৈয়দ' (নবীবংশ) অর্থাৎ উচ্চস্তরের মুসলিম।[৩৮] এ তথ্য হতে এটা ইষৎ প্রতিয়মান হয় যে সমাজের উচ্চ-স্তরের মুসলমানেরা সর্বাগ্রেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ রাজত্বে স্বীয় স্বার্থে তাদেরকে ইংরেজী শিখতে হবে এবং চর্চা করতে হবে। তাছাড়া পাঁচজন গ্রন্থকারই হলেন উচ্চ-শ্রেণীর সরকারী

আমলা যারা সরকারী সিদ্ধান্ত ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়াসে গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। প্রত্যেক গ্রন্থকারই বাংলার ইতিহাসের সাথে সংগতি রেখে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আপন আপন জেলার পরিসংখ্যান সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস বর্ণনার প্রচেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ আবার স্থাপত্য ও সৌধের ইতিহাস লিখেছেন। সকল প্রচেষ্টাই কোন না কোন পর্যায়ে প্রশংসার দাবী রাখে।

৪.ঘ. বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী[৩৯]

বাঙলা ভাষায় গদ্যরূপ লিখন পদ্ধতি খুব বেশী দিনের নয়। ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের পরপরই বাঙলা ভাষায় গদ্যরূপ লিখন পদ্ধতির উদ্ভব হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা বিকাশ লাভ করে। বাঙলা ভাষায় গদ্য রূপ লিখনের প্রায় দুশো বছর হয়ে গেলেও স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় তা বেশী সফলতা অর্জন করেনি। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট এ দেশীয় মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু করে। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের (১৮৫৭ খৃঃ) ব্যর্থতার পর মুসলমানদের চৈতন্য হয় এবং তারপরেই তারা ইংরেজী ও বাঙলা ভাষা শিক্ষা করে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাদেশের মোট আনুমানিক বারটি স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ এদেশীয় মুসলমান দ্বারা লিখিত হয়েছে।[৪০] ১৯৪৭ সালে বৃটিশ চলে যাওয়ার পর বিশেষতঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর এদেশের জ্ঞান চর্চার চত্বরে এক নব জাগরণের উন্মেষ ঘটে, যার ফলে বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসের ব্যাপক পঠন-পাঠন শুরু হয়। এর প্রেক্ষিতে পাকিস্তান আমলে বাঙলা ভাষায় ষোলটি স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ বাঙলাদেশী মুসলমানদের দ্বারা রচিত হয়েছে।[৪১] ১৯৭১ সনে স্বাধীনতার পর বাঙলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করলে সে নবজাগরণের ঢেউ প্রবল জোয়ারে পরিণত হয় এবং তা আজও অব্যাহত রয়েছে। ফলে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বিশটি স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ বাঙলাদেশী মুসলমান দ্বারা প্রণীত হয়।[৪২]

৪. ঙ. সাধারণ মুসলমানদের অবদান মূল্যায়ন

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সাধারণ মুসলমান লেখকদের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থসমূহে কতগুলো সাধারণ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা তাদের ব্যবহারিত তথ্যের উৎসের কথা উল্লেখ করতে পারি। অধিকাংশ গ্রন্থকারই তাদের তথ্যের উৎস সম্পর্কে উদাসীন। বেশীর ভাগ স্থানীয় ইতিহাস রচয়িতার তথ্যের উৎস হলো জেলা *গেজেটিয়ার্স, ষ্ট্যাষ্টিক্যাল একাউন্টস,* জেলা কালেক্টরের প্রকাশিত *রিপোর্ট,* সরকারী প্রকাশিত রিপোর্ট, সাধারণ বই, প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস (Secondary Sources)। দ্বিতীয়ত কোন কোন স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার্সের হুবহু বা উন্নততর বঙ্গানুবাদ। এ প্রসংগে ডঃ করিমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য- "Their works were not merely a history. but these were the historical miscellanery or in modern terminology it may properly be called an improved type of Gazetteers.[৪৩] তৃতীয়ত, তারা

কোন পাণ্ডুলিপির উৎস (Manscript Sources) ব্যবহার করেনি। অথচ স্থানীয় ইতিহাস রচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো জেলা ও সচিবালয় মুহাফেজখানা, কলিকাতাস্থ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত চিঠি-পত্র ও দলিল দস্তাবেজের পাণ্ডুলিপিসমূহ। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে কোন লেখকই সেই উৎসের ব্যবহার করেননি অথবা সে সম্পর্কে কোন আলোচনাও করেনি। চতুর্থত, ইতিহাস গবেষণার একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ যথাযথ ব্যবহার করে একটি সত্যে উপনীত হওয়া যায়। আমরা এ পদ্ধতিটিকে ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি বা Historical Research Method বলে থাকি। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে কোন গ্রন্থকারই সে পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। পঞ্চমত, সময় বিভাজন অথবা যুগবিভাজনের (Periodization) দিকেও কোন গ্রন্থকার নজর দেননি। ষষ্ঠতম, প্রায় সকল গ্রন্থের আলোচ্যসূচী (Contents) ও লিখন শৈলী (Writting Style) একই এবং সেটা হচ্ছে- প্রথমে গ্রন্থকার তাঁর স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ দিয়ে প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে শুরু করে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত আবেগজনিত ত্রুটিপূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা। সপ্তমত, বেরানে অনেক জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস বর্ণনা করে সেখানে থেকে শিক্ষা গ্রহণের যে ধারা ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে তারই সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুসলমানগণ ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ফলে পৃথিবীতে ইতিহাসতত্ত্বে মুসলমানদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং তারই সাথে সংগতিপূর্ণ হচ্ছে স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় মুসলমানদের অবদান। বহির্বিশ্বে মুসলমানগণ ইতিহাস রচনায় যে রীতিনীতি অনুসরণ করেছে বাংলাদেশের মুসলমান স্থানীয় ইতিহাস রচয়িতাগণ সে পদ্ধতিও অনুসরণ করেনি।

উল্লেখিত দোষত্রুটিসমূহের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। প্রথমত, বেশীর ভাগ স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতারা সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক নহেন। তাই তাঁরা ইতিহাস রচনার উৎস, ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি, যুগ বিভাজন এবং ইতিহাস রচনা শৈলী সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে তারা সাহিত্যের আঙ্গিকে ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আর্থিক অসচ্ছলতা তাদের তথ্য সংগ্রহে, গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশনায় বাধা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক লেখক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সৃষ্ট সমস্যার কথা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন এবং এ জন্য তারা অনেক জমিদার নায়েব, উকিল, ব্যবসায়ী অথবা অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেছে। এ সকল তথ্য প্রমাণ করে যে তারা কোনদিন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেননি।

বাংলাদেশী মুসলমানদের দ্বারা রচিত স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থগুলো বহু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তার ঐতিহাসিক মূল্যমান অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে ডঃ এনামুল হক লিখেছেন- "ইহাকে ইতিহাস বলা যায় কি না জানি না, তবে ইতিহাসের মৌলিক উপাদান যে এ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হবে তাতে সন্দেহ নেই। ইহাকে Historical Gazetteers বা ঐতিহাসিক বিবরণী বলা যায়"।[৪৪]

৫. উপসংহার

ফারসী, ইংরেজী, উর্দূ এবং বাঙলা পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের কারণে বাঙলার রাজ-ভাষার মর্যাদা লাভ করে। জীবিকার স্বার্থে মূলতঃ এদেশীয় হিন্দু-মুসলিম উভয়কে এসব ভাষা শিখতে হয়েছে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সব সময় হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতে অগ্রসর ছিল। কিন্তু বিদেশী ভাষায় স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় মুসলমানরা অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। অন্যদিকে হিন্দুরা বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় স্থানীয় ইতিহাস রচনা করেননি। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ভাষা শিক্ষার চাইতে স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে হিন্দুদের চাইতে মুসলমানগণ সব সময় এগিয়ে ছিল।

বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাস রচনায় মুসলিম আমলাদের অবদান গুণগত, মানগত অথবা সংখ্যাগত দিক দিয়ে সন্তোষজক না হলেও তারা যে স্থানীয় ইতিহাস রক্ষার প্রাথমিক গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন তা অনস্বীকার্য। পণ্ডিত ও গবেষকদের কাজের সংখ্যা স্বল্প হলেও তাদের মানগত দিকটা সর্বজন স্বীকৃত। তাছাড়া, ফারসী, উর্দূ এবং ইংরেজী ভাষায় স্থানীয় ইতিহাস রচনার সূচনা করেছেন এদেশীয় মুসলমানেরা। অথচ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে মুসলমানেরা সবদিক দিয়ে তাদের প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু বাঙলার পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় হয়েও তারা স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় অগ্রগামী ছিলেন এবং এখানেই বাংলাদেশে স্থানীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান প্রণিধানযোগ্য।

পাদটীকা

১। যেমন *রিয়াজ-উস-সলাতীনে* অধুনালুপ্ত পাণ্ডুলিপির কথা পাওয়া যায়। ফ্রানসিস বুকাননও একখানি পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন, যা আর এখন পাওয়া যায় না।

২। যেমন পীর মুহম্মদ শাত্তারীর *রিসালত-উশ-সুহাদা*, ইহা ১৮৭৪ সনে কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্নালে প্রকাশিত হয়।

৩। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯৩। আবদুস সালাম কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয, দিল্লীর পুনর্মূদ্রণ, ১৯৭৫।

৪। সৈয়দ এলাহী বখশ মালদহের ইংরেজ বাজারের অধিবাসী ছিলেন।

৫। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৯৫। সম্প্রতি এটি ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দেখুন, আবদুল করিমঃ *গৌড়-পাণ্ডুয়ার ইতিহাস বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ভল্যুম, ১৩৯৭।

৬। আভিধানিক অর্থ বাদ দিয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা স্থানীয় ইতিহাস বলতে যে কোন স্থানের ঐতিহাসিক বর্ণনা, ভৌগোলিক বিবরণ, বিভিন্ন পরিসংখ্যান, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, রাজস্ব ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান এবং সে স্থানের গণ-মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বুঝে থাকি। স্থানীয় ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ- মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, "বাংলাদেশে স্থানীয় ইতিহাস চর্চাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বত্রিশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৯৫ বাংলা, পৃষ্ঠা- ৮৬-৯৯।

৭। তারীখ-ই-নসরতজঙ্গী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-
Mohammed Mohibullah Siddiquee. "Tarikh-i-Nusratjangi: An Evaluation" *Journal of the Institute of Bangladesh Studies*. Vol. XV May, 1992 pp. 1-12.

৮। সিরাজুল ইসলাম, *বাঙলার ইতিহাসঃ উপনিবেশিক শাসন কাঠামো ১৭৫৬-১৮৫৭* (ঢাকাঃ বাঙলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃঃ ৬৫)

৯। অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ১৮০৭ সনে এফ. এইচ.বুকাননকে স্থানীয় ইতিহাস প্রণয়ন প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগ করেন। তিনি ১৮১৬ সনে কাজ শেষ করে কোম্পানীর কাছে দাখিল করেন যাহা ১৮৩৩ সনে তাঁর মৃত্যুর পর কলিকাতাস্থ ব্যপ্টিষ্ট মিশন প্রেস থেকে *A Geographical, Statistical and Historical Description of the District or Zilla of Dinajpur in the Province or Soubah of Bengal* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

১০। রিপোর্ট তিনটা হলো A. K. Kabiruddin Ahmed. *A Final Report on the Survey and Settlement Operation of the Pargana Dandra in the district of Noakhali 1911-17*. Calcutta: Bengal Secretariate Book Deport, 1918; M. A. Momen. *A Final Report on the Survey and Settlement operation in the district of Jessore, 1920-1924*. Calcutta: Bengal Secretariate Book Depot 1925; and Mataharul Hoque. *A Final Report on the Survey and Settlement Operation in the district of Bakarganj (Revisional) 1940-42; and 1945-46*. Calcutta: Bengal Secretariate Book Depot. 1946.

১১। S.N.H. Rezvi (ed.) *East Pakistan District Gazetteers, Dacca*. (Dacca: East pakistan Govt. Press, 1969), p. I.

১২। *প্রাগুক্ত*,

১৩। *প্রাগুক্ত*,

১৪। এখানে উল্লেখ্য যে এস. এন. এইচ. রিজভীর সম্পাদনায় ঢাকা (১৯৬৯), সিলেট (১৯৭০) ও চট্টগ্রাম (১৯৭০), নূরুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় কুমিল্লা (১৯৭৭), ফরিদপুর (১৯৭৭), রংপুর (১৯৭৭), নোয়াখালী (১৯৭৭), ময়মনসিংহ (১৯৭৮) ও পাবনা (১৯৭৮), ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় দিনাজপুর (১৯৭৫), রাজশাহী (১৯৭৬) ও কুষ্টিয়া (১৯৭৬), কে. জি. এম. লতিফুল বারীর সম্পাদনায় খুলনা (১৯৭৮), যশোহর (১৯৭৯) ও বগুড়া (১৯৭৯)। মুহাম্মদ ইসহাকের সম্পাদনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম (১৯৭১), মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় বাকেরগঞ্জ (১৯৮০) এবং মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. এ. লতিফের সম্পাদনায় পটুয়াখালী (১৯৮২) ও টাঙ্গাইল (১৯৮৩) প্রকাশিত হয়।

১৫। ভল্যুমগুলো করাচী থেকে পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট ও কাশ্মীর সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের পাবলিকেশান্স ম্যানেজার কর্তৃক ১৯৬১ সনে প্রকাশিত হয়।

১৬। ভল্যুমগুলো ঢাকাস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন পরিসংখ্যান ব্যুরো (লোকগণনা শাখা) কর্তৃক ১৯৭৪ সনে প্রকাশিত হয়।

১৭। A.H. Dani. *Dacca-Records of its changing fortune*. (Dacca: S. S. Dani, 1956) p. IX.

১৮। Abdul Karim, *Dacca, the Mughal Capital* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1964). p. VIII.

১৯। *Ibid.* pp. 109-514.

২০। A.B.M. Mahmood, *The Revenue Administion of the Northern Bengal 1765-1793.* (Dacca: National Institute of Public Administration 1970) pp. III-IV.

২১। A.M. Serajuddin, *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong 1761-1785.* (Chittagong: University of Chittagong, 1971), p. 2.

২২। K.M. Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765-1793,* (Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1973), p. VII.

২৩। এ অভিসন্দর্ভগুলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আছে এবং নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলোঃ- Md. Mahabubur Rahman, *Village Life in Colonial Bengal: Change and Continuity in Rangpur District, 1870-1940,* (1988); Mohammed Mohibullah Siddiquee, *Socio-economic Development of a Bengal District: A Study of Jessore, 1883-1925.* (1989) and M.A. Matalib, *The Socio-economic History of Pabna District, 1872-1935"* (1990).

২৪। Abdul Karim, "An Account of the District of Dacca, Dated 1800" *Journal of the Asiatic Society of pakistan,* Vol. VII, No. 2. 1962 p. 290.

২৫। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের ফারসী সাহিত্য,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৩), পৃঃ ১২১।

২৬। *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 2. No. 6.* (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1911) pp. 121-153.

২৭। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৬৪।

২৮। *প্রাগুক্ত.*

২৯। ডঃ মতিউর রহমান, *আঈনায়-ই-ওয়াসীয়া* (পাটনাঃ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮) পৃঃ ৯০।

৩০। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৬।

৩১। এ. এম. এম. শরফুদ্দীন, "মুন্‌শী রহমান আলী তয়েশ ও তওয়ারীখ-ই-ঢাকা" *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা* সংখ্যা- ১৩-১৫, ১৯৮৪-৮৬, পৃঃ ৮৬।

৩২। সৈয়দ ইকবাল আযীম *মাশরেকী বাঙ্গালমে উর্দূ* (ঢাকাঃ কোপারেটিভ বুক পাবলিসার্স, ১৯৫৪) পৃঃ- ৭১।

৩৩। *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১১২।

৩৪। *প্রাগুক্ত,*

৩৫। ঢাকার উপর প্রকাশিত গ্রন্থ দুটো হল Syed Aulad Hossain, *Antiquities of Dacca.* Dacca 1912 and Syed Mohammed Taifoor, *Glimpses of old Dacca,* Dacca: S.M. Perwez, 1952.

৩৬। চট্টগ্রামের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ দুটো হল Syed Ahmadul Hoq, *History of Chittagong,* Chittagong: 1948, and Syed Martuza Ali, *History of Chittagong,* Dacca: Standard Publishers Ltd., 1964.

৩৭। কুষ্টিয়ার উপর প্রকাশিত গ্রন্থটি হলো Z.A. Tofaiell, *History of Kushtia,* Dacca: Ziaunnahar Khanam, 1966.

৩৮। সৈয়দ শব্দের অর্থ হলো 'নেতাস্ব। ইসলামের ইতিহাসে নবী বংশের সদস্যদের সৈয়দ বলা হয় এবং তাঁরা এক বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। সৈয়দ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ A. K. Nazmul Karim, *Changing Society in India and Pakistan*, Dacca: Ideal Publications, 1956: Abdul Karim, *Social History of the Muslims of Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1959; M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Karachi: Pakistan Historical Society, 1963; H.K. Arefeen, "Muslim Stratification patterns in Bangladesh: An Attempt to build theory" *Journal of Social Studies* No. 16; Moulvi Abdul Wali, Ethagraphical Notes on the Muhammadan Caste of Bengal" *Journal of the Anthopological Society of Bombay*. Vol. VII; and Jemes Wise "The Muhammadan of Eastern Bengal" *Journal of the Asiatic Society of Bengal*. Vol. LXIII, Part III.

৩৯। আলোচ্য প্রবন্ধের ৪.ঘ অংশটি মূলত দুটো প্রকাশিত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে প্রণীত এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয় হলোঃ- (ক) আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ এবং (খ) মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, *বাংলাভাষায় মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি* ১৪০-১৯৮৪ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, রাজশাহীঃ মিসেস রোকেয়া খাতুন, ১৯৮৮।

৪০। গ্রন্থগুলো প্রকাশকাল অনসুারে ক্রমধারা অবলম্বনে লিখা হলোঃ- কাজী মহাম্মদ আহমদ, *শ্রীহট্ট দর্শন* সিলেটঃ গ্রন্থকার, ১৮৮৫, সৈয়দ আব্দুল আগকার, *তরফের ইতিহাস*, কলিকাতাঃ বিনোদবিহারী, ১৮৮৬, মুখতার আহমদ সিদ্দিকী, *সিরাজগঞ্জের ইতিহাস*, কলিকাতাঃ গ্রন্থকার, ১৯১৫, ইবনে সবর, *সয়িদপুরের ইতিহাস*, কলিকাতাঃ আহমদ আল-কাদেরী, ১৯২১, নাসের হোসেন জাফরী, *বারবাজারের পুরাতত্ত্ব* যশোহরঃ আব্দুল করিম মুহাম্মদ আক্রাম আলী এনায়েতপুরী, ১৯২৯, রফিউদ্দিন সরকার, *সিংহতোড়ের ইতিহাস*, দিনাজপুরঃ গ্রন্থকার, ১৯২৯, এ, কে, এম, মুকাররিমবিল্লাহ চৌধুরী, *নোয়াখালীর ইতিহাস*, নোয়াখালীঃ গ্রন্থকার, ১৯৩০, আব্দুল করিম খান, তরফ *গৌরাঙ্গীর ইতিহাস*, টাঙ্গাইলঃ তোরাবুদ্দীন মিঞা, ১৯৩৫, মুখতী আজহারউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি*, সিলেটঃ গ্রন্থকার, ১৯৩৮, তসদ্দক হোসাইন, *গড়মন্দোরণ কলিকাতাঃ* চৌধুরী আহমদ রেজা, ১৯৪১, মাহবুবুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল ও কোম্পানী আমল*, চট্টগ্রামঃ গ্রন্থকার, ১৯৪৭ এবং মৌলভী মোজাফফর আহমদ প্রণীত *উলুনিয়ার কাহিনী* (গ্রন্থটি বৃটিশ আমলে প্রকাশিত যদিও সন তারিখ আমাদের হাতে নেই)।

৪১। পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থগুলো তাদের প্রকাশকাল অনুসারে বর্ণনা করা হলোঃ- গোলাম মোহাম্মদ, *জামালপুরের গণইতিবৃত্ত*, জামালপুরঃ আমিন বেগম, ১৯৫৪, কাজী এম. মিছের, *বগুড়া কাহিনী অতীত ও বর্তমান*, বগুড়াঃ অনুসন্ধান অফিস, ১৯৫৭, সৈযদ মর্তজা আলী সম্পাদিত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রণীত *ইসলামাবাদ*, ঢাকাঃ বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৪, সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, *দিনাজপুরের ইতিহাস* দিনাজপুরঃ নওরোজ সাহিত্য মজলিশ, ১৯৬৫; কাজী এম. মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ২ খণ্ড, শিবগঞ্জঃ সৈয়দা হোসনে আরা বেগম, ১৯৬৫-৬৬, মোঃ মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, দিনাজপুরঃ নওরোজ সাহিত্য মজলিশ, ১৯৬৫, আব্দুল জলিল, *সুন্দর বনের ইতিহাস*, ৩ খণ্ড, খুলনাঃ মেহদীবিল্লাহ, ১৯৬৬, এম, আব্দুল হামিদ, *চলন বিলের ইতিকথা*, পাবনাঃ আমার দেশ প্রকাশনী, ১৩৭৪,

আমানুল্লাহ খান, *আজকের বগুড়াঃ অতীত ও বর্তমান,* বগুড়াঃ গ্রন্থকার, ১৯৬৮, খলিল উদ্দিন আহমদ, *বিক্রমপুরের ইতিহাস,* ঢাকাঃ গ্রন্থকার, ১৯৬৯, দেলোয়ার হোসেন, *শেরপুরের ইতিকথা,* শেরপুরঃ পৌরসভা, ১৯৬৯, মোহাম্মদ আফজল (খান সাহেব) *নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস,* নওগাঁঃ গ্রন্থকার, ১৯৭০, এ.কে.এম. শামসুদ্দিন তরফদার বগুড়ার ইতিহাস, বগুড়াঃ উমেদা খাতুন, ১৯৭০, খোরশেদ আলী, *টাঙ্গাইলের ইতিহাস* টাঙ্গাইলঃ গ্রন্থকার, ১৯৭০, খান সাহেব এম আব্দুল্লাহ, *মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস* মোমেনশাহী, গ্রন্থকার, ১৯৭১ এবং নজিমউদ্দিন আহমদ, *মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতি,* ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯।

৪২। বাংলাদেশে আমলে প্রকাশিত স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থগুলো হলোঃ এ. কে. এম. নাছিরউদ্দিন, *নীলফামারীর ইতিহাস,* রংপুরঃ গ্রন্থকার, ১৯৭৫, মোঃ লুৎফর রহমান, *রঙ্গপুর জেলার ইতিহাস,* রংপুরঃ কের্য়াবন প্রকাশনী, ১৩৮২, আব্দুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ,* চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার, ১৯৭৬, মোহাম্মদ আফজল (খান সাহেব), *মহাস্থানগড়ের ইতিহাস,* বগুড়াঃ মহাস্থানগড় মাজার শরীফ, ১৯৭৬, নূরুল হক, *বৃহত্তর চট্টলা,* চট্টগ্রামঃ গ্রন্থকার, ১৯৭৬, নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, ঢাকাঃ আজাদ মুসলিম ক্লাব, ১৯৭৬, কাজী মোজাম্মেল হক, *ইতিহাসের রূপরেখায় ফেনী,* ফেনীঃ কাজী ফজলুলহক, ১৯৭৭, সামশুল হক, *গফরগাঁয়ের কথা ও কাহিনী,* গফরগাঁও ইতিহাস সংকলন সংস্থা, আ. শ. ম. শওকত আলী, কুষ্টিয়ার ইতিহাস, কুষ্টিয়াঃ মণিকা শওকত, ১৯৭৮, আব্দুর রহীম খন্দকার, টাঙ্গাইলের ইতিহাস, টাঙ্গাইল, যমুনা প্রকাশনী, ১৯৭৮, মোঃ মেহরার আলী, *দিনাজপুরের আদিবাসী,* দিনাজপুরঃ *আদিবাসী* সংস্কৃতিক একাডেমী, ১৯৮০, আব্দুল হক চৌধূরী, *সিলেটের ইতিহাস প্রসঙ্গ,* চট্টগ্রামঃ গ্রন্থকার, ১৯৮১, মোঃ মেহরাব আলী, রামসাগর দিনাজপুরঃ গ্রন্থকার, ১৯৮৯, সিরাজউদ্দিন আহমদ, *বরিশালের ইতিহাস,* বরিশালঃ জেলা পরিষদ, ১৯৮২, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম খুলনা জেলা, খুলনাঃ সাপ্তাহিক খুলনা, ১৯৮২, মুহাম্মদ মমতাজুর রহমান (সম্পদ), *নড়াইলের ইতিহাস,* নড়াইলঃ মহকুমা সমিতি, ১৯৮২, আখতার আলী খোন্দকার, *পোরশার ইতিহাস,* রাজশাহীঃ শাহ আব্দুল গফুর, ১৯৮২, রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা,* ঢাকাঃ আহমদ পাব্লিলিসিং হাউজ, ১৯৮২, মোঃ মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের রাজবংশের ইতিহাস,* দিনাজপুরঃ রাজদেবোত্তর ষ্টেট, ১৯৮২।

৪৩। S. M. Ali. *History of Chittagong.* (Dacca: Standard Publishers Ltd., 1964), p. III.

৪৪। কাজী মোহাম্মদ মিছের *রাজশাহীর ইতিহাস,* (শিবগঞ্জঃ সৈয়দা হোসনে আরা বেগম, ১৯৬৫), পৃষ্ঠা-ভূমিকা-৩।

আদালত অবমাননা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এ. বি. সিদ্দিক

ভূমিকা

বর্তমান জগতে 'আদালত অবমাননা' এক অতি সুপরিচিত অভিব্যক্তি, কিন্তু বাংলাদেশে এর প্রকৃতি ও পরিধি সুস্পষ্ট নয়। তাই সাধারণ ব্যক্তিতো দূরের কথা আইনে পারদর্শী ব্যক্তিকেও কখনো কখনো আদালত অবমাননা অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। এর মূল কারণ হচ্ছে এ সম্পর্কে আইনের অস্পষ্টতা এবং এর পরিধির ব্যাপকতা। এছাড়া এ অপরাধ সংঘটনের পন্থাও অসংখ্য। আদালতই স্থির করবেন কোন বিশেষ কাজ বা আচরণ এ অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কি না। আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আইনও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন (The contempt of courts Act. 1926) ছাড়াও দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধি, দেওয়ানী কার্যবিধি এবং বাংলাদেশের সংবিধানে এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে। এছাড়াও উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ এবং প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশ কমন লম্ব এর নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা আইন সম্পর্কে আলোকপাত সহ এ অপরাধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

আদালত অবমাননা বলতে কি বুঝায়

সাধারণ অর্থে আদালত অবমাননা বলতে বিচারের প্রতি অশ্রদ্ধা, বিচারককে অসম্মান করা বা তার আদেশ অমান্য করা বুঝায়। ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনে আদালত অবমাননার কোন সংজ্ঞা দেয়া না হলেও এ সম্পর্কিত বিলে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ-

যে কেউ মুখের কথায় বা লিখিতভাবে বা কোনরূপ সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা বিচার প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে বা বাধাপ্রদান করে কিংবা হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদানে উদ্যত হয় অথবা আদালতের কর্তৃত্বকে হেয় করে বা অবজ্ঞা করে কিংবা হেয় বা অবজ্ঞা করতে উদ্যত হয়, সে আদালত অবমাননা করেছে বলা যায়। যেহেতু এ অপরাধটি সংঘটনের পন্থা অসংখ্য এবং বিস্তৃত এলাকায় এটা ব্যাপৃত সেহেতু এই বিলটি আইনে পরিণত করার সময় উক্ত সংজ্ঞাটি পরিহার করা হয়েছে। অসল্ড (Oswald) এ বিষয়ে প্রথম ইংল্যাণ্ডে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি বলেন, আদালত অবমাননা বলতে এমন কোন আচরণকে বুঝায় যা আইনের কর্তৃত্ব ও প্রশাসনকে অসম্মান প্রদর্শন করে কিংবা বিচারাধীন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে।[২] হ্যালসবেরীর মতে, মুখের কথায় বা লিখিতভাবে বিচার প্রশাসনে বাধা দেয়া বা বাধা দিতে উদ্যত হওয়া আদালত অবমাননা।[৩]

বিচারপতি উইলিয়াম বলেন যে, আদালতের নোটিশ, আদেশ অথবা ডিক্রির মাধ্যমে কোন পক্ষ কর্তৃক যা করতে দেয়া হয় তা না করা অথবা যা করতে নিষেধ করা হয়-তা করাই হচ্ছে আদালত অবমাননা।[৪]

ভারতীয় আদালতের বিচারপতি নিয়োগী বলেন যে, আদালত অবমাননা পূর্ণাঙ্গভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। আদালত অবমাননার আইন বিচারের সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপৃত। বিচার কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য সঠিক ঘটনা উদঘাটন করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কোন কিছু যা বিচারের হস্তকে ব্যাহত বা খাটো করে, তা'ই হচ্ছে আদালত অবমাননা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মতে, যে সকল আচরণ আইনের ক্ষমতা ও প্রশাসনকে অবজ্ঞা বা হেয় প্রতিপন্ন করে বা করতে উদ্যত হয় তাকে আদালত অবমাননা বলে[৫]

মুহাম্মদ সলিমুল্লাহ খান বনাম রাষ্ট্র ঃ[৬] মামলায় পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট বলেন যে, এই অপরাধের প্রকারভেদ এমন ব্যাপক যে, এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা ও বর্ণনা দেয়া যায় না। উপরি-উক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, পরিধির ব্যাপকতা এবং অপরাধ সংঘটনের অসংখ্য পন্থার কারণে আদালত অবমাননার যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হয়নি। অপরাধের প্রকৃতি, ধরণ এবং বিচার প্রশাসনে হস্তক্ষেপ বা এর প্রবণতার উপর ভিত্তি করে এ অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়।

অবমাননা আইনের উদ্দেশ্য

সমাজের মঙ্গলের জন্যই আইনের সৃষ্টি। অর্থাৎ জনগণের কল্যাণই হচ্ছে আইন। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্যই আদালতের সৃষ্টি। তাই জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থেই আদালতের আবির্ভাব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য। এ সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিকারের জন্য আদালতের দ্বারস্ত হয়। আইনে প্রদত্ত অধিকার গুলি যেনো সে নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে তার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সে আদালতের শরণাপন্ন হয়। সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য সুবিচার নিশ্চিত করতে আদালতকে আইনের নীতিগুলি অনুসরণ করতে হয় এবং জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে এগুলি প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য যাঁরা বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত তাঁরা যেনো অপমান, বিরক্তি বা বাধার সম্মুখীন না হন, তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এটা লক্ষ্য করেই অবমাননা আইনের ধারণার সৃষ্টি হয়।

আইন ও আদলতের প্রতি জনগণের আস্থা, ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। বিচার কার্য সমাধা করতে গিয়ে বিচারককে যদি প্রতিনিয়ত অন্যের সমালোচনা বা আক্রোশের সম্মুখীন হতে হয়, তবে সে বিচারক নিরপেক্ষভাবে ও সুষ্ঠুভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন না। ফলে জনগণ বিচার কার্যে আস্থা হারাবেন। জনগণের আস্থা অটুট রাখাই হচ্ছে আদালত অবমাননা আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অর্থাৎ জনগণের আস্থা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিচারকদের মর্যাদা, ক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। অবাধ ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক সভ্য দেশে উচ্চ আদালতকে সহজাত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ. আর. কর্ণেলিয়াসের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন,

যে সকল আদালতের নিজস্ব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা নেই কিংবা থাকলেও নিজ ক্ষমতা বলে সে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় সে সকল আদালত দ্রুত জনগণের আস্থা হারাবে এবং পরিণতিতে আদালতের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হবে। আদালতের মর্যাদা ও ক্ষমতা আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের সাথে সংযুক্ত। যে সকল আচরণ এ সকল ক্ষমতা বা মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে প্রবৃত্ত হয় সেগুলি ফৌজদারী অবমাননা যার জন্য শাস্তি প্রদান করা আদালতের কর্তব্য।[৭]

রাষ্ট্র বনাম মীর আবদুল কাউয়ূম[৮] মামলায় এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়েছেঃ-

(ক) বিচারকগণের মর্যাদা, দক্ষতা এবং ন্যায়পরতার ব্যাপারে জনগণের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস বজায় রাখা আদালত অবমাননা আইনের উদ্দেশ্য যেনো জনগণ আদালতের রায়, আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাকে সম্মানের চোখে গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন।

(খ) বিচারকগণ যাতে সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে ন্যায় বিচার সম্পন্ন করতে পারেন সে ব্যাপারে বিচারকগণকে নিরাপত্তা প্রদান করা আদালত অবমাননা আইনের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্র বনাম আবদুর রশিদ[৯]

মামলায় বলা হয়েছে যে, আদলতের মান-মর্যাদা ও কর্তৃত্বকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সরকারের। কাজেই আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে অবমাননাকারীর ব্যাপারে সরকারেরই উচিত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কেবল বিচারকের উপর ছেড়ে দেয়া উচিৎ হবে না।

উৎপত্তি

বাংলাদেশে প্রযোজ্য আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আইন মূলত ব্রিটিশ কমন লম্ব হতে উদ্ভুত। ইংল্যাণ্ডে দ্বাদশ শতাব্দী হতে আইনের জগতে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে, যদিও এই অপরাধটি আইনের মতই অতি পুরাতন।[১০]

প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে রাজাকে স্বর্গীয় প্রতিভু হিসেবে সম্ভাষণ করা হতো এবং তিনি ছিলেন ন্যায় বিচার ও সত্যের প্রতিরূপ। তাঁর কথাই ছিল আইন এবং তিনি কোন অন্যায় করতে পারেন না বলে গণ্য করা হতো। তিনি নিজেই বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন, যদিও তিনি প্রায়ই এ বিষয়ে বিদ্যান লোকজনের পরামর্শ নিতেন। কালের বিবর্তনে এ ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে এবং কতিপয় বিশেষজ্ঞের নিকট বিচার কার্যের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা অবশ্য রাজার নামেই এ বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। রাজার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনরূপ আপত্তি না করে তা মানতে সকলে বাধ্য ছিল। এ সকল বিচারকগণ রাজার ন্যায় এরূপ সুবিধা ভোগ করতেন। এ সকল বিচারকদের অবজ্ঞা করার অর্থ ছিল রাজাকে তথা সমগ্র সার্বভৌমত্বকে অবজ্ঞা করা, যার জন্য যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষেও হিন্দু রাজারা তাঁদের উপদেষ্টা পরিষদের সহায়তায় এবং ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। মোগল আমলে বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্য বাদশাহ

'কাজী' নিয়োগ করতেন। এই কাজীরা পবিত্র কোরানের ও সুন্নাহর অনুসরণে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন।[১১] কাজীরাও অবমাননাকারীদের শাস্তি দিতে পারতেন।

মোগল আমলের পর ইংরেজরা এদেশ শাসন করেন। ১৬০০ সালে রাণী এলিজাবেথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সনদ প্রদার করেন, যার বলে এই কোম্পানী অন্যান্য অধিকারের সাথে এদেশে আইন প্রণয়ন করার অধিকার অর্জন করেন। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ করা হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ামে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। সকল প্রকার বিচার প্রশাসন এই কোর্টের আওতায় আসে। পরবর্তীকালে দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধি আইন বিধিবদ্ধ করা হয় এবং আদালত অবমাননা সম্পর্কে বিধানাবলী সনিবেষ্ট করা হয়। এছাড়া ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি আইনেও আদালত অবমাননার প্রতিকার রয়েছে।

ভারতবর্ষের গর্ভনর জেনারেল লর্ড মিন্টু ১৯০৮ একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমতঃ হাইকোর্টগুলি আদালত অবমাননা হতে যেনো নিজেদের রক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয়তঃ হাইকোর্টের অধঃস্তন কোর্টগুলির অবমাননার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইকোর্টকে ক্ষমতা প্রদান করা। ১৯১৪ সালে বিলটি উত্থাপিত হয় কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তা স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীকালে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন (The contempt of court Act. 1926 (Act. XII)) প্রবর্তন করা হয় যা মূলতঃ ব্রিটিশ কমন ল' এর ভিত্তিতেই প্রণীত হয়েছে। অবমাননার বিস্তারিত বিষয় এই আইনে নেই, তবে অবমাননাকারীর শাস্তির সীমা এতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইনটি কর্তমানেও বলবৎ হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি দেশের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ যা পুর্ব-পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল তা এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানে এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত কিছু বিধান রয়েছে।

আইনের বর্তমান অবস্থা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিভিন্ন আইনে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন, ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান। এ ছাড়া উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত এই আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন মামলায় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন এবং আপিলেট ডিভিশন যে সকল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং যে সকল বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা বর্তমানে এই আইনের মূখ্য অবলম্বন।

(ক) আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬

এই আইনে অবমাননা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই, শুধু শাস্তির সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই আইনের ২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, (৩) উপধারার বিধান সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগ নিজস্ব অবমাননার জন্য যেরূপ এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যে পদ্ধতি ও রীতি-নীতি অনুযায়ী

প্রয়োগ করছেন, অধস্তন আদালতের অবমাননার ব্যাপারেও হাইকোর্ট বিভাগের তদ্রুপ ক্ষমতা থাকবে।

(৩) উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, হাইকোর্ট বিভাগ এর অধস্তন আদালতের প্রতি সংঘটিত হয়েছে বলে কথিত অবমাননা আমলে নিবেন না যদি উক্ত অবমাননা দণ্ডবিধির অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়।

এই উপধারাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লাহোর হাইকোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই উপধারার বিধান থাকা স্বত্ত্বেও হাইকোর্ট তার অধস্তন আদালতের প্রতি কথিত অবমাননা আমলে নিতে পারবেন, যেহেতু "উক্ত অবমাননা দণ্ডবিধির অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ"- শব্দগুলির অর্থ এই যে, অবমাননা অবশ্যই অবমাননা হিসেবে দণ্ডবিধির অধীনে শাস্তিযোগ্য হতে হবে, কেবল অন্যভাবে অন্য কোন অপরাধের কারণে নয়।[১২] এলাহাবাদ হাইকোর্টও একমত প্রকাশ করে উল্লেখ করেন যে, ২ নম্বর ধারার (৩) উপধারা শুধু ঐ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যেখানে বর্ণিত অপরাধ অবমাননা হিসেবে দণ্ডবিধি আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য হয়। যেমন, পরিস্থিতিগত কারণে যদি কোন কর্ম একই সাথে অবমাননা এবং দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৯ ধারায় মানহানির অপরাধ সংঘটিত করে, তবে আদালত অবমাননা আইন মোতাবেক হাইকোর্ট কর্তৃক উক্ত অবমাননা আমলে নিতে বাধা নেই।[১৩]

এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, বর্তমানে বলবৎ অপর কোন আইনে প্রকাশ্যভাবে ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে আদালত অবমাননার শাস্তি ৬ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেয়া যাবে। তবে শর্ত থাকে যে আদালতের সন্তুষ্টিতে ক্ষমা প্রার্থনা করা হলে আসামী অব্যাহতি পেতে পারে অথবা প্রদত্ত দণ্ড মওকুফ করা যেতে পারে।

হাইকোর্টের সহজাত ক্ষমতা বলে অবমাননার ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাদণ্ড প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রভাব ফেলবে কিনা হরিকিশেন লাল বনাম দি ক্রাউন[১৪] মামলায় লাহোর হাইকোর্ট তা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পান। হরিকিশেন লালকে পৃথক পৃথক চার কারণে আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তৃতীয় বার তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে হাইকোর্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হাজতে আটক রাখা হয়। ঐ মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন আদালত অবমানার ব্যাপারে হাইকোর্টের অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাদণ্ড প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রভাব ফেলবে না, এবং এমনকি হাইকোর্ট যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও প্রদান করতে পারেন।

১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে যাচ্ছে লক্ষ্য করে ১৯৩৭ সালে তা সংশোধন করা হয় এবং একটি শর্ত সংযোজন করা হয়। এতে বলা হয় যে, আরোশর্ত থাকে যে, অন্যত্র যে কোন আইনে যাহই বলা থাকুক না কেন হাইকোর্ট বিভাগ নিজের অথবা এর অধস্তন আদালতের অবমাননার জন্য অত্র ধারায় বর্ণিত দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ড প্রদান করবেন না। এভাবে এরূপ শর্ত সংযোজন করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাদণ্ড প্রদানের ব্যাপারে হাইকোর্টের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়।

তবে, হাইকোর্ট স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের অবমাননার ব্যাপারে অথবা অধস্তন আদালতের অবমাননার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।[১৫]

(খ) দণ্ডবিধি

দণ্ডবিধির ১৭২ হতে ১৯০ পর্যন্ত ধারায় সরকারী কর্মকর্তার আইনানুগ ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্বে ইস্যুকৃত সমন, নোটিশ বা আদেশ ইত্যাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করলে ১৭২ ধারার বিধান অনুযায়ী তাকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ৫ শত টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। তবে সমন বা নোটিশ বা আদেশ যদি স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ হাজির হওয়ার কিংবা আদালতে কোন দলিল পেশের নির্দেশ সম্বলিত হয়ে থাকে তাহলে সে ব্যক্তিকে ৬ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড, কিংবা ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা কিংবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

সমনজারী বা কোন আইনগত কার্যক্রমে বাধা প্রদান করলে কিংবা এরূপ সমন বা নোটিশ যা আইন সম্মতভাবে কোথাও লাগানো হয়েছে তা অপসারণ করলে ১৭৩ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে।

সমন, নোটিশ বা আদেশ অনুসারে আদালতে বা নির্দিষ্ট স্থানে কোন ব্যক্তি নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হতে ব্যর্থ হলে কিংবা হাজির হয়ে সময়ের পূর্বে সে স্থান হতে প্রস্থান করলে ১৭৪ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারী সমীপে কোন দলিল পেশ করতে আইনত বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও কেউ তা করতে ব্যর্থ হলে ১৭৫ ধারায় শাস্তির বিধান করা হয়েছে। ১৭৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট কোন নোটিশ বা সংবাদ দিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও, তা করতে ব্যর্থ হয়, তাকে এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ৫ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। উক্ত নোটিশ বা তথ্যটি কোন অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত হলে এরূপ ব্যর্থতার জন্য তাকে ৬ মাসে পর্যন্ত কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা কিংবা উভয় প্রকার দণ্ড দেয়া যেতে পারে।

সরকারী কর্মচারীর নিকট মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের জন্য ১৭৭ ধারা অনুযায়ী ৬ পর্যন্ত কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার দণ্ড দেয়া যেতে পারে। এই তথ্য যদি কোন অপরাধ সংক্রান্ত হয় তাহলে এই শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় প্রকার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক যথারীতি নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও শপথ গ্রহণ বা অঙ্গীকার করতে অস্বীকার করলে ১৭৮ ধারা অনুযায়ী ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা কিংবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করা ১৭৯ ধারা অনুযায়ী দণ্ডণীয় অপরাধ।

যদি কোন ব্যক্তি তার বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করার জন্য আইনানুগ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক নির্দেশিত হবার পর স্বাক্ষর দান করতে অস্বীকার করে তাহলে ১৮০ ধারা অনুযায়ী

সে ব্যক্তিকে ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। সরকারী কর্মচারীর নিকট বা শপথ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণের পর মিথ্যা বিবৃতি দিলে ১৮১ ধারা অনুযায়ী তাকে ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

সরকারী কর্মচারীকে অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর কার্যে তাঁর আইন সম্মত ক্ষমতা প্রয়োগে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সংবাদ দেয়া ১৮২ ধারায় শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীর আইন সঙ্গত ক্ষমতাবলে কোন সম্পত্তির দখল নেয়ার কালে বাধাদান ১৮৩ ধারা মতে অবমাননা হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাধা দান বলতে শুধু মৌখিকভাবে আপত্তি জানানো বুঝায় না বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগে হুমকি দেয়া বুঝায়।[১৬] আইন সম্মত ক্ষমতা বলে আটককৃত সম্পত্তি যদি কোন সরকারী কর্মচারীর হেফাজত হতে জোর পূর্বক নেয়া হয়, তবে অত্র ধারায় অপরাধ হবে।[১৭]

সরকারী কর্মচারী হিসেবে কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনসম্মত ক্ষমতাবলে নিলামে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বিক্রিতে বাধাদান করা ১৮৪ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া নিলামে খরিদ করতে আইনত অযোগ্য ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নিলামে খরিদ করে বা নিলাম ডাকে তবে তাও ১৮৫ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৮৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীকে সরকারী কার্য সম্পাদনে ইচ্ছাপূর্বক বাধাদান করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা ৫ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করতে আইনত বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাঁর এই ব্যর্থতা ১৮৭ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরূপ সহায়তা যদি আদালতের সমন কার্যকরী করা বা অপরাধ সংক্রান্ত হয় তবে ব্যর্থতার জন্য শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া সরকারী কর্মচারী কর্তৃক যথারীতি জারীকৃত আদেশ অমান্য করলে ১৮৮ ধারার বিধান মতে তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে, যদি এরূপ অমান্যের দরুন আইন সম্মতভাবে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হয়। বিষণ দণ্ড বনাম এম্পারার[১৮] মামলায় এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ অমান্য করা হলে এই অপরাধ সংঘটিত হবে। কোন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষতি সাধনের হুমকি দিলে ১৮৯ ধারার বিধান মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। এছাড়া সরকারী কর্মচারীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা হতে বিরত থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তাঁকে ক্ষতিসাধনের হুমকি প্রদান ১৯০ ধরা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোন সরকারী কর্মচারী বিচার কার্যক্রম চালানোর সময় কেউ তাঁকে অসম্মান করে কিংবা বাধা প্রদান করে তবে দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা অনুযায়ী তা আদালত অবমাননা হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ধারায় বলা যে,

"কোন সরকারী কর্মচারী কোন বিচার বিষয়ক কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে রত থাকা কালে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে অবজ্ঞা করে অথবা তাঁর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা হলে সে ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন অংকের অর্থ দণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে"।

২২৮ ধারার তিনটি মূল উপাদান রয়েছে এগুলি নিম্নরূপঃ-

(ক) অপমান করার ইচ্ছা প্রমাণ করতে হবে;

(খ) অপমান বা বাধা অবশ্যই কোন সরকারী কর্মচারীর প্রতি করতে হবে; এবং

(গ) সেই কর্মচারী কর্তৃক কোন বিচারকার্য সমাধা কালে এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকবে।

অপমান করার ইচ্ছা

আদালতের প্রতি অপমান বা আদালতের কাজে বাধাদান যদি আসামীর ইচ্ছায় সংঘটিত না হয়, তবে তাকে দায়ী করা যাবে না।[১৯] লাহোর হাইকোর্টের মতে, যদি বিচারক অনুভব করেন যে, তিনি অপমানিত হয়েছেন, তবে ঐ অপমান আসামীর ইচ্ছায় হয়েছে বলে ধরা যায় না[২০] এ ছাড়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দকর জুতা পায়ে আদালতে হাঁটা ইচ্ছাকৃত অপমান নয়।[২১] তবে আদালতকে লক্ষ্য করে তিরস্কার করা ইচ্ছাকৃত অপমান করা।[২২] প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করা ইচ্ছাকৃত বাধাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে। গোপি চান্দ বনাম ক্রাউন[২৩] মামলার ঘটনায় প্রকাশ, আপীলকারী সাক্ষীর কাঠগড়ায় যাবার পূর্বে সময়ের প্রার্থনা জানায়। আদালত এটা নাকচ করেন এবং কৌশলীকে জবানবন্দী গ্রহণের নির্দেশ দেন। আপীলকারীর সময়ের আবেদন নাকচ করার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে। তার এরূপ আচরণ ইচ্ছাকৃত বাধাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া আদালতকে পক্ষপাত দুষ্ট বলে অভিহিত করা, 'বিচারকের প্রতি ইচ্ছাকৃত আঘাত',[২৪] সতর্ক করার পরও হয়রানীপূর্ণ ও অপ্রাসংগিক প্রশ্ন করার জন্য পীড়াপীড়ি করা আদালত অবমাননা হিসেবে গণ্য হবে।[২৫]

শ্যামলাল এ্যাডভোকেট[২৬] মামলার ঘটনায় প্রকাশ আইনজীবী আদালতের সামনে বক্তব্য রাখেন যে, ঐরূপ গঠিত বেঞ্চের সম্মুখে সওয়াল জবাব না করার জন্য তাঁর মক্কেল তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে। বক্তব্য আদালতের সম্মানের প্রতি ইচ্ছাকৃত আঘাত বলে গণ্য হয়েছে।

বিচার কার্যে নিয়োজিত থাকা

২২৮ ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সরকারী কর্মচারীকে তাঁর বিচারকার্যে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় অপমান করা বা কাজে বাধাদান হতে হবে। বিচারকার্যে নিয়োজিত না থাকা অবস্থায় অপমান বা বাধাপ্রদান এই ধারা অনুযায়ী অপরাধ নয়।

বিচার বিষয় কার্যক্রম কোনটা তা অবশ্য স্পষ্টভাবে সকল সময় বুঝতে পারা যায় না। ১৯৫০ সালের এষ্টেট এ্যাকুইজিশন এণ্ড টেনান্সি এ্যাক্টের অধীনে রাজস্ব অফিসারকে আদালত বলা হয়নি। ফলে ২২৮ ধারার বিধান মতে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না বলে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট অভিমত

ব্যক্ত করেন।[২৭] কিন্তু একজন প্রসেস সার্ভারকে অপমানিত করা হলে আদালত অবমাননা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কেননা এটাকে বিচার প্রশাসনে অহেতুক হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[২৮] সাব-রেজিষ্ট্রার বা ইনকামট্যাক্স অভিসারের কার্যক্রম বিচার বিষয়ক কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।[২৯]

পূর্ণ চন্দ্র মাইজী বনাম রাষ্ট্র[৩০] মামলার ঘটনায় প্রকাশ, জনৈক অভিযোগকারী একটি অভিযোগ দায়ের করলে ম্যাজিষ্ট্রেট শপথ গ্রহণ পূর্বক অভিযোগকারীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারা মোতাবেক এতে অনুমোদন না থাকায় ঐ অভিযোগের বিচার তিনি করতে পারেন না। তাই তিনি অভিযোগটি খারিজ করে দেন। সাক্ষীদের জবাববন্দি ছাড়াই অভিযোগ খারিজ করায় অভিযোগকারী বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগকারীকে তার আইনজীবীকে ডেকে আনতে বললে অভিযোগকারী তা অমান্য করেন। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ২২৮ ধারায় তার বিরুদ্ধে প্রসিডিং রুজু করে তাকে শাস্তি প্রদান করেন। উচ্চ আদালত বলেন যে, অভিযোগ খারিজ করার পর ম্যাজিষ্ট্রেট বিষয়টির উপর তাঁর ক্ষমতা হারায়েছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগকারীকে তার আইনজীবীকে ডেকে আনার নির্দেশকে উক্ত বিষয়ের বিচারকার্য চলাকালে প্রদত্ত আদেশ বলা যায় না। এছাড়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য ছাড়া অভিযোগকারীর দরখাস্ত খারিজ করায় বিস্ময় প্রকাশ করা বিচারককে আঘাত করা নয় বলা হয়েছে।

(গ) ফৌজদারী কার্যবিধি আইন

১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮০ হতে ৪৮৭ এবং ১৯৫ ও ৪৭৬ ধারায় আদালত অবমাননা সম্পর্কে বিধি-বিধান রয়েছে। দণ্ডবিধির উল্লেখিত ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ আদালতের সম্মুখে সংঘটিত হলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮০ ধারা অনুযায়ী আদালত এই অপরাধ সংঘটনকারীকে আটক রাখতে পারেন এবং উপযুক্ত মনে করলে বিচার করে শাস্তি দিতে পারেন।

রাষ্ট্র বনাম আবু সাইয়িদ মোঃ ইদরিশ আলী সিকদার[৩১] মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজস্ব অফিসারকে যেহেতু আদালত বলা হয় না সেহেতু এর অবমাননার জন্য রাজস্ব অফিসার ৪৮০ ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। অবমাননার জন্য একজন সরকারী কর্মচারী দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা মতে যে প্রতিকার পাবার হকদার একজন রাজস্ব অফিসার সেরূপ প্রতিকার পেতে পারেন। তবে সরকারী নির্দেশ মতে, ৪৮৩ ধারার বিধান অনুযায়ী একজন রেজিষ্ট্রার বা সাব-রেজিষ্ট্রারকে দেওয়ানী আদালত হিসেবে গণ্য করা যায়।

৪৮০ ধারার বিধান অনুযায়ী কোন আদালত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে কিংবা ৫ শত টাকার উর্ধে জরিমানা কিংবা কারাদণ্ড প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে যথাযথ এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ৪৮২ ধারা মতে আসামীকে বিচারের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।

৪৮৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, আইন অনুসারে করতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ করতে অস্বীকার করা বা কাজটি না করা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অবমাননা করা বা বাধাদান করার জন্য কোন আদালত ৪৮০ বা ৪৮২ ধারা অনুসারে কোন অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করলে বা বিচারের জন্য তাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করলে উক্ত অপরাধী যদি আদালতের আদেশ বা

শর্ত মেনে নেয় অথবা সে যদি আদালতের সন্তুষ্টিক্রমে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আদালত ইচ্ছানুসারে তাকে অব্যাহতি দান করতে পারেন বা তার দণ্ড মওকুফ করতে পারেন।

কোন ফৌজদারী আদালত কোন সাক্ষী বা ব্যক্তিকে তার দখলে স্থিত কোন দলিল বা বস্তু দাখিল করতে বলা সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তা করতে ব্যর্থ হয় কিংবা আদালতের সমন পাওয়া সত্ত্বেও তা অমান্য করে তাহলে ৪৮৫ ও ৪৮৫(ক) ধারা অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেয়া যাবে। তবে এ ক্ষমতা শুধু ফৌজদারী আদালতের রয়েছে, দেওয়ানী আদালতের নয়।

উপরি উক্ত ধারা অনুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৪৮৬ ধারা অনুসারে জেলা দায়রা আদালতে আপীল করতে পারে।

অবমাননার অজুহাতে যাতে কাউকেও অযথা হয়রানী না করা হয় সেজন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৫ ধারায় কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, দণ্ডবিধির ১৭২ হতে ১৮৮ ধারাসমূহে সরকারী কর্মচারীদের কর্তৃত্ব অবমাননার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের যে সকল বিধান রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা তার উর্ধতন কর্মচারীর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত তা আমলে নিতে পারবেন না। এরূপ অভিযোগ কোন আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে হলে আদালতে লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কতিপয় ক্ষেত্রে আমলে নেয়া যাবে না। এগুলি হচ্ছে ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫ ধারায় মিথ্যা সাক্ষ্য, জামিনের জন্য মিথ্যা পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে যে সকল বিধান রয়েছে সেগুলি আদালতের ডিক্রী জারির জন্য সম্পত্তি আটক বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি লুকানো (২০৬ ধারা), ২০৭ হতে ২১১ ধারায় বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নেয়ার জন্য বিধান এবং সরকারী কর্মচারী যখন বিচার কার্যক্রম সম্পন্নকালে ইচ্ছাকৃত অপমান বা বাধা দেয়ার জন্য ২২ ধারার বিধান।

১৯৫ ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, অপরাধটি আদালতের কোন কার্যক্রমে দাখিলকৃত বা গৃহীত কোন দলিল সম্পর্কে উক্ত কার্যক্রমের কোন পক্ষ কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হলে উক্ত আদালত বা তাঁর উর্ধতন কোন আদালতের লিখিত অভিযোগ ব্যতীত দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারায় বর্ণিত জালিয়াতির জন্য অথবা ৪৭১ (জাল দলিল ব্যবহার), ৪৭৫ (দলিল জাল করার ব্যবস্থা) বা ৪৭৬ (জাল করার বস্তু দখলে রাখা) ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ বিচারের জন্য আমলে নেয়া যাবে না।

১৯৫ ধারার বিধানাবলী ৪৭৬ ধারার সাথে সম্পর্কিত। ৪৭৬ ধারায় বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

(ঘ) দেওয়ানী কার্যবিধি

আদালতের সমন অমান্যকরণ, সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্যকরণ ইত্যাদি কার্যকলাপ দ্বারা আদালত অবমাননার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনে কতিপয় বিধান রয়েছে। দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৩৫ ও ১৫১ ধারায় এবং ১৬, ৩৯, ৪০ অর্ডারের যথাক্রমে ১০ হতে ১২, ২ ও ১ বিধিতে আদালত অবমাননার জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৩৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা আদালতে গমনের সময় আদালতে দায়িত্ব পালনের সময় বা আদালত হতে প্রত্যাবর্তনের সময় দেওয়ানী পরোয়ানা বলে গ্রেফতার করা যাবে না।

(২) নম্বর উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, এখতিয়ার সম্পন্ন কোন ট্রাইব্যুনালে কোন বিষয় বিবেচনাধীন থাকাকালে উক্ত বিচার্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তাঁকে আইনজীবী এবং সমনপ্রাপ্ত সাক্ষীগণ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ট্রাইব্যুনাল সমীপে গমনকালে, হাজির থাকাকালে বা সেখান হতে প্রত্যাবর্তনকালে আদালত অবমাননার দায়ে উক্ত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারীকৃত পরোয়ানা ব্যতীত অপর কোন দেওয়ানী পরোয়ানা বলে গ্রেফতার হতে অব্যাহতি পাবেন।

এই ধারায় দেখা যায় যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রেফতার হতে অব্যাহতি পেলেও আদালত অবমাননার দায়ে জারীকৃত পরোয়ানার ক্ষেত্রে গ্রেফতার হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানের জন্য বা দলিল পেশ করার জন্য সমন দেয়া হলে সে ব্যক্তি যদি তা যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে প্রয়োজনবোধে ১৬ অর্ডারের ১০ বিধি অনুযায়ী আদালত তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করতে পারবেন অথবা আদালত ইচ্ছা করলে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করতে পারবেন এবং আদালতের বিবেচনা মত উক্ত ব্যক্তির কোন সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ দিতে পারবেন। উক্ত অর্ডারের ১১ বিধিতে বলা হয়েছে যে, সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাজির হয়ে এই মর্মে আদালতে সন্তোষজনক কারণ দর্শায় যে, (ক) সে আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমন অমান্য করেনি বা ইচ্ছাকৃতভাবে সমন এড়ায়ে চলেনি এবং (খ) জারিকৃত হুলিয়ার বিষয় সে যথাসময়ে অবগত হয়নি, তবে আদালত উক্ত সম্পত্তির উপর হতে ক্রোক প্রত্যাহারের নির্দেশ দান করবেন।

১৬ অর্ডারের ১২ বিধিতে বলা হয়েছে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি হাজির না হয় বা হাজির হলেও আদালতকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আদালত তার অবস্থা এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনাধিক ৫ শত টাকা জরিমানা করতে পারেন এবং ক্রোকের খরচ মেটানোর জন্য তার সম্পত্তি বা এর অংশ বিশেষ ক্রোক করার অথবা ১০ বিধি অনুসারে যদি ইতিপূর্বে ক্রোক হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম বিক্রির আদেশ দিতে পারেন। ৩৯ অর্ডারের ২ বিধিতে বলা হয়েছে যে, বিবাদীকে চুক্তি ভঙ্গ করা বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি করা হতে বিরত রাখার মোকদ্দমায় ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়ে থাকুক বা না থাকুক মোকদ্দমা শুরু করার পর যে কোন সময় এবং রায়ের পূর্বে বা পরে বাদী চুক্তিভঙ্গ বা ক্ষতি করা হতে অথবা একই চুক্তি হতে উদ্ভুত অথবা সম্পত্তি বা অধিকারের সহিত সম্পর্কিত কোন চুক্তিভঙ্গ বা ক্ষতি করা হতে বিবাদীকে বিরত রাখার জন্য আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করতে পারে। যথার্থ মনে করলে আদালত উক্ত নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে পারেন।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে বা কোন শর্ত ভঙ্গ করা হলে (৩) উপ-বিধি অনুসারে আদালত দোষী ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করার নির্দেশ দিতে পারেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে অনাধিক ৬ মাস মেয়াদের জন্য দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারেন।

এই বিধি অনুসারে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা হলে তা এক বছরের অধিককাল বলবৎ থাকবে না। এ সময়ের পরেও এরূপ লংঘন অব্যাহত থাকলে ক্রোককৃত সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করা যাবে।

দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় আদালতকে সহজাত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুবিচারের স্বার্থে বা আদালতের প্রক্রিয়াব অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য আদালত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য শুধু

বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ এখতিয়ার রয়েছে। সুপ্রীমকোর্ট শুধু নিজের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখবেন না, তার অধস্তন সকল আদালতের মর্যাদাও কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করবেন। সম্প্রতি **রাষ্ট্র বনাম আবদুল করিম সরকার**[৩২] মামলায় বিচারপতি মোস্তফা কামাল মন্তব্য করেন যে, সরকারের প্রশাসনিক বাহুকে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে আক্রমণ ও তাঁর সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাধীনতাকে খর্ব করতে দেয়া যায় না। যদি দেয়া যায়, তাহলে অচিরেই আমাদের সমাজে সভ্যতার অবশিষ্টাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা ধ্বংস হয়ে গেলে আমাদের দেশ ও জনগণকে চরম মূল্য দিতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, আদালতের মর্যাদাকে অবজ্ঞা করে কোন কাজ করলে অবমাননাকারীকে পাকড়াও করার মত আইনের বাহু যথেষ্ট লম্বা।

(ঙ) বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে বাক স্বাধীনতা, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এগুলি অবাধ নয়, এ সকল স্বাধীনতা অবশ্যই আদালত অবমাননা আইনের বিধি-বিধান সাপেক্ষে প্রয়োগ করতে হবে।

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে-

ক. প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

খ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে।

সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে, "সুপ্রীম কোর্ট একটি কোর্ট অব রেকর্ড" হবেন এবং এর অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দন্ডাদেশের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

'কোট' অব রেকড এর কোন ব্যাখ্যা সংবিধানে দেয়া নাই। ব্ল্যাকস্টোন এর ভাষায়, 'কোট' অব রেকড' বলতে এমন আদালত বুঝায় যেখানে চিরস্থায়ী স্মরণের জন্য এবং প্রামাণিক সাক্ষ্যের জন্য বিচারকার্য এবং বিচার কার্যক্রমের তালিকা রাখা হয় যাকে আদালতের রেকর্ড বলা হয় এবং ঐ রেকর্ড এত কর্তৃত্বসম্পন্ন যে, এগুলির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না এবং কোন অজুহাত বা সাক্ষ্য এর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা যাবে না এবং রেকর্ডের সকল কোর্টসমূহ রাজকীয় মর্যাদা সম্পন্ন। আয়ারের মতে, যে আদালতের রেকর্ডপত্র অখন্ডণীয় ও নিরঙ্কুশ সে আদালতই হচ্ছে কোর্ট অব রেকর্ড।[৩৩]

এগুলি হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট আদালত অবমাননাকারীকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী এবং কোনরূপ অভিযোগ ব্যতিরেকেই আদালত নিজের গরজে (Suo moto) অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(চ) আদালতের নজীর

আদালত অবমাননার ক্ষেত্রটি এতই উর্বর যে, প্রায় সকল দেশেই এ সম্পর্কে অনেক মামলা মোকদ্দমা হয় এবং আদালতের অনেক নজীর স্থাপন করা হয়। বিচারপতি মোস্তফা কামাল

বলেছেন যে, আদালত অবমাননা বিষয়ে আমাদের উচ্চ আদালতেও যথেষ্ট নজীর জমা হয়ে রয়েছে। কতিপয় নজীর নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

এ্যামন্‌স কেস (১৭৬৫)

আদালত অবমাননা সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের অতি প্রাচীন মোকদ্দমা হচ্ছে রাজা বনাম এ্যামন। তদানিন্তন প্রধান বিচারপতি লর্ড ম্যান্সফিল্ড সম্পর্কে একজন পুস্তক বিক্রেতা জোন আমন একটি মানহানিকর উক্তি প্রকাশ করেছিলেন। বিচারপতি উইলমট এ মামলায় যে বক্তব্য রাখেন তা আজিও স্মরণ করা হয়ে থাকে।

বিচারপতি উইলমট (Justice Wilmot) বলেন, রাজা হচ্ছেন সমস্ত বিচারের উৎস। সকল প্রজাদের জন্য ন্যায়বিচার প্রদান করা রাজার একটি আইনগত কর্তব্য। তিনি একা এ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না হেতু তাঁর পক্ষ হতে বিচারকগণ এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কাজেই বিচারকদের দোষারোপ করার অর্থ হচ্ছে স্বয়ং রাজাকে দোষারোপ করা।

তিনি আরো বলেন যে, যখন আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য ক্ষুন্ন হয়, তখন এর প্রতিকার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা বিচারককে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা করার জন্য নয় যে মাধ্যমে জনগণের নিকট রাজার বিচার পৌঁছানো হয়, সে মাধ্যমকে রক্ষা করা।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বনাম জাস্টিস অব বেঙ্গল [(1883) 10 1. A. 17]

'দি বেঙ্গলী' নামে এক পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তাঁর বিরুদ্ধে এক অভিযোগ ছিল যে, তিনি এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরিশকে আক্রমণ করেছেন। হিন্দুদের পবিত্র প্রতিমাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে উক্ত বিচারপতি জবরদস্তিমূলক কাজ করেছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন বলে ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়। সর্বোচ্চ আদালত প্রিভি কাউন্সিলের মতে দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা মতে, এটা মানহানির জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছাড়া আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি যোগ্য।

ব্রহ্মপ্রকাশ শর্মা বনাম উত্তর প্রদেশ স্টেট [(1953) S. C. R. 1169 ct 1177]

মামলায় বিচারপতি মুখার্জি বলেন যে, বিভিন্ন পন্থায় বিচারকের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা যায়। কিন্তু কোন বিচারকের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা এবং তাঁর চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে নিন্দাবাদ করার অর্থ হচ্ছে সমগ্র আদালতকে আক্রমণ করা।

রাষ্ট্র বনাম মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং অন্যান্য [(1963) D.L.R. Dacca. 315 at 316]

এই মামলায় ঘটনায় প্রকাশ মওলানা কিছু আপত্তিকর বক্তব্য প্রকাশনার জন্য 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকাকে প্রদান করেছিলেন। রায় দেয়ার সময় বিচারপতি রহমান বলেন যে, অবমাননার কার্যক্রম সুই জেনোরিস প্রকৃতির, যার মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার কার্যক্রমের

উপাদান রয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে কোনটারই নাই। এ সকল কার্যক্রমে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় না, শুধু সত্যতা যাচাই এর ব্যবস্থা করা হয়।

হরিচরণ দেব বনাম রঞ্জিত কুমার [(1948) 42 C.W.N. 203]

এই মামলার ঘটনায় জানা যায় যে, বিবাদী আদালতের নিকট এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ডিক্রি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত তার কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করবে না। কিন্তু ডিক্রি পরিশোধের পূর্বেই বিবাদী তার সম্পত্তি রেহেন দিয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্ট মতামত ব্যক্ত করেন যে, আদালতের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা আদালত অবমাননা।

সৈয়দ আহমেদ শাহ বনাম রাষ্ট্র [(1967) 19 DLR (SC) 103]

আদালতের আদেশ কিভাবে অবহিত করানো হবে সে বিষয়ে এই মামলায় সিদ্ধান্ত হয়। এই মামলায় বাদী একটি উচ্ছেদের ডিক্রি কার্যকরণের জন্য পরোয়ানা পায়। নালিশী দোকানঘরটি সে সময় বন্ধ ছিল। ডিক্রি বাস্তবায়নকারী আদালত তালাভাঙ্গার নির্দেশ দেন। এ সময় আপীলকারী হাজির হয়ে জানান যে, তিনি হাইকোর্টের স্থগিত আদেশ পেয়েছেন। এটা অগ্রাহ্য করায় আদালত অবমাননার মামলা করা হয়। হাইকোর্ট বলেন যে, যে ভাবেই হোক হাইকোর্টের আদেশ জানতে পারলে তা মানতে হবে অন্যথায় আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত হবে। সুপ্রীম কোর্ট এটাকে বাতিল করে দিয়ে বলেন যে, একটা ফৌজাদারী বা আধা ফৌজদারী প্রকৃতির মামলায় কাউকে অভিযুক্ত করতে হলে দেখতে হবে যে, যে আদেশটি অমান্য করা হয়েছে বলা হচ্ছে তা যথাযথভাবে তার গোচরে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এম.এ. জাহের এবং অন্যান্য বনাম মঈনুদ্দিন আহমেদ৩৪ (মামলায় একটু অন্যরূপ সিদ্ধান্ত দেন। এই মামলার ঘটনায় প্রকাশ একটি পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার মামলায় দু'জন সদস্য আদালতে উপস্থিত ছিলেন আদালত নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করেছেন এটা দেখা সত্ত্বেও তারা দু'জনে উক্ত নির্বাচনে ভোট দেয়। নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও তারা ভোট দিয়েছে। এটা আদালত অবমাননা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এডওয়ার্ড স্নেলসন বনাম পশ্চিম পাকিস্তানের হাইকোর্টের জজগণ
[(1964) 16 DLR (SC) 535]

ষাটের দশকে আদালত অবমাননা সম্পর্কে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই মামলাটির বিবাদী ছিলেন পাকিস্তানের আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব। সাংবিধানিক প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি একদল সেকশন অফিসারের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই বক্তৃতা সরকারী প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল এবং এর উপরে লেখা ছিল "কেবল সরকারী কাজের জন্য"। হাইকোর্টের রীট মঞ্জুরের ক্ষমতাকে কিছুটা খর্ব করার উদ্যোগ এতে ছিল বলে হাইকোর্ট মনে করেন। বক্তৃতাটি হাইকোর্টের গোচরে আসলে সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার চার্য আনা হয়। বিচারপতি সাব্বির আহমেদ রায়দানকালে মন্তব্য করেন যে, আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে তাঁর

মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু সেগুলি গোপনীয় নথিতে প্রকাশ করতে হবে। হাইকোর্টের রীট ইস্যু করার ক্ষমতা যদি খর্ব করতে তিনি চান তাহলে তিনি আইন মন্ত্রীর মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট গোপনীয়ভাবে প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। এত লোকের সামনে খোলাখূলি এরূপ বক্তব্য রাখা আদালত অবমাননা বলে গণ্য করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হলে প্রধান বিচারপতি এ.আর. কর্ণেলিয়াস বলেন যে, কোন সরকারী কর্মচারী যদি তাঁর উর্ধতন কর্মচারীর নিকট কোন রিপোর্ট দেন যাতে কারো প্রতি মানহানিকর উক্তি থাকে, তবুও তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা যাবে না, কেননা এটা তার চূড়ান্ত বিশেষ অধিকার (Absolute Privlege)। কিন্তু আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে এ অধিকার থাকে না।

জয়নারায়ণ শর্মা বনাম মহানাথ পাণ্ডে [(1979) BLJR 409 et 416]

কতিপয় পুলিশ অফিসারের উপর হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তা অমান্য করেন। আদালত অবমাননার জন্য তাদেরকে দায়ী করে বিচারপতিগণ বলেন যে, যদি পুলিশ কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, আদালতের কোন আদেশ অবৈধ, তথাপি উক্ত আদেশ অমান্য করা তাদের অধিকার নেই।

প্রকাশ চন্দ্র বনাম গেরাওল [(1975) CR. L.J. 679]

যখন কোন কর্মচারীকে বরখাস্তের আদেশ আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয় তখন সরকারের পক্ষে উক্ত কর্মচারীকে পুনর্বহাল করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়বে না বলে উক্ত মামলায় সিদ্ধান্ত হয়।

কিন্তু রতন নারাজমোল্লা বনাম প্রধান সেক্রেটারী, ইউ.পি. সরকার
[(1975) CR. L.J. 1283]

মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি কোন অফিসার ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতের আদেশ মান্য না করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আদালত অবমাননার জন্য তিনি শাস্তি পাবেন। আরো বলা হয় যে, ঘোষনা মূলক রায় মোতাবেক একজন কর্মচারীকে কাজে যোগদান করার অনুমতি না দেয়া আদালত অবমাননা।

মিশ্র বনাম ডিবিস্ট [(1972) AIR (SC) 2466]

মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট উল্লেখ করেন যে, একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা যখন ইচ্ছাকৃতভাবে হাইকোর্টের অবশ্য পালনীয় নজির অনুসরণ করতে রাজী না হন, তবে তিনি আদালত অবমাননার জন্য দায়ী হবেন।

রাষ্ট্র বনাম আবদুল গফুর [(1963) 13 DLR 851]

মামলায় বিচারপতি মুর্শেদ বলেন যে, আদালতের মর্যাদার উপর আঘাত করতে পারে এমন অভিযোগ উত্থাপন করে আরজি লেখার সময় আইনজীবীদের কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাঁরা তাঁদের মক্কেলদের হাতের পুতুল নন। বিচারকের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে বক্তব্য পেশ করলে আদালত অবমাননার জন্য তাঁরা দায়ী হবেন।

রাষ্ট্র বনাম আবদুল করিম সরকার [37 DLR (185) 26]

এই মামলাটির ঘটনায় প্রকাশ, আসামী একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। উক্ত উপজেলার মুন্সেফের উপর তিনি কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং আদালত প্রাঙ্গণে সকলের সম্মুখে তিনি উক্ত মুন্সেফকে অবজ্ঞাস্বরে বলেছিলেন যে, ফৌজদারী বিচার কার্য কিভাবে সমাধা করতে হয় তা যেনো তিনি (সুন্সেফ) আসামীর নিকট হতে শিখে নেন। শুধু তাই নয় তাঁর পেস্কারকে মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। এটা চরম অবমাননা হিসেবে গণ্য হয় এবং রায়ে বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেন যে, উন্মুক্ত আদালতে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক একজন বিচার বিভাগীয় সদস্যের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দান করার দৃশ্য এবং তাঁর সুষ্ঠু কাজে বাধা প্রদান অসহনীয় এবং ক্ষমার অযোগ্য।

উপসংহার

সামাজিক শৃঙ্খলা ও জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অবমাননাকারীকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে প্রত্যেক সভ্য দেশে আদালতকে এক বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ গুলি শুধু আদালতের মর্যাদা রক্ষার্থেই করা হয়নি, বরং কোনরূপ ভীতি বা অনুগ্রহ ব্যতিরেকেই বিচার প্রশাসন নিশ্চিত করার জন্য তা করা হয়েছে।

কোন বিশেষ কাজ বা আচরণ আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে কিনা তা আদালতই স্থির করবেন এবং যে কোন পদ্ধতিতে এর বিচার করা যাবে। পেশাগত কারণে আইনজীবী ও সাংবাদিকগণ আদালতের কার্যাবলী সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন এবং তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবমাননার জন্য অভিযুক্ত হয়ে থাকেন। সাধারণত এক আদালত হতে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের আবেদনে আবেদনকারী পূর্বোক্ত আদালতে সুবিচার না পাবার আশংকা প্রকাশ করে থাকেন। প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের মতে এগুলি নিঃসন্দেহে আদালত অবমাননা। [(1971) 23 DLR (SC) P.I at 6]

আইনের অস্পষ্টতার কারণে ভারতের দু'জন প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রী এম. ওয়াই শরীফ ও ডক্টর ক্যাথালে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন।[৩৫] ১৯৬১ সালে প্রখ্যাত রাষ্ট্র বনাম এডওয়ার্ড স্নেলসন মামলায় বিচারপতি সাব্বির আহমেদ তাঁর ঐতিহাসিক রায়ে এই আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর তিনি যখন পেশায় যোগদান করেন তখন তিনিও একবার অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন।[৩৬] অবশ্য তিনি নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মঞ্জুরীকৃত স্থগিত আদেশ লংঘন করার দায়ে একজন সাবজজকে অভিযুক্ত করা হয়। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে ক্ষেত্রে সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিচারকগণ তাঁদের কার্যাবলী বা মতামত প্রকাশের জন্য আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। অথচ অনেক আদালত এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, বিচার প্রশাসন সম্পর্কে জনগণের মতামত প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রয়োজনও কারণ, আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমেই একটা প্রক্রিয়ার ত্রুটি উন্মোচিত হয় এবং তার সংশোধনের সুযোগ হয়। এভাবেই জনগণের জন্য অধিক আস্থাশীল ও উৎকৃষ্টমানের বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। ভারতে ১৯২৬ সালের এ্যাক্টটি ১৯৫২ সালে এবং ১৯৭১ সালে আমুল

সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশে এ আইনটি এখনো অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। কাজেই যুগোপযোগী করে জনগণের উপকারার্থে আদালত অবমাননা সম্পর্কে একটি ত্রুটিমুক্ত, স্পষ্ট ও সকলের গ্রহণযোগ্য একটি এ্যাক্ট প্রণয়ন করাই হচ্ছে বর্তমান যুগের একটা দাবী। যুগের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ।

তথ্য নির্দেশ

1. V. G. Rama chandran: The Contempt of Court (3rd Edn.) P. 7.
2. Oswald : The Contempt of Court (1890 Edn.) p.3.
3. Halsbury's Law of England, Vol. 7, p. 286.
4. *Miller* V. *Knox* (1878) 4 Bing (N.C), 574, 589.
5. *Green* V *United States* (1958) 356 US 105, p. 677.
6. (1963) 15 D.L.R. (Sc) 150.
7. *Sir Edward Snelson* V *Judges of the Hight Court of West Pakistan* (1964) 16 D.L.R. (Sc) 535.
8. P.L.D. (1964) Lahore 661.
9. P.L.D. (1964) Dhaka 241.
10. V.C. Ramachandran: The Contempt of Courts (1952 Edn.) P. 13.
11. L. Kabir : Lectures on the Pakistan Penal Code (1970 End) P.1.
12. P.L.D (1962) Lahore 335.
13. *Emperor* V Jagannath Prasad Swadhis (1938) All. 358 at 361.
14. (1937) Lah. 407.
15. Supdt. and Legal Remembrancer. *Bihar* V *Murli Manobar Prasad* (1940). P.W.N. 902.
16. In re Ranga Swami Goundar. AIR 1944 Mad. 45 at 46.
17. *Gogendra Chandra Chowdhury* V. *Kshirode Ranjan Bhaltachary* (1961) 2 Cr.L.J 564 at 566.
18. AIR (1948) all. 50 at 51
19. *Manahai Ram* V E (1919) ALL. 330.
20. *Parsholam* Lal V *Crown* 19
21. In re Davaluri Virayya I.G.L.J. 309.
22. Kunhutti, 1934 M.W.N. 398.
23. (1918) Lah. 65.
24. Emperor V Mudoved Kar, 46 Bom. 973.
25. Azeemoola V Crown 44 P.R. (1867) Cr.
26. (1932) Lah. 502.
27. (1965) PLD (Sc). P. 667.
28. *A.H. Skone* V *M. Bason* (1925) 29 C.W.N. 766.
29. (1930) Cal. 366.
30. AIR (1956) Orissa 28.
31. 17 DLR 477 Sc.
32. 37 DLR (1985) 26 at 38.
33. K.J. Aiyer: Contempt of Court (1964 Edn.), P. 105.
34. 28 DLR (App. Div.) 1976, 165.
35. (1955) AIR (Sc) 19.
36. (1963) 15 DLR (Sc) 355.

গ্রামীণ বৃক্ষসম্পদের চালচিত্রঃ একটি তথ্যানুসন্ধানী জরিপ ও প্রসঙ্গ-কথা

মুহাম্মদ হাসান ইমাম

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে - সবচেয়ে সুন্দর করুণ ঃ
যেখানে সবুজ ডাঙ্গা ভস্বরে আছে মধুকুপী ঘাসে অবিরল;
যেখানে গাছের নাম ঃ কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙ্গের মতো জাগিছে অরুণ;

- জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা

বাংলাদেশে বন এলাকার ক্রমসংকোচন উদ্বেগজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও কৃষিকাজ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রধান অবলম্বন, বৃক্ষের ভূমিকা তাদের বাসস্থান, পুষ্টি, বিনোদন, ও বিশ্রামের সাথে ঐতিহ্যগতভাবে জড়িত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মাটি ও পানি - এদেশের কৃষিভিত্তিক মানুষের দুটি প্রধান জীবনদায়িনী উপাদান - যা দারুণভাবে বৃক্ষের সংশ্রব দ্বারা গুণান্বিত, নিয়মায়িত, ও সংরক্ষিত। তাই এদেশের ইকোনমী ও ইকোলজীতে বৃক্ষের অপৃসয়মান রূপ অতিশয় বিসদৃশ ও বিপদজনক। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ঘনবসতির এই দেশের মোট আয়তন মাত্র ১৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ঃ

নদীপথ - ০.৯৩ মিলিয়ন হেক্টর (৬.৫%)
কর্ষিত এলাকা - ৮.৫০ মিলিয়ন হেক্টর (৫৯.৪%)
অকর্ষিত এলাকা - ২.৬৭ মিলিয়ন হেক্টর (১৮.৭%)
বন এলাকা - ২.২০ মিলিয়ন হেক্টর (১৫.৪%)

ধরে নেয়া হয় একটি দেশের ২৫% এলাকা বৃক্ষ-আচ্ছাদিত থাকা উচিত; আমাদের দেশে এর পরিমাণ ৭ থেকে ৯% মাত্র (Danida, 1989)। একটি হিসাব মতে আইনগতভাবে ২ মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল আছে যা স্থলভাগের ১৫% মাত্র কিন্তু উৎপাদনশীল গাছ আছে এর অর্ধেক পরিসরে। বনবিলোপের হার বাৎসরিক ৮,০০০ হেক্টর। তাছাড়া, বনাঞ্চলের ১৫ থেকে ৪৫% কৃষিকাজ অথবা অন্যভাবে দখল হয়ে আছে (BARC. 1991)। তাই বনাঞ্চলের হিসাব কষে এদেশের বৃক্ষ-আচ্ছাদনের মাত্রা বুঝে ওঠা মুশকীল। বনের চারটি ধরনকে আলাদা করলে দেখা যায় (১) সুন্দরবনের ৭৫% (২) পাহাড়ী বনের ৫০% (৩) শালবনের ২% ও (৪) বাস্তুভিটা বনের ৮০% বৃক্ষ-আচ্ছাদিত। অর্থাৎ মানুষের বসতবাড়ী সংলগ্ন বৃক্ষ-সমাহারই সবচেয়ে সংরক্ষিত।

কিন্তু এর পরিসর যেখানে ২,৭০,০০০ হেক্টর সেখানে সুন্দরবন, পাহাড়ীবন ও শালবন যথাক্রমে ৬০০,০০০; ৬০০,০০০ ও ১২৫,০০০ হেক্টর। অবশ্য অন্যান্য উৎস অনুযায়ী বসতবাগানের পরিমাণ ৩০৪,০০০ (Douglas, 1982) অথবা ৩০০,০০০ হেক্টর (Chowdhury, 1989)। সুতরাং পরিমানের দিক থেকে মানুষ-ঘনিষ্ট এ ধরনের বনের অবস্থা দ্বিতীয় পর্যায়ে। কিন্তু জীবন ও সংস্কৃতি-অন্বিষ্টতা এধরনের বৃক্ষময়তাকে আর্থসামাজিকভাবে অতিরিক্ত অর্থপূর্ণ করেছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে বৃক্ষের অবদান বিচিত্র। কিন্তু মাথাপিছু প্রাপ্তিযোগ .০২ হেক্টর। ১৯৮৭ সনে সরকারী হিসাব মতে বনবিভাগসহ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন বনাঞ্চল হলো (১.৪৬ + .৬৮) ২.১৪ মিলিয়ন হেক্টর। গ্রামীণ বনসম্পদ বাৎসরিক ৮.৯% হারে উজাড় হয়ে যাচ্ছে যা এর প্রবৃদ্ধির হারকে অনেক আগে ছেড়ে গেছে (Hammermaster, 1981)। আরেকটি হিসাব অনুযায়ী বন কাটার হার কাঠ উৎপাদনকে ৮০০০,০০০ হারে অতিক্রম করেছে ১৯৮০ সনে (মাথাপিছু .০৯৯m^3) (FAO, 1982)। এ থেকে প্রমাণিত হয় এদেশের মানুষের জীবনে বৃক্ষের প্রয়োজন বর্তমান জীবনাচরণের ধারায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মোট শক্তি (energy) ভোগের ৬০% সরবরাহ করে থাকে বৃক্ষ। ১৯৮১ সনে ভোগকৃত ৫.৫৩ মেট্রিক টন জ্বালানী কাঠের মধ্যে বন ও গ্রামীণ বনের অবদান যথাক্রমে ৭৮.৪% ও ১২.৩% । ঐ বৎসরে অতি কর্তনের আনুমানিক পরিমাণ বনএলাকায় ৪৭% এবং গ্রাম এলাকায় ৪৮%। বাস্তুভিটার বন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা সর্বাধিক পূরণ করে। বাস্তুভিটা এদেশের সব ধরনের কাঠ ব্যবহারের ৮৫%, জ্বালানী-কাঠের ৯০%, এবং বাঁশের ৯০% সরবরাহ করে বলে মন্তব্য করা হয়েছে(Douglas, 1982)।

যাহোক, গ্রামের সার্বিক প্রয়োজন পূরণ ছাড়াও বৃক্ষের প্রয়োজন হয় শহরের জীবনের জন্য, শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। গ্রাম থেকে শহরে সম্পদ স্থানান্তরের ধারায় কাঠ, জ্বালানীকাঠ, বাঁশ, বাঁশের গোড়ালী, কাঁঠালপাতা ইত্যাদির চাহিদা ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান জৈব জ্বালানীর অভাব বাংলাদেশের গ্রামের উপর আর্থ-সামাজিকসহ পরিবেশগত চাপ সৃষ্টি করছে বলে ধরে নেয়া স্বাভাবিক। দেখা যাচ্ছে, জ্বালানী কাঠের অভাবে গোবরের মতো কৃষি-অবশেষের ব্যবহারও ব্যাপক। জানা গেছে ১৯৮১ সনে কৃষি-অবশেষে, জ্বালানীকাঠ, ও পশুবিষ্ঠার ব্যবহার মোট জৈব জ্বালানীর যথাক্রমে ৬৬.৪%, ১৭.৪% ও ১৬.২% । স্বভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে কৃষি অবশেষের এমনতরো ব্যবহার পশু খাদ্য ও জমির উর্বরতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একটি হিসেবে দেখা যায়,৬০.৯ মেট্রিক টন কৃষি অবশেষের মধ্যে জ্বালানী ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৭% ও ৩৫% (GOB, 1987)।

বৃক্ষের সঘন উপস্থিতি মানুষ, পশুপাখী, ও পতঙ্গের খাদ্য ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দিলেও ক্রমবর্ধমান বৈরী পরিবেশে সার্বিক বনসম্পদের অবলুপ্তি এর প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও অবহেলাকেই চিহ্নিত করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অত্যুগ্র মাত্রা, ঘনত্ব, সম্প্রসারণশীল বসতি ও কৃষি, ও ভৌত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিস্তার বৃক্ষের নিশ্চিত নিধন ব্যতীত প্রায় অসম্ভব। দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের অনেক ধরনের অভাব বৃক্ষকে পূরণ করতে হয়; সহ্য করতে হয় খরা ও বন্যার মতো দুর্যোগ। শেকড়হীন জনগোষ্ঠীর মতোই অতিসচ্ছল ও ভোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীও বৃক্ষ নিধনের পরোক্ষ অনুপ্রেরণা হিসাবে পরিগণিত হয়। আসবাবপত্রসহ গৃহের

উপকরণ হিসেবে কাঠের ব্যবহার ব্যাপক। এ ব্যাপারে সার্বিক সচেতনতার অভাব ও আইনগত দূর্বলতার সুযোগে বিকল্প ব্যবহারের প্রচেষ্টা এখনো নিম্নস্তরে রয়ে গেছে। অন্যদিকে সরকারী বনবিভাগের সনাতন বনায়ন কর্মসূচী অত্যন্ত সংকুচিত ও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বলে ধরা যেতে পারে। ১৯৮০ সনে বনবিভাগ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। উত্তবঙ্গের জেলাসমূহের 'ষ্ট্রিপ', 'ব্লক' ও 'ভিটেবাড়ী' পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীকে বিস্তৃত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কৃষিবনায়ন, বাস্তুভিটা কৃষিবনায়ন, গ্রামবনায়ন ও খামার বনায়নের মতো কর্মপ্রকল্প এখনো সীমিত গন্ডি ও স্থানীয় পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি। তাছাড়া এ ধরনের উদ্যোগ বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের কার্যক্রমের উপাদান হিসেবে লক্ষ্য করা যায় যা এসব সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে মতানৈক্য দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অবলুপ্তির ধারা অব্যাহত থাকলেও আধুনিক, সুসংগঠিত, ও অংশীদারিত্বমূলক বনায়নের উদ্যোগ এখনো সীমিত পর্যায়ে প্রসারিত।

জরিপ প্রসঙ্গ ঃ উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

যেহেতু সনাতন ধারাই প্রধানতঃ ক্রিয়াশীল সেহেতু যে কোন নতুন প্রকল্পের জন্য আরো বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষের বৃক্ষরোপণচর্চা, সংশ্লিষ্ট ভাবনা, ও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাব্যতার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। এ সব প্রসঙ্গ মনে রেখে এই সরেজমিন জরিপ কাজটি সম্পন্ন করবার উদ্যোগ নেয়া হয় যার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সাধারণভাবে বৃক্ষ রোপন, বৃক্ষসম্পদ, বৃক্ষব্যবহার ও প্রয়োজনের বিভিন্ন দিকগুলো অনুসন্ধান করা; সুনির্দিষ্টভাবে জরিপের উদ্দেশ্য ছিল ঃ

(ক) বিভিন্ন বর্গের গৃহস্থালীর মধ্যে বৃক্ষ সম্পদের পরিমাণ, ধরন, বৃক্ষের রোপন ও কর্তনের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত জানা;

(খ) কৃষির অন্যান্য উপাদানের সাথে তুলনার মাধ্যমে বনের গুরুত্ব ও সম্ভাব্য বিকাশকে অনুধাবন করা;

(গ) সার্বিক পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা সাপেক্ষে নীতিগত সুপারিশমালা প্রণয়ন।

উক্ত উদ্দেশ্যাবলীকে সামনে রেখে তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলতঃ দুটি গ্রাম বাছাই করা হয়। গ্রাম দুটি বাছাই করার ক্ষেত্রে প্রথমে দুটি মৌজাকে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছে। দেখা যায় মৌজা দুটি মৌজার নামেই দুটি গ্রাম হিসাবে পরিগণিত, যদিও গ্রামের আয়তন মৌজার সীমানাকে সামান্য ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু এই গবেষণার ক্ষেত্রে সমগ্রকের গুরুত্বহীনতার কারণে গ্রাম বা মৌজার সীমানা তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়নি, বরং ভূমি মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে গৃহস্থালীই তথ্যের প্রধান উৎস ও বিশ্লেষণের একক হিসাবে এসেছে, তাই খণ্ডিত অবস্থায় হলেও গ্রাম দুটিকে এখানে গবেষণা এলাকা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, নির্বাচিত গ্রাম দুটি হলো, যথাক্রমে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার সুজালপর ইউনিয়নের অন্তর্গত সুজালপুর গ্রাম ও রাজশাহী জেলার পুটিয়া থানার জিওপাড়া। এ ছাড়াও বানেশ্বরের মারিয়া গ্রামটিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে আম ও গুড়ের বাজার সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য।

গ্রামগুলোর কৃষিপরিবেশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য স্থানীয় এলাকার মোটামুটি প্রতিনিধিত্বশীল বলে ধরে নেয়া হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই গবেষণার মূল লক্ষ্য গৃহস্থালী-কেন্দ্রিক অবস্থার মূল্যায়ন। তাই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে মালিকানাধীন জমির পরিমাণের বৈচিত্র্যের দিকে। উল্লেখ্য যে, গৃহস্থালী বলতে এখানে একসঙ্গে একই বাড়ীতে বসবাসকারী পরিবার বা পরিবারসমূহকে বুঝানো হয়েছে যাদের জমি-সম্পত্তির দেখাশুনা, চাষাবাদ ও সংশ্লিষ্ট আয়ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন অখন্ডভাবে নেয়া হয়। গৃহস্থালীগুলো বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বসতবাটিসহ চাষাযোগ্য ও অচাষযোগ্য জমির পরিমাণের ভিত্তিতে একটি পূর্বনির্ধারিত 'ক্যাটেগোরাইজেশন' বা বর্গীকরণের রূপরেখা অনুসরণ করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মালিকানাধীন জমি-ভিত্তিক গৃহস্থালীর পাঁচটি ধরন বা বর্গ তৈরী করা হয়েছে। এধরনের বর্গীকরণ সর্বসম্মত না হলেও মোটামুটি সাধারণভাবে অনুসরণকৃত পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধে গৃহস্থালীগুলোকে ও মালিকাধীন জমিকে ক্ষেত্র বিশেষে খামার বলে উল্লেখ করা হয়েছে নিতান্তই পরিপ্রেক্ষিতগত কারণে; গৃহস্থ বলতে শিথিলভাবে হলেও একটি গৃহস্থালীর প্রধান বা প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। বর্ণনার সাবলীলতার খাতিরে বসতবাড়ী, বাস্তুভিটা বসতভিটা ও ভিটেবাড়ী সমার্থক শব্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যা হোক, জমির পরিমাণ ও তার ভিত্তিতে কৃত পূর্বনির্ধারিত পাঁচটি বর্গ বা 'ক্যাটেগোরী' নিম্নরূপ ঃ

মালিকানাধীন জমির পরিমাণ (একর)	গৃহস্থালীর বর্গ
০.৫০ অথবা তার নিচে	ভূমিহীন
০.৫০ থেকে ১.৫০	প্রান্তিক
১.৫১ থেকে ২.৫০	ছোট
২.৫১ থেকে ৫.০০	মধ্যম
৫.০১ অথবা তার উপর	বড়

তথ্য সংগ্রহের একক হিসাবে প্রতিটি বর্গ থেকে পাঁচটি গৃহস্থালীর বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। তথ্যসংগ্রহের জন্য লিখিত প্রশ্নপত্র ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে গৃহকর্তা ও তাদের কৃষিজীবী প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। প্রায়োজনবোধে গৃহকর্ত্রী অথবা প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের কাছে থেকে সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমন গৃহস্থালীর শরণাপন্ন হতে হয়েছে। যাদের মূল্য পেশা কৃষি; ভূমিহীন বর্গের গৃহস্থালী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অন্ততঃ বাস্তুভিটা আছে এমন গৃহস্থালীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও তথ্য-চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখতে নিয়ে গ্রাম গবেষণার কিছু প্রচলিত ধারণা থেকে বিচ্যুত হতে হয়েছে। এই প্রবন্ধের সব চেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো এখানে বিষয়াবলীর তীব্র ও বিস্তৃত বিধৃতি সম্ভব হয়নি। সাধারণীকরণের অর্থে নয়, বরং সহজ পরিচিতির কারণে বক্তব্যের মধ্যে গ্রামের নামোল্লেখের পরিবর্তে থানার নাম উল্লেখপূর্বক এলাকার কথা বলা হয়েছে। জরিপ কাজটি সম্পন্ন করা হয় ১৯৯৩ সালের প্রথমার্ধে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সাধারণভাবে মধ্যম ও ছোট গৃহস্থরা সরাসরি নিজেদের অভাবের কথা ব্যক্ত না করে পরিবারসহ পরিপোষণ হয় বলে জানাতে আগ্রহী। বড় গৃহস্থরা নিজেদেরকে সচ্ছল বলতে আগ্রহী হলেও উদ্বৃত্তের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদানে রক্ষণশীল মনে হয়েছে। এদিকটি প্রাসঙ্গিক হলেও তার অনুসন্ধান বর্তমানে জরিপে সম্ভব হয়নি। প্রান্তিক ও ভূমিহীন গৃহস্থদের ঘাটতি তাদের নির্ভরশীল জীবনযাপন পদ্ধতির ভেতরই উদ্ভাসিত। যে-সব উদ্বৃত্ত গৃহস্থালীকে চিহ্নিত করা যায় তাদের কৃষি ও অকৃষি থেকে আয় অন্যান্যদের চেয়ে বেশী। সাধারণভাবে দ্বিতীয় পেশার বিস্তৃতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে, যেহেতু এই জরিপের অন্তর্ভুক্তরা কৃষিকে প্রধান পেশা হিসাবে গ্রহণকারী, যেহেতু বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থদের মধ্যে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট আয়ভিত্তিক পাথক্যটিই মোটামুটি জানা গেছে (সারণী ঃ ১)। অবশ্য জমির পরিমাণ ভিত্তিক গৃহস্থালী বর্গের গড় হিসাব থেকে কিছু সাধারণ দিক অনুমান করা যেতে পারে।দুটি গ্রামের গৃহস্থালীর আকার গড়ে ৫.৫২ এবং এক্ষেত্রে গ্রামভিত্তিক পার্থক্য উল্লেখ্যযোগ্য নয়। সব বর্গের মধ্যে গড়ে ৩০% যৌথ-পারিবারিক বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত তবে, অনুসন্ধানে মালিকাধীন জমির পরিমাণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বীরগঞ্জ এলাকায় বড় আকারের গৃহস্থালী তুলনামূলকভাবে বেশী। সাধারণ পর্যাবেক্ষণ থেকে মনে হয়েছে যে, এই এলাকায় মাঝারী আকারের জোত সংখ্যা কম। সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য না হলেও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি খামার-আকার ভিত্তিক বর্গের গড় জমির পরিমাণ সারণী ঃ ২ থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, বীরগঞ্জ ও পুঠিয়ার গড় মলিকাধীন জমির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪৪ ও ৩.৯৫ একর ।

সারণীঃ ১ কৃষি ভিত্তিক আয়ের পরিমাণ

গৃহস্থালী	পুঠিয়া	বীরগঞ্জ
বড়	৬৫,৩৮০	৯১,৮০০
মধ্য	৪০,০৯০	৪৪,০০০
ছোট	১৮,৬২৫	২৮,৮০০
প্রান্তিক	১০,৫২৫	১৯,৩০০
ভূমিহীন	৬,৫৫০	৮,৪০০

সারণী ঃ ২ প্রতিটি বর্গের জমির গড় পরিমাণ (একর)

গৃহস্থালী	বীরগঞ্জ	পুঠিয়া
বড়	১৫.৮২	১১.৪০
মধ্য	৩.২৩	৩.৬৭
ছোট	১.৯২	১.৯৭
প্রান্তিক	১.০৫	১.৭৫
ভূমিহীন	.২১	.২৭

বৃক্ষসম্পদের বিন্যাস

অন্যান্য অনেক দেশের মতো বৃক্ষসম্পদ বাংলাদেশে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক জীবনযাপনের সাথে অংগীভূত। সেকারণেই সব ধরনের বনায়নচর্চাই কৃষি ও কৃষকজীবনে সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। এদেশে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বসতভিটাতেই প্রধানতঃ বৃক্ষের সমাহার; আবাদী জমির উপর অথবা পার্শ্বে বৃক্ষের উপস্থিতি নিতান্তই কম। বড় ধরনের বাগান সাধারণতঃ বাড়ী-সংলগ্ন অথবা সামান্য দূরবর্তী অথচ বসবাস এলাকার মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং বসতভিটা, বাগান, ও আবাদী জমি-সংলগ্ন স্থানেই অধিকাংশ বৃক্ষের বিস্তৃতি প্রায় প্রতিটি সমতল এলাকার কৃষি-পরিবেশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বসতভিটার পরিমাণ বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে বিন্যস্ত ('সারণী' ঃ৩)। বসতভিটার আকার ও মোট জমির পরিমাণের সাথে বৃক্ষসম্পদের পরিমাণ ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। সারণী ঃ ৪ থেকে বৃসক্ষসম্পদের খামার আকার-ভিত্তিক পরিমাণ অনুধানন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আখ ও খেজুর গাছের আধিক্য পুঠিয়া এলাকায় বৃক্ষসম্পদের গড় প্রাপ্তিযোগকে বৃদ্ধি করেছে। বৃক্ষের ধরনের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, পুঠিয়ায় এটি তুলনামূলকভাবে বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ। নিম্নের বিস্তৃত হিসাব দুটি এলাকার বৃক্ষের খামার ভিত্তিক বন্টনকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করবে (সারণী ঃ৫)। এখানে নিম্নক্রমানুসারে প্রথম পাঁচটি ধরনকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। রাজশাহী

সারণী ঃ ৩ বসতভিটার পরিমাণ (একর)

গৃহস্থালী	বীরগঞ্জ	পুঠিয়া
বড়	.৩০	.২৫
মধ্য	.২২	.১৪
ছোট	.১৫	.০৮
প্রান্তিক	.১১	.০৬
ভূমিহীন	.০৪	০ ৩

সারণী ঃ ৪ বৃক্ষসম্পদের পরিমাণ

গৃহস্থালী	বৃক্ষের সংখ্যা	
	বীরগঞ্জ	পুঠিয়া
বড়	২৩	২০১
মধ্য	১৯	১৩০
ছোট	৬	৪০
প্রান্তিক	৪	২৫
ভূমিহীন	২.৫০	৪

এলাকায় আমগাছের আধিক্য সাধারণভাবে লক্ষণীয়। পুঠিয়ায় আম বাগান শুধুমাত্র বড় ও মধ্যম গৃহস্থালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'বড়'দের মধ্যে আম বাগানের গড় আকার .৫৮ একর যেখানে গড়ে ১০টি আম গাছ আছে। অবশ্য এমন গৃহস্থালীর সংখ্যা ৫০% এর বেশী নয়। 'মধ্যম'দের মধ্যে বাগানের গড় আয়তন .৩০ একর এবং গাছের সংখ্যা ৬টি। অন্যান্যদের মধ্যে বাগান হিসেবে পরিগণিত হবার মতো সমারোহ লক্ষ্য করা যায় না।

সারণী ঃ ৫ বৃক্ষের এলাকা ও খামার আকারভিত্তিক ধরন

গৃহস্থালী	বৃক্ষের ধরন ও সংখ্যা পুঠিয়া		বীরগঞ্জ	
বড় ☞	খেজুর -	১২০	আম -	৫৬
	সুপারী -	২০	কাঁঠাল -	৫.৪০
	আম -	২০	লিচু -	১.২০
	নারিকেল -	১০	কুল -	.৬০
	বাবলা -	১০	জাম -	.৪০
মধ্যম ☞	খেজুর -	৮০	আম -	৪
	সুপারী -	১০	কাঁঠাল -	৩.৪০
	নারিকেল -	১০	লিচু -	১.২০
	আম -	৫	কুল -	১.২০
	বাবলা -	৩	জাম -	.২০
ছোট ☞	খেজুর -	১৭	আম -	৩
	নারিকেল -	৫	কাঁঠাল -	৩.৪০
	সুপারী -	২	জাম -	.২০
	কাঁঠাল -	২	কুল -	.২০
	আম -	১.৬০	নারিকেল -	.২০
প্রান্তিক ☞	খেজুর -	৫	আম -	১.৪৮
	নারিকেল -	৫	কাঁঠাল -	.৬০
	সুপারী-	২	লিচু-	.৫৬
	কাঁঠাল -	.৫০	কুল -	.৬০
	আম -	১.৫	নারিকেল-	.০৮
ভূমিহীন ☞	নারিকেল -	১.৫	আম -	১
	সুপারী -	.৪০	কাঁঠাল -	.৬০
	আম -	.৪০	কুল -	.০৪
	জাম -	.৪০	সুপারী -	.০৪
	তাল -	.২৫	পেয়ারা -	.০৪

বৃক্ষরোপণ, উৎপাটন ও পরিভোগ

বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষণের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় সাধারণভাবে সব ধরনের গৃহস্থই এব্যাপারে আগ্রহী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। ধর্মীয় অনুশাসন, ঐতিহ্য, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, ও সরকারী/বেসরকারী প্রচারণা, প্রদর্শণী, সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সংমিশ্রনে মানুষের উপলব্ধির পরিমণ্ডল গঠিত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে বৃক্ষ-সচেতনতা সামান্য বেশী বলে মনে হয়েছে। তবে কতিপয় ব্যক্তি - যারা প্রধানতঃ মধ্যম ও বড় গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত - উন্নততর আধুনক বৃক্ষরোপণ ও বনায়নচর্চার বিষয়ে আগ্রহী এবং অনুসন্ধিৎসু। উদ্যোগের অভাব থাকলেও তাদের পরিকল্পনা রয়েছে এ ব্যাপারে অদূর ভবিষ্যতে কিছু করার। কৃষি বনায়ন সম্পর্কে তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে কতিপয় বৃক্ষরোপণের ঐতিহ্যগত ধারা প্রচলিত আছে বলে তারা জানিয়েছেন। এছাড়া উচু জমির পার্শ্বে তালগাছ রোপণের মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধ করবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। জমির মাঝখানে অথবা কোনোয় বাবলা ও খয়ের গাছের উপস্থিতি এক সময় অনেক বেশী থাকলেও এখন অত্যন্ত কম বলে জানা গেছে। এ ধরনের ঐতিহ্যিক ব্যবস্থাদির পুনঃপ্রচলনে তাদের সুবিধা হবে বলে তাঁরা মনে করেন। এক্ষেত্রে অনেকের মতে খেজুর গাছের ভূমিকা বর্তমানে প্রবল বলে মনে করেন। কাঠ-জাতীয় গাছ, যেমন, মেহগনীর ব্যাপক ভিত্তিক রোপণ একজন গৃহস্থ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুতা ও পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে ঐতিহ্যগত উপায়েই অনেক জায়গায় অনেক ধরনের বৃক্ষরোপণ সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন।

যাহোক, বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালীর মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও উৎপাটনের হার নিম্নের সারণীঃ ৬ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। রোপিত বৃক্ষের চারা সংগ্রহের ধরন লক্ষ্য কররে দেখা যায় যে, পুঠিয়া এলাকায় নার্সারী ও হাটবাজার থেকে যেমন চারা সংগ্রহ করা হয়েছে তেমনি নিজের তৈরী চারাও ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে গ্রামে তৈরী চারা হাটে বিক্রি হতে দেখা যায়। তবে এ ধরনের চারাগুলো উন্নত বা নতুনজাতের নয় বলে অনেকেই মনে করেন। দেখা গেছে অনেক কলমের আম হিসাবে লাগানো গাছ মূলতঃ সাধারণ ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। আবার এমন ধারণা অনেকে পোষণ করেন যে অতীতে তাদের অনেক ভালো জাতের গাছ ছিল বা তারা দেখেছেন যেগুলো এখন আর প্রায় দেখা যায়না। এ ধরনের ভালো প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাব সবায় উপলব্ধি করলেও নির্ভরযোগ্য প্রয়াস আশাব্যঞ্জক নয়। বৃক্ষ উৎপাটনের ক্ষেত্রে মৃত, জ্বরা-আক্রান্ত, ও ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া বৃক্ষ কেটে ফেলার সংখ্যা নিতান্তই কম।

সারণী ঃ ৬ বৃক্ষরোপণ ও উৎপাটনের মাত্রা

গৃহস্থালী	রোপণ*	বেঁচে আছে** (বীরগঞ্জ/পুঠিয়া)	উৎপাটন***
বড়	৬/২০	৩/৫	২/৮
মধ্যম	৩/১০	২/৩	০/৪
ছোট	২/৫	১/২	৫/৩
প্রান্তিক	২/৩	১/১	২/১
ভূমিহীন	১/২	১/১	১/১

* গত দুবৎসরে ** গত দুবৎসরে রোপিত বৃক্ষের মধ্যে *** গত দশ বৎসরে

অধিকাংশ বৃক্ষ সর্বাধিক পরিপক্কতা প্রাপ্তির জন্য আরো সময় লাগতো বলে অভিমত ব্যক্ত করতে দেখা যায়। বড় গৃহস্থালীতে কেটে ফেলার কারণ হিসেবে জমি ক্রয়, শরীকের সাথে বিবাদ বিসম্বাদ, ব্যবসায় বিনিয়োগ, নতুন ঘরের জন্য জায়গা তৈরী, ও সাংসারিক প্রয়োজন ইত্যদিকে চিহ্নিত করা গেছে। সাংসারিক প্রয়োজনের মধ্যে আসবাবপত্রসহ জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন পরিপূরণ ছাড়াও নগদ অর্থ-প্রাপ্তিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মধ্যম গৃহস্থালীগুলোতে বিয়ের খরচ, টিউবওয়েল স্থাপন ও সাংসারিক খরচ মেটানোর তাগিদ ছিল বলে জানানো হয়েছে। ছোট, প্রান্তিক ও ভূমিহীন গৃহস্থালী সরাসরি সাংসারিক অনটন, ঋণগ্রস্থতা, মেয়ের বিয়ে, ঘরের সংস্কার ইত্যাদি কারণকে উল্লেখ করেছেন। এমন কোন গৃহস্থালী পাওয়া যায় নাই যারা গত দশ বৎসরে কোন গাছ কাটা থেকে বিরত ছিলেন। বড় গৃহস্থালী পরিচর্যা বলতে আমের মৌসুমে তিনবার স্প্রে করেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া বড় গাছের তেমন কোন পরিচর্যা নেই বললেই চলে।

গ্রামীণ জীবনে কাঠ-প্রদায়ী বৃক্ষের পাশাপাশি বাস্তুভিটায় শাকসবজি ও ফলমূলের গাছ লাগানোর প্রচেষ্টা সব সময়ই লক্ষ্য করা যায়। বাড়ীর উঠোন-সংলগ্ন স্থানে অথবা ঘরের পেছনে এ ধরনের বাগান দৈনন্দিন প্রয়োজনের অনেক দিক পরিপূরণ করতে পারে। এছাড়া পরিবারের সবায় এ ধরনের উদ্যোগে বিভিন্ন মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে ও ভূমিকা রাখতে পারে। বীরগঞ্জ ও পুঠিয়া এলাকায় এ ধরনের বসতবাগানের প্রকৃতি, বিস্তৃতি, ও মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বীরগঞ্জে গৃহউদ্যানচর্চায় সব ধরনের গৃহস্থালীর অংশগ্রহণ মাত্রাগতভাবে পুঠিয়া এলাকার চেয়ে বেশী বরে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, বাজারজাতকরণের প্রবনতা বীরগঞ্জে বেশী হলেও পুঠিয়ায় এ ধরনের উদ্যোগ কম। জানা গেছে পুঠিয়া এলাকায় শাকসবজি উৎপাদনে কোন বিশেষ গ্রাম বা জনগোষ্ঠী নিয়োজিত। এ ধরনের একটি জনগোষ্ঠীকে ঢাকা থেকে আগততের উত্তরসূরী মনে করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক উদ্যোগের অভাবের ব্যাপারটি বোধগম্য। এছাড়াও, দৈনন্দিন প্রয়োজন পরিপূরণের তাগিদ থেকে শাকসবজি উৎপাদন প্রচেষ্টা পুঠিয়ার গৃহস্থদের মধ্যে অনেক কম। অন্যদিকে বীরগঞ্জে এ ধরনের উদ্যোগের সাথে ঢাকার বাজারের সংযোগ লক্ষ্য করা গেছে। সারণীঃ ৮ থেকে এধরনের বাগানের উপস্থিতি, খামার-আকারভিত্তিক বিক্রয়-ভোগের তারতম্য ও নিয়োজিত শ্রমের উৎস দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণী থেকে এটি অনুধাবন করা যায় যে, বীরগঞ্জ এলাকায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল গৃহস্থালীই বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত তৈরী করেন। অপরদিকে পুঠিয়া এলাকায় ভূমিহীনদের মধ্যে বিক্রয় প্রচেষ্টা বেশী। বাগানচর্চার ক্ষেত্রে বীরগঞ্জ এলাকায় সচ্ছল গৃহস্থরা এবং পুঠিয়া এলাকায় ছোট ও প্রান্তিক গৃহস্থালীগুলো অপেক্ষাকৃত বেশী উদ্যোগী। বীরগঞ্জ এলাকার বসতবাগানে লাগানো শাকসবজি অনেক বেশী বিচিত্র। অন্যদিকে পুঠিয়ায় লাউ, কুমড়া, ও সীম জাতীয় গাছের সংখ্যা বেশী। দুটি এলাকার বসতবাগানের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়-জনিত আয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন বর্গের গৃহস্থালীর মধ্যেও বসতবাগান-ভিত্তিক আয়ের পার্থক্য রয়েছে। লিংগভিত্তিক নিয়োজনের তারতম্য থেকে দেখা যায় বীরগঞ্জ এলাকায় বসতবাগানে মেয়েদের নিয়োজন পুঠিয়ার এলাকার চেয়ে কম। এক্ষেত্রে বাজারমুখী উৎপাদনের সাথে লৈংগিক পার্থক্যের সংশ্রব থাকতে পারে বলে মনে হয়, কারণ বীরগঞ্জ এলাকায় বিক্রির জন্য শাসকসবজির উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী। সাধারণভাবে উভয় এলাকার বাস্তুভিটাতে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে মেয়েদের অবদান নগণ্য। তবে

পরিচর্যাপ্রবণ শাকসবজি ও স্বল্পকালীন ফলমূলের গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

সারণীঃ ৭ বসতবাগানচর্চা, পরিভোগ, ও শ্রমবিভাজন

গৃহস্থালী	ভোগ/বিক্রয় (%)	পারিবারিক শ্রমবিভাজন (%) ছেলে	মেয়ে	মজুর	উদ্যোগবিহীন গৃহস্থালী (%)
	পু	- ঠি -	য়া		
বড়	১০০/০	২৫	৭০	৫	৫০
মধ্যম	১০০/০	২৫	৭৫	০	৪০
ছোট	৯৫/৫	২০	৮০	০	৩০
প্রান্তিক	৯০/১০	৩০	৭০	০	৩০
ভূমিহীন	৭৫/২৫	৫০	৫০	০	৭৫
	বী -	র -	গ -	জ্ঞ	
বড়	৭৪/২৬	৮০	১০	১০	১৫
মধ্যম	৩২/৩৮	৭০	২০	৫	১০
ছোট	৮০/২০	৬০	৪০	০	১০
প্রান্তিক	৮৫/১৫	৫০	৫০	০	২৫
ভূমিহীন	১০০/০	৫০	৫০	০	৫০

জ্বালানী, জৈব উৎস, ও সংকট

গ্রামীণ সমাজের জ্বালানী সমস্যার প্রকৃত ও সার্বিক রূপ আবিষ্কার করা সীমিত উদ্যোগে সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালীর মধ্যে জ্বালানী সমস্যার প্রকটতা কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে। যেহেতু জৈবজগতই গ্রামীণ জ্বালানী সরবরাহের প্রধান উৎস সেহেতু বনসম্পদের সাথে এর যোগসূত্র রয়েছে। দেখা গেছে দৈনন্দিন রান্না, ও গুড় তেরীর ক্ষেত্রে গৃহস্থালীগুলো কৃষি-অবশেষ, যেমন, আখের পাতা, ঝরাপাতা, খড়, পাটকাটি, ও পশু-বিষ্ঠার মধ্যে গোবরজাত জ্বালানীর উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। ঝরা পাতা বা শাখা এবং খড় জাতীয় জ্বালানী যেহেতু নিজস্ব জমি থেকে অথবা সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয় সেহেতু এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। জ্বালানীর জন্য কাঠের ব্যবহার বড় ও মধ্য গৃহস্থালীর মধ্যে থাকলেও ছোট, প্রান্তিক ও ভূমিহীনদের মধ্যে খুব কম। সারণীঃ ৮ থেকে বিদ্যুৎসহ জ্বালানী খরচের একটি বর্গ ভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, উভয় গ্রামে বড় গৃহস্থালীর মধ্যে গার্হস্থ্য বিবেচনায় কোন রকম জ্বালানী সংকট নেই। কেরোসিন ছাড়া মূলত কোন কিছু কিনতে হয় না তবে মধ্য গৃহস্থালী থেকে

শুরু করে নিচের দিকে এ সংকট তীব্রতর। মধ্যম ও ছোট গৃহস্থালীগুলোকে জ্বালানী কাঠ কিনতে হয়। মধ্যম গৃহস্থালীগুলোকে ৫০% কাঠ ও ছোট গৃহস্থালীগুলোক ৫০% পাটকাঠি কিনতে হয়। প্রান্তিক ও ভূমিহীন ও গৃহস্থালীগুলো মূলত সংগ্রহকৃত পাতা ও কৃষি-অবশেষের উপর নির্ভর করে। এদের মধ্যে পাটকাঠি ও গোবরজাত ঘুটার প্রয়োজনের প্রায় ৫০% কিনতে হয় ভূমিহীন গৃহস্থালীও প্রধানতঃ কুড়ানো পাতা ও কৃষি-অবশেসের উপর নির্ভরশীল হলেও ঘুটা ও পাটকাঠি সামান্য পরিমানে কিনতে হয়। বলাবাহুল্য, অনেক স্বচ্ছল গৃহস্থালীকেও গোবরজাত ঘুটা কিনতে হয় কারণ তাদের নিজস্ব কোন গোসম্পদ নেই। জ্বালানী কাঠের ব্যবহার বীরগঞ্জ এলাকায় সামান্য বেশী হলেও পুঠিয়ায় ঘুটার ব্যবহার বীরগঞ্জের চেয়ে বেশী। পুঠিয়া এলাকায় পাটকাঠির সরবরাহ কম হওয়ায় মূল্য বেশী বলে জানা গেছে। বীরগঞ্জে পাটকাঠির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশী কিন্তু আখের পাতায় ব্যবহার কম। পুঠিয়া এলাকায় জ্বালানীর একটি বিরাট অংশ গুড় তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। আখের অবশেষ প্রধানতঃ এখানে গুড় তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কৃষি-অবশেষের একচেটিয়া ব্যবহার ভূমির উর্বরতা কমিয়ে দেয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে জ্বালানী হিসেবে গোবরের ব্যবহার নিশ্চিতভাবে ভূমির উর্বরতা হ্রাসে সহায়ক। প্রতিটি গৃহস্থালী প্রয়োজনের অনেক কম পরিমানে গোবরসারের ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন।

সারণীঃ ৮ মাসিক খরচ (টাকা)

গৃহস্থালী	বিদ্যুৎ	কেরোসিন	কাঠ	ঘুটা	পাটকাঠি
বী - র - গ - ঞ্জ					
বড়	১২৫	৫৬	২০৩	২৭	১০৭
মধ্যম	৯৪	৮০	১৪৫	৩৮	৯৫
ছোট	৯৪	৬৬	১২৫	৫৭	৬০
প্রান্তিক	৩৫	৯৫	২৫	২৭	৪৪
ভূমিহীন	০০	২০	০০	০০	০০
পু - ঠি - য়া					
বড়	১৫৫	৪০	২০০	৮০	২০০
মধ্যম	৮০	৫০	৫০	২৫০	১৫০
ছোট	৭৫	৪০	৪০	১০০	১০০
প্রান্তিক	০০	২০	০০	৫০	৫০
ভূমিহীন	০০	১৫	০০	০০	০০

যেহেতু কৃষি অবশেষে থেকে জ্বালানী প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলে অনুমান করা হয়ে থাকে এবং জ্বালানী হিসাবে গোবরের প্রাপ্তির বৃদ্ধি পাওয়ারও তেমন কোন লক্ষণ নেই, সেহেতু এটি মনে করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন ধরণের গাছপালাকই এই অভাব পূরণের জন্য চাপ সহ্য করতে হবে।

বনজদ্রব্যঃ চাহিদা ও বাজারের বিস্তৃতি

উভয় এলাকায় কাঠ ও অর্থকরী ফলমূলের বহির্গমন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাসের ছাদকে পরিবরণের কাজে ব্যবহার, রিকসা-ভ্যানের বৃদ্ধি বহির্গমনকে সহজতর করেছে। আম খেজুর গুড়, শাকসবজি ও ব্যবহার্য কাঠের বাজার যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে তেমন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এ ধরনের কাজে বিভিন্ন মাত্রায় নিয়োজিত রয়েছে। এ ছাড়া, 'স'মিল', ইটের ভাটা, রাস্তাঘাট উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো জ্বালানীকাঠের চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে নিকটবর্তী শহর এলাকার জন্য আসবাবপত্র ও নির্মাণ উপাদান হিসাবে কাঠের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে সাধারণভাবে গ্রামীণ বৃক্ষসম্পদের উপর স্থানীয় ও বাহ্যিক উভয় ধরণের চাপ বাড়ছে। সম্প্রসারিত বাজারের উপর নির্ভরশীল জনগণের মধ্যে নিম্ন অবস্থানে যেসব ব্যবসায়ী রয়েছে তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং প্রয়োজনে আগাম মূল্য প্রদানের মাধ্যমে গাছ ক্রয় করে রাখে। বীরগঞ্জ এলাকা থেকে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও পঞ্চগড় সদরে কাঠ সরবরাহ করা হয় তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণত স্থানীয় স'মিলের মাধ্যমে তা সম্পাদিত হয়। স'মিলে প্রক্রিয়াজাত হবার পর অথবা তার আগে প্রাপ্ত উচ্ছৃষ্টসমূহ স্থানীয় জ্বালানী কাঠের চাহিদা পূরণ করে। গত ২০ বৎসরে অবশ্য জ্বালানী কাঠের দাম প্রায় দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বীরগঞ্জ এলাকায় ইটের ভাটায় বাঁশের মুড়াসহ সবধরনের গাছের কাঠ ব্যবহার হয়, তবে, শিমুল কাঠের ব্যবহার লাভজনক বলে মনে করা হয়। এছাড়া শালপাতা ও শালগাছের ডালপালা স্থানীয় এলাকায় গার্হস্থ্য জ্বালানী হিসাবে বিক্রি করা হয়। দেড় থেকে দু'ফুট বেড় বিশিষ্ট একটি শালের জ্বালানী আঁটির মূল্য বারো থেকে আঠারো টাকা; আবার এক বস্তা শালপাতার মূল্য আট থেকে দশ টাকা। উল্লেখ্য যে, বীরগঞ্জ এলাকার সাথে ঢাকার বাজারের সংযোগ অসংগঠিত হলেও বিচিত্র। শাকসবজি, কাঠ, চাল, লিচু, আম প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। শাকসবজির বহির্গমন মূলত মৌসুমী ফলমূলের ব্যবসার চলমানতাকে ধরে রাখে। তাছাড়া, শাকসবজির ব্যবসা চাল ও হাঁস-মুরগীর ব্যবসার চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চিত বলে স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর ধারণা। পুঁজি নিয়োজনের মাত্রার সাথে ব্যবসায়ীদের স্তর ও লাভের মাত্রা ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। কাঠের আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ যেমন দেখা যায় না তেমন ফলমূল ও শাকসবজির আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে ডিম, গম ও আলু সংরক্ষণের জন্য দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁয় অবস্থিত 'কোল্ড ষ্টোরেজ' ব্যবহৃত হয়।

পুঠিয়া ও বানেশ্বর বাজার স্থানীয় গ্রামগুলোতে উৎপাদিত খেজুর গুড় ও আমের বাজার সংক্রান্ত প্রধান সংযোগস্থান। আম ও গুড়ের বাজার দূরবর্তী এলাকার সাথে সম্পর্কিত। চারটি পর্যায়ে আমবাগান বিক্রি হতে দেখা যায়ঃ 'পাতা বিক্রি' বা মুকুল আসার পুর্বে; 'মুকুল বিক্রি' বা মুকুল থাকা অবস্থায়; 'গুড়ি বিক্রি' বা আমের গুটি থাকা অবস্থায়; এবং 'আম বিক্রি' বা পরিপক্ক আম থাকা অবস্থায়। এছাড়াও বৎসরাধিক কালের জন্যও বাগান বিক্রি হয়ে থাকে। এমন উদাহরণ তথ্যানুসন্ধানকালে পাওয়া যায় যে, তিন বৎসরের জন্য ২০টি আমগাছ ২২,০০০ টাকায় কেনা হয় এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে যথাক্রমে ক্রয়কারী ২৪,০০০, ৬০,০০০ ও ৮০,০০০ টাকার আম বিক্রি করে। 'পাতা' ও 'মুকুল' বিক্রির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাজনিত অনিশ্চিয়তার

ঝুকি ক্রয়কারীকে বহন করতে হয়। শিলা বৃষ্টি, ঝড়, ও কুয়াশা আমের জন্য ক্ষতিকর। তবে লাভ ও ক্ষতির সম্ভাবনা এক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশী। গত বৎসর একজন ব্যক্তি ২৫০টি গাছ কেনে এক লক্ষ টাকায় আর বিক্রি করে সাড়ে চার লক্ষ টাকায়। এর মধ্যে পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ হয়েছে ৩৫,০০০ টাকা। আমের খুচরা ও পাইকারী বিক্রি লক্ষ্য করা যায়। খুচরা বিক্রির ক্ষেত্রে মন ও সংখ্যার ভিত্তিতে বিক্রয় হলেও পাইকারী বিক্রির ক্ষেত্রে মণ দরে বিক্রি হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ বাইরের ক্রেতাদের মধ্যে নোয়াখালী ও কুমিল্লার ব্যবসায়ীরা বেশী নিয়োজিত। অনেক সময় বাগান ক্রয়কারীরাই বাইরের 'মোকামে' আম পাঠানোর ব্যবস্থা করে। আমের পরিবহণ সুবিধার জন্য তিন আকারের 'টুকরী' করা হয়ে থাকে। ছোট বা স্থানীয়ভাবে আখ্যায়িত 'বল টুকরী'তে বড় ধরনের চারটি আম থাকে। মাঝারী 'টুকরী'তে ২৫ থেকে ৩০টি ও বড় টুকরীতে ৫০ থেকে ৬০টি বড় আম ধরে। সাধারণত দূরবর্তী স্থানে ট্রাকে বা কোচের ছাদে টুকরী সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে অসাবধানতা, 'টুকরী' তৈরীর ক্ষেত্রে ত্রুটি ও নগরবাড়ী-আরিচা ঘাটে বিলম্ব জনিত কারণে আমের ক্ষতি হয়। পুঠিয়ার অনুসন্ধানকৃত এলাকায় খেজুর গুড় একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী অর্থকরী সম্পদ। প্রায়ই প্রতিটি গৃহস্থালীরই কিছু খেজুর গাছ আছে। বর্তমানে খেজুর গাছ লাগানো ও তার পরিচর্যার দিকে নজর দেয়া হচ্ছে। গৃহস্থ নিজে অথবা চুক্তির ভিত্তিতে গুড় উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে প্রধান সুবিধা হলো জ্বালানী বড় বাধা হয়ে দাড়ায় না এবং রস লাগানো ও গুড় তৈরীকারকরা পারিবারিক শ্রম প্রদানের মাধ্যমে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে কাজটি করে থাকে। শীতের মৌসুমে গুড় উৎপাদন ও এ থেকে প্রাপ্ত আয় গৃহস্থ ও দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের উৎসবের আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে। এই এলাকার গুড়ের বাজার ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, সৈয়দপুর ও পাবনা প্রভৃতি এলাকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত। তবে তুলনামূলকভাবে ঢাকার পাইকারী ক্রেতার সংখ্যা বেশী। কাগজের প্যাকেটে করে দূরবর্তী এলাকার জন্য ট্রাক, বাস ও ট্রেনে গুড় পরিবহণ করা হয়। জানা যায় ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য যায়গায় 'পাটালী' গুড়ের চাহিদা বেশী। ঢাকায় 'খুড়ি' ও নিকটবর্তী এলাকায় 'ঝোলা' গুড়ের চাহিদা রয়েছে। মৌসুমের শুরুতে কেজি প্রতি বাইশ টাকা মূল্য লক্ষ্য করা গেলেও পরে তা পনর থেকে ষোল টাকায় নেমে আসে। গুড় সংরক্ষণের কোন আধুনিক ব্যবস্থা বা প্রচলন লক্ষ্য করা যায় না। তুলনামূলকভাবে বীরগঞ্জ এলাকার চেয়ে পুঠিয়া এলাকায় কৃষিজীবী গৃহস্থালীদের জন্য একটি বাড়তি আয়ের উৎস হিসাবে গুড়ের গুরুত্ব অনেক বেশী।

কতিপয় মূল্যায়ন ও সামাজিক বনায়ন প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের গ্রামীণ বনায়ন সাম্প্রতিককালে গুরুত্ব লাভ শুরু করেছে। এর আগে বনবিষয়ক ভাবনা মূলত সংরক্ষিত বন ও বন সংরক্ষণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশে বন এলাকার প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বনবিভাগ, বেসামরিক জেলা প্রশাসন ও বসতবাটির নিয়ন্ত্রণে যথাক্রমে ১.৪৬, .৩০, ও .৬৮ মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল আছে। অপরদিকে ভূমি ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে এদেশে যে ধরনের উদ্যোগ উৎসাহিত করা হচ্ছে তা হলো কৃষিবনায়ন ও সামাজিক বনায়ন। সংজ্ঞাগত অমিল থাকলেও সম্ভাব্য ভূমিব্যবহারের উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দু'টি উদ্যোগের পরস্পর অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে কৃষিবনায়ন পরিকল্পনা

(১৯৯০-৯৫) যে নীতি, গবেষণা ও কর্মসূচীর দিক নির্দেশনা দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, Agroforestry is the joint production of perennial woody species and agricultural crops, sometimes in association with livestoock.... Agroforestry can help to alleviate both rural poverty and forest depletion. But it must be implemented under a participatory approach where rural people actively take part in planning, implementation and benifit sharing of agroforestry schemes. (BARC : 1991) সামাজিক বনায়ন বা সাম্প্রদায়-ভিত্তিক বনায়ন সরকারী জায়গায় বিভিন্ন মাত্রায় গণ-অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনায়ন বুঝানো হয়েছে (Chowdhury, 1989)। সুতরাং জনগণের অংশগ্রহণ ও ফলভোগের সাধারণ উদ্দেশ্য উভয় উদ্যোগকেই সম্পর্কিত করেছে। যাহোক, খাস জমির স্বল্পতা গ্রাম পর্যায়ে বসতবাটি ও খামারভিত্তিক কৃষিবনায়নের প্রয়োজনীয়তাকে অনিবার্য করেছে। যতবেশী বাসস্থান ও মানুষের সংলগ্ন হবার চেষ্টা করা হয়েছে ততবেশী একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের চাহিদা, মনোভাব, বাস্তব সমস্যা ও বাধাসমুহের সম্যক উপলব্ধি ব্যতীত শুধু চারাগাছ সরবরাহ তেমন বেশী ফলশ্রুতি বয়ে আনতে পারবে না। বর্তমান জরিপকালীন পর্যবেক্ষণের আলোকে কতগুলো বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হলো যা গ্রামীণ পুনর্গঠনের সার্বিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। সাধারণ সচেতনতা ও প্রত্যক্ষণের মাত্রা লক্ষ্য করলে দেখা যায যে, গ্রামীণ মানুষের বৃক্ষসম্পদের আর্থিক ও সামাজিক মূল্য সম্পর্কে ধারণা যথেষ্ট হলেও এব্যাপারে উদ্যোগী হবার প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনমন্যতা যথেষ্ট নয়। বিষয়টি আবার বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশও কম। কারণ, গবেষণা, সম্প্রসারণ, অবকাঠামো, বাজারজাতকরণ, বীজ ও উপকরণের মূল্য, ভূমি ব্যবহার ও মালিকানার ধরন, খাদ্য অভ্যেস প্রভৃতি বিষয় ও বাস্তবতার মধ্যেই কৃষক সমাজ গঠিত। এসব বিষয়ের অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ ও অত্যন্ত সুসমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া ব্যতীত প্রকৃত সাফল্য আশা করা যায় না। বলা বাহুল্য ১২ মিলিয়নের মধ্যে ২ মিলিয়ন গ্রামীণ গৃহস্থালীর কোন বসতবাটি নেই (B.B.S. 1991)। সুতরাং শাকসবজির উৎপাদন একটি বাস্তবিক বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অথচ বসতবাটি মোট চাষযোগ্য এলাকার ৫ ভাগ (Abdullah, 1986)। গৃহস্থালীকেন্দ্রিক সচেতনতার মাত্রায় সদস্য ভেদে তারতম্য থাকলেও পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব গৃহস্থকেন্দ্রিক হওয়ায় যে কোন উদ্যোগ তার সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

সার্বিকভাবে গৃহস্থালীর পরিকল্পনা গ্রহণের অভাব ও সদস্যদের স্বাধীন উদ্ভাবন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রথাগত নির্লিপ্ততা একটি বিরাট বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই নির্লিপ্ততা শুধু একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, বরং অজ্ঞানতা, অসচেতনতা, নিরক্ষরতা, অস্থিরতা, উদ্বুদ্ধকারী তথ্য সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়ন ভাবনার অনুপস্থিতি দ্বারা তাড়িত। মেয়েদের ক্ষেত্রে বসতবাগান ও পশু-পাখী তদারকীতে অংশগ্রহণ থাকলেও স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নেয়ার প্রশ্নে কেন্দ্রিভূত কর্তৃত্ব কাঠামো আরো বেশী বাধা হিসেবে উপস্থিত হয়ে থাকে। এলাকা ও সমাজভেদে এর তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন পুঠিয়া এরাকায় ছাগল, গরু, হাস-মুরগী পালনের ক্ষেত্রে বাড়ীর মেয়েদের অংশগ্রহণ বীরগঞ্জ এলাকার চেয়ে বেশী বলে মনে হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর সময় ব্যবহারের সাধারণ প্রত্যক্ষণ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, উভয় এলাকায় বড় গৃহস্থরা আচরণগত দিক দিয়ে কিছুটা ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ; কৃষি প্রধান পেশা হলেও সময় ও মনোযোগ প্রদানের অভাব রয়েছে। অবশ্য কৃষির অন্তর্ভূক্ত উপখাতগুলোর পারস্পরিক গুরুত্ব ও নগর সংস্কৃতির প্রভাব এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। আয় ও দৈনন্দিন প্রয়োজন পরিপূরণে বৃক্ষসম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) বৃক্ষ পরিচর্যা, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা শস্য উৎপাদনের মতো নিষ্ঠা ও যত্ন থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে সুনির্দিষ্ট বসতবাগানের অনুপস্থিতি ও বসতবাটির পরিছন্ন ব্যবহারের উদ্যোগের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। সরকারী সম্প্রসারণ কার্যক্রম বসতবাগান তৈরী, পরিচর্যা ও চারা-বীজ-কীটনাশক সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ প্রোগ্রাম নিতে পারে যা সার্বক্ষণিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানকে নিশ্চিত করবে। বসতবাটিতে যেহেতু অধিকাংশ বৃক্ষের উপস্থিতি রয়েছে, সেহেতু শাকসবজি ও কৃষিবনায়নের দ্বৈত লক্ষ্যকে সমন্বিত করে প্রতিবেশানুগ নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এছাড়া, সনাতন কৃষিবনায়নের প্রকৃতি বিচার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন যাতে করে বনজ সম্পদের আহরণ, বাজারজাতকরণ ও আয়-বন্টন আরো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। পুঠিয়া এলাকায় প্রচুর পরিমাণ খেজুর গাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। খেজুরের গুড় তৈরীর ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ যেমন অত্যন্ত কম তেমনি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কৃষক পরিবারের জন্য তেমন ঝুকিপূর্ণ নয়। জ্বালানীর সংকট সাধারণত প্রকট নয়। কারণ এই এলাকায় আখের মতো ফসলের অবশেষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ অবকাঠামোর সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, কুঠিরশিল্প, জ্বালানী সমস্যা, মহিলাদের নিয়োজন, নিম্নবৃত্তের বাড়তি আয়, চিনির বিকল্প ইত্যাদি বিষয়গুলোকে খেজুর গাছের উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত করে উন্নয়ন ভাবনার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া খামার আকার ও অব্যবহৃত পরিসরের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃক্ষের জাত নির্বাচন ও তাৎক্ষণিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরত্ব দেয়া যেতে পারে। জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে শস্যক্ষেত্রের উর্বরা শক্তি ও ফসলের উপর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা যেমন দরকার তেমন পশুখাদ্য ও স্থানীয় কুটির শিল্পের চাহিদা ইত্যাদি বিষয়কেও সম্যকভাবে বিচার করা দরকার। যেমন, কোন এলাকায় তুতগাছের রোপণ প্রয়োজনীয় হতে পারে আবার সাধারণতভাবে পশুখাদ্য হিসেবে কাঁঠাল পাতার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং গৃহস্থালীর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রয়োজন যা তাকে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে সার্বিক পরামর্শ প্রদান করতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত উদ্যোগ সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে গৃহস্থালী নির্বাচন ও অংশগ্রহণের নীতিমালাসহ সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করা দরকার। বৃক্ষ পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করবার জন্য নির্দিষ্ট পর্যায়ে সবার অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশে গ্রামীণ বনায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পুষ্টি, পশুখাদ্য জ্বালানী ও পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা এই প্রয়োজনীয়তাকে আরো গুরুত্ববাহী করেছে। এছাড়া, গ্রামীণ শিল্পের প্রসারকে সহায়তাদানের জন্যেও বনায়ন অপরিহার্য। প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাব্যতা

অনেক কারণেই সীমিত। বাস্তুভিটা বনায়নের সর্বোচ্চ সীমা অর্জনসহ খামার পর্যায়ে কৃষিবনায়নের ব্যাপারটিকে আরো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। খাস, ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হলে বৃক্ষের স্বত্ত্বাধিকারের ব্যাপারটি পৃথকভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়া, যেহেতু গ্রামীণ সমাজে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সুবিধা লাভকে নিশ্চিত করা দরকার, সেহেতু এধরনের উদ্যোগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্ব অনেকটা উক্ত গোষ্ঠীর উপর বর্তানো যেতে পারে। বিত্তহীনদেরকে সরকার ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এমন অনেক উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে যাচ্ছেন বলে আমরা জানি যার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে বনায়নের উপর। কারণ, কুঠির ও ছোট শিল্পের জন্য কাঁচামালের একটি প্রধান উৎস বনসম্পদ। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে এলাকার কৃষিপরিবেশতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও বাজারের সংযোগটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। কৃষি সম্প্রসারণ, নার্সারী ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের ব্যাপক সংস্কার হওয়া প্রয়োজন যাতে করে মৎস্য, পশু সম্পদ, ফলবাগান ও কৃষিনবায়নের মতো বিষয় গুলোর সাথে জড়িত দিকগুলো আরো ব্যবহারিক সহায়তা পেতে পারে। গ্রামীণ শিল্পের বিকাশের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন বনজসম্পদের ভিত্তিতে সরকারী সহায়তা ও পরামর্শের আশু প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, পুঠিয়া এলাকায় আম, নারিকেল, খয়ের, খেজুর, আখ ইত্যাদির ভিত্তিতে স্থানীয় ছোট শিল্পের অভ্যুদয় উৎপাদনবৃদ্ধি, অপচয়রোধ ও বাজারজাতকরণকে উৎসাহিত করতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি গৃহস্থালীকে একক হিসাবে গ্রহণ করে স্থানীয় ভিত্তিক চারা ও বীজ উৎপাদন, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা, ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বাজার ও শিল্পনীতির ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবর্তন, সম্পদহীন গোষ্ঠীকে অংশীদারিত্ব প্রদান, পল্লী উন্নয়নের নীতিমালাকে সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের নীতিমালা দ্বারা আরো বাস্তবমুখীকরণ ও এসব প্রশ্নে স্থানীয় ভিত্তিক সাংগঠনিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এলাকাভিত্তিক বনজ সম্পদের যেমন বৈচিত্র্য লক্ষণীয়, তেমন অবহেলিত ক্ষেত্র উন্মোচনও কঠিন নয়। কৃষি, পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রশাসন, অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থানসহ, অকৃষি উদ্যোগের পরিকল্পিত বিকাশ, চাহিদার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রভৃতি বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন দরকার। বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে তাকে কমানোর জন্য উন্নয়নমূলক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়া দরকার। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতাকেও বাইরে রাখা সম্ভব নয়। মোট কথা, সামাজিক স্বার্থভাবনা, সম্পদভিত্তি রক্ষা ও জীবিকার বহুমূখীকরণ প্রয়োজন যা হতে হবে স্থানীয়, স্বাবলম্বী ও স্বচালিত।

তথ্যনির্দেশ

BARC, (Bangladesh Agricultural Research Council) 1991
Bangladesh Agroforestry Plans (1990-95) : An Agenda for Policy, Research and Action. BARC, Dhaka.

BBS, (Bangladesh Bureau of Statistics) 1991.
Statistical Yewrbook of Bangladesh.

Chowdhury, Bahauddin 1989.
"Forestry Sub-sector" in Bangladesh Agriculrure Sector Review Vol. II (Subsectors in Agriculture), UNDP. Dhaka.

Department of International Development Co-operation (Denmark) 1989
Environmental Profile: Bangladesh, Dhaka.

Douglas J. T. 1982
A Reappracial of Forest Development in Developing Countries, Junk Publishers, The Hogue.

Government of Bangladesh, 1987.
Bangladesh Energy Planing project, (Final Report).

Hammermaster E. T. 1981
Village Forestry Inventory of Bangladesh: Inventory Results, (Field Documentation No. 5) UNDP/FAO, Dhaka cited in Leuschner and Khaleque Op. cit.

Leuschner, W.A. and Khaleque, Kibraul 1989
"Homestead Agroforestry in Bangladesh" in Nair, P.K.R. (ed), Agroforestry Systems in the Tropics, Kluwer Academic publishers, Ordrecht. Netherlands.

Abdullah. T. 1983
Homestead Agricultural Production in Rural Bangladesh. The Ford Foundation, Dhaka.

পরিশিষ্ট

কৃষির বিভিন্ন উপখাত ভিত্তিক বাৎসরিক গড় আয়

	শস্য	বনসম্পদ	বসতবাগান	মৎস্য	পশুসম্পদ	হাঁসমুরগী
			পু ঠি য়া			
বড়	৪০,০০০	২০,০০০	২৩০	৩০০০	১৫০০	৬৫০
মধ্যম	২০,০০০	১৪,০০০	১০০	২০০০	১০০০	২৫০০
ছোট	১২,০০০	৩,৫০০	১,৩০০	১০০০	৫০০	১০০০
প্রান্তিক	৮,০০০	১,৪৫০	৬০০	২০০	১০০	১০০০
ভূমিহীন	৫,০০০	৯০০	৮০	শূন্য	৫৮০	১০০০
			বী র গ ঞ্জ			
বড়	৭০,০০০	৮,০০০	১,৪০০	৫০০০	৬০০০	১৪০০
মধ্যম	৩০,০০০	৫,০০০	১,০০০	৩০০০	৪০০০	১০০০
ছোট	২০,০০০	৩,০০০	১,০০০	১০০০	৩০০০	৮০০
প্রান্তিক	১৫,০০০	১,০০০	৯০০	২০০	১৫০০	৭০০
ভূমিহীন	৬,০০০	৮০০	৪০০	শূন্য	১০০০	৫০০

গ্রন্থ পরিচয়

বাংলার ইতিহাস- মোগল আমল;
প্রথম খণ্ড (১৫৭৬-১৬২৭);
আবদুল করিম
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯২

বাংলা ভাষায় বাংলার ইতিহাস চর্চা গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আরম্ভ হয় বলে ধরে নেয়া যায়। এই চর্চা ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর গবেষণা কর্ম এবং আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে হয়েছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। চার্লস স্টুয়ার্ট ১৮১৩ সনে যে *হিস্টরী অব বেঙ্গল* রচনা করেছিলেন তা অনেকাংশে ফার্সী ভাষায় লিখিত গোলাম হোসেন সেলীমের রিয়াজ-উস-সালাতীনের অনুকরণে। এগুলো প্রকৃত অর্থে বাংলার ইতিহাস নয়। এগুলো মোগল ইম্পেরিয়াল বা দরবারী ইতিহাস। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে তাঁদের গবেষণা কর্ম সঙ্গত কারণেই ইংরেজীতে করেছিলেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে এতে উৎসাহ পেয়েছিলেন বাংলার কিছু বিদ্বজ্জন যাঁদের বেশীর ভাগই ইংরেজ গবেষকদের ন্যায় সরকারী চাকুরে ছিলেন। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশকে জানা, এদেশের লোকজনকে তাদের নিজ দেশ সম্বন্ধে জ্ঞাত করা। এই উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিণত হয় যখন ইংরেজ সরকারী কর্মকর্তাগণ জিলার ইতিহাস এবং জিলা গেজেটিয়ার তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। গেজেটিয়ারের পূর্বে জিলার ইতিহাস লেখার কাজ আরম্ভ হয়েছিল বলে মনে হয়। হ্যামিল্টন বুকানন কর্তৃক দিনাজপুরের ইতিহাস ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে জে. ওয়েস্টল্যাণ্ডের যশোরের ১৮৭৪ উইলিয়াম হান্টারের বাখরগঞ্জের ১৮৭৫ সনে এবং জে, সি, প্রাইসের মেদিনীপুর জিলার ইতিহাস ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। গেজেটিয়ার সমূহের অধিকাংশই প্রণীত হয় গত শতাব্দীর প্রথম দশকে। এতদুদ্দেশে উদ্দীপিত বাঙ্গালী পণ্ডিতগণও ইংরেজদের সাথে সাথে বাংলায় প্রথমে জিলার ইতিহাস লেখার কাজ আরম্ভ করেন। তবে উদ্দেশ্য সাধারণভাবে দুই ধরনের বলা যায়ঃ ইংরেজরা জিলার ইতিহাস, গেজেটিয়ার বা সেন্সাস রিপোর্ট লিখেছেন তাদের প্রশাসনিক এবং রিভেনিউ সেটেলমেন্ট-এর প্রয়োজনে, আর বাঙ্গালীরা ইতিহাস রচনা করেছেন তাদের জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণায়। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষায় রচিত এই ইতিহাস নিম্ন বেতনভূক কর্মচারীদের প্রশাসনিক কর্তব্য পালনেও যে কাজে লেগেছে তা অনুমান করা যায়। বাংলা ভাষায় ইতিহাস লেখার এটি প্রাথমিক পর্যায়। এই পর্যায়ের ইতিহাস খণ্ডিত ইতিহাস - বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস নয়। খণ্ডিত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য তথ্য অনুসন্ধান ও উপস্থাপন। সেখানে আলোচনার পরিসর নিতান্তই অপ্রতুল। তুলনামূলক আলোচনা না থাকায় আধুনিক অর্থে এগুলো ইতিহাসের আকরগ্রন্থ, পরিশোধিত ইতিহাস নয়।

জ্ঞানচর্চার পরিসর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক ইতিহাসের প্রয়োজন সাধারণভবেই অনুভূত হয়। এবং এই প্রয়োজন মেটাতে প্রথম যিনি এগিয়ে আসেন তিনি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৭ সনে রচিত তাঁর 'বাংলার ইতিহাস' প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় বাংলার ইতিহাস রচনার প্রথম পদক্ষেপ। এই প্রচেষ্টায় তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক উদঘাটিত সমূদয় উৎস ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও ব্যবহার করেছেন মুদ্রাভিত্তিক নতুন তথ্য। পূর্ববর্তী উৎসের অভাবে শিলালিপি, মুদ্রা ও বিদ্যমান ইমারতের উপাত্ত ব্যবহার করে বাংলার ইতিহাস রচনা করার তিনি এক নতুন দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এই দিক-নির্দেশনা বর্তমান ঐতিহাসিকদের জন্য এক বিশেষ পাথেয়।

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে অন্ততঃপক্ষে বিশ বছর সামগ্রিকভাবে বাংলার ইতিহাসচর্চার আর কোন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমান শতাব্দীর বিশ এবং তিরিশের দশক প্রকৃত অর্থে সামগ্রিক ইতিহাস লেখায় একটি শূন্যস্থান। কারণ সম্ভবতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং উপযুক্ত লেখকের অভাব। এই শূন্যস্থান পূরণে আধুনিক পেশাগত ধ্যান ধারণা নিয়ে যাঁরা এগিয়ে আসেন তাঁরা হলেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার এবং স্যার যদুনাথ সরকার। গবেষণার উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূল্যে তাঁদের সম্পাদনায় *হিস্টরি অব বেঙ্গল* দুই খণ্ডে ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সনে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ড দুটিতে ঢাকা, কলকাতা এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গ তাঁদের প্রবন্ধ রচনা করে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের জন্য এক প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা করে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই *হিস্টরি অব বেঙ্গল* তাই ইংরেজী এবং বাংলাভাষায় ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয় পটভূমি।

হিস্টরি অব বেঙ্গল এর পরে আজ পর্যন্ত ইংরেজী এবং বাংলাভাষায় বেশ কিছু পেশাভিত্তিক এবং গবেষণাধর্মী ইতিহাস রচিত হয়েছে। যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই সময়ের ইতিহাসকে কালানুযায়ী তিন অংশে বিভক্ত করা যায়, যেমন প্রাচীন বা হিন্দু-বৌদ্ধ আমল, মধ্যযুগীয় বা সুলতানী ও মোগল আমল এবং আধুনিক বা বৃটিশ ও পরবর্তী স্বাধীন আমল। এই তিনটি আমলের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচিত ইতিহাসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও প্রাচীন যুগের উপর মূল্যবান বেশ কয়েকটি সামগ্রিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগের উপরও মূল্যবান কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তবে তাদেরকে সামগ্রিক বলা যায় না। তার একটি কারণ হলো প্রাচীন যুগের চাইতে মধ্যযুগের ইতিহাসের অনেক বেশী উপাত্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। যার ফলে এই ইতিহাসকে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভাজনে সহজেই বিভক্ত করা যায়। প্রফেসর আব্দুল করিমের *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)* এবং *বাংলার ইতিহাস (মুগল আমল)* মূলতঃ রাজনৈতিক ইতিহাস। সুলতানী আমলের ইতিহাস কয়েক বৎসর পূর্বে এবং মোগল আমলের ইতিহাস সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে এই দুইটি পুস্তক এমন একজন অধ্যাপকের দ্বারা লিখিত হয়েছে যিনি তাঁর প্রায় সমগ্র জীবন এই মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসের উপর গবেষণা করেছেন এবং এই ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ হিসাবে যাঁর নাম সর্বজনবিদিত। মোগল আমল সুলতানী আমলের ইতিহাসের ধারায় লিখিত হয়েছে। তবে প্রেক্ষাপট ভিন্ন। একটি মূলতঃ স্বাধীন বাংলার এবং অপরটি মোগল বাংলার। বাংলা ভাষায়

ইতিহাস চর্চার এই দুইটি গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য অবদান। মোগল আমলের ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রফেসর করিম লিখেছেন (পৃঃ ৩), স্যার যদুনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা মোগল সাম্রাজ্যের প্রেক্ষিতে লিখেছেন, তাই তাঁদের রচিত বাংলার ইতিহাস বাংলার ইতিহাস না হয়ে বাংলায় মোগলদের ইতিহাসে রূপ লাভ করেছে। তাঁরা বাংলার ভূঞা জমিদার এবং সামন্ত প্রধানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, তাঁদের দেশপ্রেমের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন, স্যার যদুনাথ নিজে বার ভুঞাদের ভুঁইকোড় (Upstart) এবং দস্যু সর্দার (Captains of plundering bands) রূপে উল্লেখ করেন। বার ভুঁঞারা তিনযুগ ধরে মোগল আগ্রাসন প্রতিরোধ করেন এবং সফল ভাবে আকবরের সেনাপতিদের বাধা দেন, কিন্তু *হিস্টরি অব বেঙ্গল ভল্যুম* ২-এ তাঁদের কোন মর্যাদাই দেয়া হয়নি এবং তাঁদের দেশপ্রেমের কথা সরাসরি অস্বীকার করা হয়। সুতরাং মোগল আমলের ইতিহাস নতুন করে লিখার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায়না'। বইটির প্রথমদিকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত প্রফেসর করিমের উদ্দেশ্য যথার্থ ভাবে প্রতিভাত হয়েছে বলা যায়। তবে চতুর্থ অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে কতখানি সফলকাম হয়েছেন এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। এই নয়টি অধ্যায়ের শিরোনাম এবং বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যেখানে মোগল সুবাহ্দার ও তাঁর কর্মকান্ডই মুখ্য আর স্বাধীনচেতা বাংলার ভূঁঞা বা নৃপতিদের কর্মকান্ড গৌন এবং সময় সময় 'বিদ্রোহ'। প্রকৃত পক্ষে প্রফেসর করিম বাংলার প্রেক্ষাপটে লেখার ইচ্ছা পোষণ করলেও তাঁর প্রাপ্ত উপাত্ত তাঁকে 'ইম্পেরিয়্যাল' ইতিহাস লেখার ধারায়ই পরিচালিত করেছে। তাঁর মূখ্য উপাত্ত মোগলদের রাজধানী কেন্দ্রীক ইতিহাস, স্থানীয় উপাত্ত নয়। তাই আবুল ফজল, জাহাঙ্গীর, মির্যা নাখন বা আব্দুল লতীফ যেভাবে লিখেছেন তিনি সেই ধারাই অনুসরণ করেছেন। স্থানীয় বুরঞ্জী, রাজমালা, শিলালিপি, মুদ্রা বা জেলার ইতিহাস দরবারী ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণ করেছে মাত্র। সেজন্য যদিও গ্রন্থের শিরোনাম *বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল)*, যা প্রফেসর করিম লিখেছেন তার বেশীর ভাগই বাংলায় মোগল সুবাহ্দারদের ইতিহাস।

প্রফেসর করিম তার গ্রন্থটির উপাত্ত বেশীর ভাগই মিরযা নাথনের *বাহরিস্তান-ই-গায়েবী* থেকে নিয়েছেন। তবে অন্যান্য উৎসের সাথে *বাহরিস্তানের* উপাত্ত সংমিশ্রণ করে তিনি যে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। *বাহরিস্তানের* লেখা বেশীর ভাগই তারিখ বর্জিত। প্রফেসর করিম শিলালিপি, মুদ্রার সাক্ষ্য বা অন্যান্য উৎস থেকে উপাত্ত নিয়ে সেই শূন্যস্থান যথার্থভাবে পূরণ করে আকবরের বাংলা বিজয় থেকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু পর্যন্ত তথ্য সম্বলিত যে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাসটি লিখেছেন তা জ্ঞানের রাজ্যে একটি বিরাট সংযোজন। এই গ্রন্থ ভবিষ্যত গবেষণার জন্যও উৎস-গ্রন্থ হিসেবে অবদান রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

প্রফেসর করিম ঐতিহাসিকদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা এই পুস্তকে নিরসন করার প্রয়াস করেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় 'বার ভূঁঞা' নামের সমস্যাটির। বারভূঁঞা কারা এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক ছিল। ভূঁঞাদেরকে 'ভাটির ভূঁঞা' এবং অন্যান্য ভূঁঞাতে বিভক্ত করে প্রফেসর করিম প্রমাণ করেছেন যে ভাটির ভূঁঞারাই প্রকৃত বারো ভূঁঞা এবং তাঁরাই মোগল শাসনের বিশেষ প্রতিরোধকারী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে সম্রাট আকবরই বাংলা বিজয়

করেছেন। কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে তারিখ সহকারে প্রফেসর করিম দেখিয়েছেন যে আকবরের রাজত্বকালে যমুনা নদীর পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্তই মোগলদের অধীনে ছিল। সমগ্র বাংলা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেই মোগলদের করতলগত হয় এবং এই কৃতিত্বের দাবীদার মূলতঃ জাহাঙ্গীরের সুবাহদার ইসলাম খান চিশতী।

প্রফেসর করিমের গ্রন্থটি পড়ে বাংলায় মোগল সুবাহদারদের একটি ক্রমিক তালিকা তৈরী করা যায় যা অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সাথে সাথে বাংলার প্রতিরোধকারী ভূঁঞা, সহায়ক ভূঁঞা এবং অন্যান্য অনেক নৃপতি ও সামন্তের নামোল্লেখ পাওয়া যায় যা এই গ্রন্থের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রায় অজ্ঞাতই ছিল।

প্রফেসর করিমের *বাংলার ইতিহাস, মোগল আমল (১৫৭৬-১৬২৭)* সুধী সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে বলে বিশ্বাস করি। এই গ্রন্থটি তাঁর প্রস্তাবিত পঞ্চম খণ্ড সম্বলিত মোগল আমলের বাংলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড। আমরা আশা করছি তিনি বাকী চার খণ্ড প্রণয়ন করে মোগল আমলের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উপহার দিয়ে যাবেন। বাংলার ইতিহাস চর্চায় যিনি আজীবন নিজকে নিবেদিত করেছেন তাঁর থেকে এ প্রাপ্তি ভবিষ্যত ঐতিহাসিকদের বাংলাভাষায় ইতিহাস চর্চায় অনুপ্রাণিত করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ. বি. এম. হোসেন

আই. বি. এস সংবাদ

আই.বি.এস-এর বিংশতি বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

বছরের প্রায় শুরুতে, ২৪শে জানুয়ারী (১৯৯৩), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একদিন ব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি মোট ৫টি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনটি ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কর্ম অধিবেশন ছিল ৪টি। চতুর্থ কর্ম অধিবেশন বা সমাপনী অধিবেশনটি অনিবার্য কারণবশতঃ স্থগিত করা হয়। ফলে উদ্বোধনী অধিবেশনসহ মোট ৪টি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য সুভনিরও প্রকাশিত হয়। তাছাড়া আই. বি. এস-এর পরিচিতিমূলক ব্রশ্যর এবং ষোলোটি প্রকাশিত জার্নালের 'ইনডেক্স' ও প্রথমবারের মতো বের হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর এম. আনিসুর রহমান। পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। তেলাওয়াত করেন মোঃ সাইফুল্লাহ্। এই অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ দান করেন আই. বি. এস-এর মাননীয় পরিচালক ও প্রফেসর ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ও উপ-উপাচার্য ডঃ এম. আযহার-উদ-দীন। প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সদস্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাণী পড়ে শোনান আই. বি. এস-এর শিক্ষক, পুনর্নিয়োগ প্রাপ্ত প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম। উদ্বোধনী অধিবেশনের শেষে আই. বি. এস.-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম প্রফেসর এস. এ. কাদেরের একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন এবং তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ আই. বি. এস. লাইব্রেরীতে উপঢোকন হিসাবে প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আগত অতিথি মাদাম রওশন কাদিরও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর এবং আই. বি. এস-এর পিএইচ.ডি. ফেলো মোহাম্মদ আব্দুল খালেক আই. বি. এস.-এর যেসব শিক্ষক, ফেলো, কর্মচারী ইতোমধ্যে লোকান্তরিত হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির স্মরণে শোক প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং প্রয়াতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোওয়া করা হয় ও এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

আই. বি. এস-এর পরিচালক ও প্রফেসর জনাব মাহমুদ শাহ কোরেশী তাঁর স্বাগত ভাষণে আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সংক্ষেপে আই. বি. এস.-এর ক্রমবিকাশের ধারা তুলে ধরেন। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্বেও আই. বি. এস. যে সাফল্য অর্জন করেছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে তিনি তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আই. বি. এস. এদেশের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন মোড় ঘুরিয়ে (breakthrough) দিতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, আর কালক্ষেপণ না করে বিগত বছরগুলির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে আরও বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে আমরা পার্টিকুলার থেকে ইউনিভার্সালে-বিশেষ থেকে নির্বিশেষে উত্তরণ ঘটাতে পারি।

এরপর আই. বি. এস.-এর সাবেক পরিচালক (পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত) অধ্যাপক এস. এ. আকন্দ আই. বি. এস-এর প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক পর্যায়ে পরিচালনার আনুপূর্বিক ঘটনাবলী তুলে ধরেন। অতঃপর আই.বি.এস-এর সহযোগী অধ্যাপক ডঃ পি. কে. মিত্র ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান শিক্ষানীতি, কোর্স-উপাদান, গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি আই. বি. এস-এর ইতিবাচক বিকাশের জন্য কিছু পরামর্শ প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর এম. আযহার-উদ-দীন আই. বি. এস-এর ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের এ দিনকে একটি শুভ দিন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বিগত ২০ বছরের কর্মপর্যালোচনা করে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। গবেষণাধর্মী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষকদের ইংরেজী ভাষায় দক্ষতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং নির্ধারিত কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার পরামর্শ দেন। তিনি শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের উপর জোর দেন।

সভাপতির ভাষণে মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর এম. আনিসুর রহমান আই. বি. এস-কে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, আই. বি. এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব এবং বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি সফল প্রয়াস। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এম. ফিল./ পিএইচ.ডি. ডিগ্রী নিয়ে গবেষকরা জাতিগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বিদেশেও এখানকার গবেষকগণ দেশের জন্য এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্মান কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আই. বি. এস.-এর বিভিন্ন সমস্যার পর্যায়ক্রমিক সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আই. বি. এস.-এর সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী বিশেষভাবে আই. বি. এস.-এর পরিচালক মহোদয়কে এ ধরনের মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। অতঃপর ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ এম. জয়নুল আবেদীন সমাগত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পরপরই কর্ম অধিবেশন শুরু হয়। প্রথম অধিবেশনে ২টি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ এম. জয়নুল আবেদীন। দ্বিতীয় প্রবন্ধকার ডঃ মাহমুদ আহমদের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করেন জনাব আ.ন.ম. আব্দুর রহমান। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম।

দ্বিতীয় অধিবেশন পরিচালনা করেন মিসেস রওশন কাদের। এ অধিবেশনে ৫টি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। উপস্থাপন করেন ডঃ নাসিম আখতার হোসেইন, মিসেস ইসরাত জাহান রূপা, ডঃ মু. আব্দুল খালেক, জনাব সৈয়দ নেছার আহমদ রুমী ও জনাব ছাদেকুল আরেফিন।

তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় প্রফেসর শাহানারা হোসেনের সভাপতিত্বে বিকেল ৫টায়। এ অধিবেশনে দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রাবন্ধিকদ্বয় হলেন ডঃ আয়েশা বেগম এবং ডঃ সরদার আব্দুস সাত্তার।

তিনটি কর্ম অধিবেশনে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা, বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তার

বিকাশ ও এর সমস্যা এবং সম্ভাবনা, বাংলা সাহিত্যে লোক উপাদান, আই. বি. এস.-এ মহিলা গবেষকদের অবস্থা ইত্যাদি বহু বিষয়ে প্রবন্ধকার ও আলোচকগণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমস্ত আই. বি. এস. কমপ্লেক্স অত্যন্ত মনোরম ভাবে সজ্জিত হয়েছিলো। আই. বি. এস.-এর পিএইচ.ডি. ফেলো শিল্পী আবু তাহের বাবুর নিরলস একক প্রয়াসেই তা যেমন সম্ভব হয়েছিলো তেমনি প্রকৃতিও অকৃপণ ভাবে পত্র পুষ্পে সমগ্র এলাকাকে অপরূপ করে তুলেছিলো। এদিকে সচিব আবদুল হক খানের নির্দেশনায় মালী ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। অনুষ্ঠানে সার্বিক আয়োজন সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে শিক্ষক, ফেলো ও কর্মকর্তাবৃন্দের প্রয়াস দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো বলা যায়।

আই.বি.এস. এ্যালামনাই এসোসিয়েশন সম্মেলন

আই. বি. এস.-এর বিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান মালার পরদিনই অর্থাৎ ২৫শে জানুয়ারী ১৯৯৪ইং তারিখে আই. বি. এস. এ্যালামনাই এসোসিয়েশন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সাধারণ সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডঃ এম. আনিসুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ও উপ-উপাচার্য ডঃ মুহাম্মদ আযহার উদ্-দীন এবং আই. বি. এস.-এর পরিচালক ও প্রফেসর ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী।

অনুষ্ঠানমালা চারটি পর্বে বিভক্ত ছিল যথা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেমিনার, সাধারণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মু. আমীরুজ্জামান খান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান।

দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের 'উচ্চ শিক্ষায় গবেষণার প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ নাসিম আখতার হোসেন। সেমিনারে মোট চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রাবন্ধিকগণ হলেন প্রফেসর পি. সি. সরকার, মোঃ আবদুল হক তালুকদার, মিসেস গুলনাহার বেগম ও মোঃ ছাদেকুল আরেফিন। এছাড়া ডঃ কে. এম. এ. আজিজও একটি অনির্ধারিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রবন্ধগুলির উপর বেশ কয়েকজন নির্ধারিত ও অনির্ধারিত আলোচক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচকগণ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও প্রবন্ধগুলিকে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে অভিহিত করেন। তাঁরা প্রবন্ধগুলো কীভাবে আরো সমৃদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

তৃতীয় পর্বে এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর এ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবিত সংবিধান অনুমোদিত হয় এবং নতুন কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়।

চতুর্থ পর্বটি ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিসেস গুলনাহার বেগম। মনোজ্ঞ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের প্রথম সাধারণ সভা সাফল্যের সংগে সমাপ্ত হয়।

আ. ন. ম. আবদুর রহমান